শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাশয়ের শ্রীচরণকমলে

২৫ বৈশাখ, ১৩৪৮

পূর্ব্ব ইতিহাস

১৩৪১ সালের মাঘ মাস। সদ্য বসন্ত রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছি, তখনও কাজের উপযুক্ত হই নাই। দিন কাটান ভার। সমস্ত দিন বসিয়া কি করি? আমার তখনকার আস্তানার দোতলার ছোট বারান্দায় বসিয়া এই উপন্যাস লিখিতে সুরু করিলাম (৬ই মাঘ)। মাত্র দুই অধ্যায় তখন লেখা হয়। ১৩৪৩ সালের আষাঢ় মাসের ১১ তারিখে হঠাৎ লিখিবার খেয়াল হওয়ায় আরও গোটা চল্লিশ পৃষ্ঠা লেখা হইল। কিন্তু আষাঢ় শেষ হইতে না হইতে খেয়াল চলিয়া গেল। সেই খেয়াল আবার দেখা দিল, ১৩৪৪ সালের কার্ত্তিকের শেষ সপ্তাহে, এক এক সপ্তাহের ফল হইল আরও চল্লিশ পৃষ্ঠা। তারপর ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা ঘটে পৌষের মাঝামাঝি। দেড়মাস হাসপাতাল বাসের পর চার পাঁচ মাস শয্যায় শয়ন। যন্ত্রণায় কিছু ভাল লাগিত না। তখন নিজেকে ভুলাইবার জন্য আবার এই গল্প একটু একটু করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলাম। এখন যতখানি প্রকাশিত হইল, তার শেষের পাঁচটি অধ্যায় এই অবস্থায় লিখিত।

আমার এই উপন্যাসের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উপরে দিলাম, তাতে দেখা যাইবে, ইহা কোন দিন শেষ করিব, এমন ভরসা ছিল না। বস্তুত, এটি আমার লিখিত প্রথম উপন্যাস নহে, যদিও জগতের আলো দেখিবার সৌভাগ্য ইহারই প্রথম ঘটিল। অন্যগুলি কবে জনসাধারণের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবে, করিবে কি না, বলিতে পারি না।

সমগ্র গল্পটি একবারে প্রকাশিত হইল না। কিন্তু তাতে গল্প বুঝিবার পক্ষে অসুবিধা হইবে না। পরবর্ত্তী অংশ যদি প্রকাশিত হয়, তা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইবে না।

আমার এই কাহিনী যখন লিখিতে আরম্ভ করি, তখন ইহার নাম ছিল 'সংগ্রাম ও শান্তি'। কিন্তু এ বই প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই ঐ নামে বই বাহির হয়। সেই জন্য নূতন নামকরণ করিতে হইল।

মনের আনন্দে লিখিবার অধিকার লেখকের নিশ্চয় আছে। কিন্তু লেখাটি যদি দশজনে আদর না করে, তা হইলে লেখকের উৎসাহ থাকে না। পাঠক-পাঠিকা আমার এই বই কি ভাবে গ্রহণ করিবেন, তা তাঁরা জানেন। কিন্তু আমার মনে যে আশঙ্কার অন্ত নাই, তা স্বীকার করিতেছি।

বর্ত্তমান দুর্য্যোগে আশঙ্কা আরও বেশী। কোন কোন বন্ধু পরামর্শ দিয়াছিলেন, দুর্য্যোগ কাটুক, তারপর ছাপাইও। দুর্য্যোগ কবে কাটিবে, কে বলিবে? সুতরাং পৃথিবীব্যাপী রণহুঙ্কার, কামানের ধূম্রজাল ও যুধ্যমানদের আর্ত্তনাদ ও রক্তপাতের মধ্যে আমার এই কাহিনী—পৃথিবীর একপ্রান্তস্থিত কয়েকটি কল্পিত নরনারীর সুখ দুঃখ ও সংগ্রামের কাহিনী—জন্মলাভ করিল। ইহাদের জীবন-সংগ্রামও বর্ত্তমান ঘোর যুদ্ধের চাইতে কম তীব্র বা কম সমস্যা-বহুল নয়।

লোকে পড়ুক বা না পড়ুক, গল্প ভাল লিখিয়াছি বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার মোহ আমার নাই। গল্প যদি পড়াইতেই না পারা গেল, তবে লিখিয়া লাভ কি? সেইজন্য, আমি আমার গল্পের পাঠক-পাঠিকা পাইবার জন্য ব্যগ্র। এই দুর্যোগের মধ্যেও বাংলা দেশে গল্প পড়িবার মত আগ্রহ বহু নরনারীর আছে, ইহাই আমার ভরসা।

বহু চেষ্টা সত্ত্বেও মুদ্রাঙ্কণ সম্পূর্ণ নির্ভুল করা সম্ভব হয় নাই। মুদ্রাঙ্কণের পারিপাট্যের জন্য প্রশংসা কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস ও উহার কর্ম্মকর্ত্তাগণের প্রাপ্য। প্রেস যেরূপ যত্ন ও তৎপরতার সহিত কাজ করিয়াছেন, তাতে আমি তাঁদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দাশ প্রুফ সংশোধনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ হালদারও প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

২৫ বৈশাখ, ১৩৪৮

শ্রীসুধাকান্ত দে

প্রেম নহে মোর মৃদু ফুলহার

২

রমেন ভাবিল, অনেক দিন নরেশের সহিত দেখা হয় নাই, একবার দেখা করিয়া আসি।

পথে যাইতে যাইতে রমেন নরেশের কথাই ভাবিতে লাগিল। বড় লোকের ছেলে, বাবুগিরি করিবার মত প্রচুর টাকা হাতে সর্ব্বদাই আছে। তার একটা জুতার যা দাম সেই অর্থে রমেনের এক মাস স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়। দেহে প্রচুর শক্তি। মনে আনন্দ। কোন ভাবনা-চিন্তা নাই। কাজেই দেহের শক্তি ও সৌন্দর্য্যের চর্চ্চা করিবার যথেষ্ট অবকাশ পায়। রং কালোও নব, ফরসাও নয়, তবে ফরসার দিকে। লম্বা দোহারা চেহারা। পিছন থেকে দেখিতে যত সুন্দর লাগে সামনে গিয়া তত সুন্দর লাগে না। মুখখানা কতকটা বাংলা পাঁচের মত। তথাপি যখন হাসে বেশ ভাল লাগে। মন খোলা এবং লোকটি সহৃদয়। মাথার চুল পিছন দিকে ফিরানো, সিঁথি মাঝখানে। একটু কুব্জ হইয়া তাড়াতাড়ি চলে।

নরেশের তুলনায় রমেন অনেক দিকেই খাটো। প্রথম ও প্রধান অভাব পয়সার। সে অবশ্য আর পাঁচজনকে জানিতে দেয় না কি কষ্টে দিন তাদের চলে। সমানে মাথা উঁচু করিয়া অন্য সকলের সহিত চলিয়াছে। কিন্তু দারিদ্র্য' কি বস্তু, সে তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করে। অথচ কেমন তার অভিমানী স্বভাব, সে নিজের দীনতা অন্যের কাছে জানাইয়া ভিক্ষা চাহিতে পারে না। নরেশের সাহায্য লয় নাই, তার পরিচিত ও বন্ধুদের

মধ্যে এমন লোক মেলা ভার। নরেশ দিতে কার্পণ্য করে না এবং বেশ সহজ ভাবেই দেয়। তবু একমাত্র রমেনই তার নিকট কোন দিন কিছু চাহে নাই। রমেনকে সাধিয়া দিতে গেলেও সে লয় না। নরেশ বলে, তার আত্ম-সম্মান বোধ বড় প্রবল। কিন্তু রমেন জানে, ইহা আত্ম-সম্মান নয়, ইহা অভিমান মাত্র। এই অভিমানের জন্য সে জীবনে উন্নতি করিতে পারিল না। তার ধনী আত্মীয় কেহ কেহ তাকে সাহায্য করিতে চাহিয়াছেন। বলিয়াছেন, ঋণস্বরূপ টাকাটা লও, তারপর শোধ করিও। কিন্তু সে লইতে পারে নাই। কোথায় যেন তার বাধে। সে জানে, বর্ত্তমান জগতে অর্থহীন ব্যক্তির কোন আশা নাই, কোন ভবিষ্যৎ নাই। তাকে হয়ত চিরজীবন সংগ্রাম করিয়াই কাটাইতে হইবে, তবু যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে না। মানুষ হিসাবে বিচার করিলে হয়ত সে অযোগ্য নয়। হয়ত যাদের অর্থ আছে, তাদের অনেকের চেয়ে তার যোগ্যতা অধিক। তথাপি একথা ঠিক, সে জানে না কি করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করা যাইতে পারে। একদিন ছিল যখন সে স্বপ্ন দেখিত ভবিষ্যতে কোন না কোন সময়ে সে নিজের বলে প্রচুর উপার্জ্জন করিতেছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা বাড়িয়া তার সে সুখ-স্বপ্ন বিনষ্ট করিয়াছে। আজ নিজের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া উপায় নাই। তার যোগ্যতা কোন কাজে লাগিবে না। তাকে চিরজীবন ঘোরতর দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়াই কাটাইতে হইবে। ভগবান্ হয়ত তার প্রতি অবিচার করিয়াছেন। তাকে বহু সামর্থ্য দিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন, কিন্তু একটি অভাব রাখিয়া তার জীবন ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। সেই অভাবে, অর্থের অভাবে, তার জীবন মাটি হইয়া যাইতেছে। স্বয়ং ভগবান্ যখন বিরূপ, তখন সে আর কাহার বিরুদ্ধে নালিশ করিবে? সে নালিশ করিতে চায় না। ছেঁড়া জামা, ছেঁড়া জুতা, সে যত্ন করিয়া পরে, শরীরের যথাসম্ভব প্রসাধন করে। দু বেলা ভাল করিয়া খাইতে পায় না, যা উপার্জ্জন করে তা এত সামান্য এবং একরূপ

অনিশ্চিত যে কোন প্রকার আমোদে অর্থ-ব্যয় করার কথা সে কল্পনাও করিতে পারে না। অন্য যারা আর্থিক স্বচ্ছলতার মধ্যে বাস করে সে কি তাদের হিংসা করে? ঠিক বলিতে পারে না। তবে হিংসা করিয়া কোন লাভ নাই, এ কথা সে জানে। কারণ, তাদের স্বাচ্ছন্দ্য সে কোন কালে পাইবে না। তাব আশা খুব উচ্চ নয়, সে হাজার হাজার টাকা চায় না, কিন্তু অল্প যে কয়টি মুদ্রা তার মাসে দরকার, তাই সে পায় না। এ বিষয়ে তার নিজের কোন দোষ নাই, এমন বলা চলে না। বন্ধু-বান্ধবের অনেকে তাকে অলস বলিয়া গালি দেয়। সত্যই কি সে অলস? হয়ত কিছু পরিমাণ অলসতা তার প্রকৃতিব মধ্যে রহিয়াছে। তার নিজের মধ্যে একটা পাণ্ডিত্যাভিমান আছে। সে পাঠ-প্রিয় ব্যক্তি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষা সে হেলায় পাশ করিয়াছে। পড়া সম্বন্ধে তার জুড়ি দ্বিতীয় ছিল না। সে পড়িতে অত্যন্ত ভালবাসে। তার কাছে পড়া যেন নেশা,—পড়িতে বসিলে সে বিশ্ব-সংসার ভুলিয়া যায়। সে পড়িতে ভালবাসে বটে, কিন্তু অধিকাংশই তার অকাজের পড়া। ছাত্র-জীবনে সে পাঠ্য পুস্তক যত পড়িয়াছে, অপাঠ্য পুস্তক তার চেয়ে ঢের বেশী পড়িয়াছে। তার মত জ্ঞানী একটি ছেলেও ছিল না। হইলে কি হয়? বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত হইবার উপায় ইহা নয়। যে ছেলে প্রথম হয়, তার চেয়ে সে অনেক বেশী জানিতে পারে, কিন্তু সে প্রথম হইবার সঙ্কেত জানে না। ইহা মস্ত বড় অপরাধ এবং এজন্য তাকে ভুগিতে হয়। যে ছেলে প্রথম হয়, তার দিকে সকলের দৃষ্টি পড়ে, তাকে পণ্ডিত বলিয়া মান্য করে। সেখানে রমেনের মত ছেলের স্থান কোথায়? রমেন তার নিজের বিদ্যার আদর করে, কিন্তু অন্য লোকে তা বুঝে না, বুঝিতে চায় না। সাংসারিক দিক্ হইতে তার প্রভূত জ্ঞান কোন কাজে আসে না, বরং এমন পথে তাকে জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয়, যেখানে ঐ জ্ঞান না থাকিলেও চলিত। রমেন এ কথা বরাবর জানিত। জানিত যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সেও খুব ভাল করিতে পারে। দরকার শুধু

মনটাকে অন্য সর্ব্বত্র হইতে গুটাইয়া আনা। পড়ার বিষয়গুলি ত পলাইয়া যাইতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বেশ ভাল ছেলে হইয়া বাহির হইবার পরও সে সুযোগ থাকিত। আর তা হইলে তার পক্ষে কত সুবিধাই না হইত! এখন সে বিষয়ে আক্ষেপ করিয়া আর কোন ফল নাই। যা হইতে পারিত তা হয় নাই। ঠিক অলসতার জন্য হয় নাই বলিলে সম্পূর্ণ সত্য বলা হইবে না। কেমন যেন তার স্বভাব। সে জানিত, বুঝিত সব, তথাপি নিজের স্বভাবকে অতিক্রম কবিতে পারিত না। অপাঠ্য পুস্তকের মোহ ও আকর্ষণ তার নিকট এত প্রবল ছিল যে, সে সময়ে নিজেকে সংবরণ করিতে পারিত না। তার জানিবার আগ্রহের অন্ত ছিল না যে। তার রক্তের মধ্যে ছিল ঐ জানিবার আগ্রহ। কি দিয়া সে তা নিবারণ করিবে? অসম্ভব। আজ যদি আবার তাকে নূতন জীবন আরম্ভ করিতে দেওয়া হয়, সে আবার ঐ পথেই যাইবে। অতীতে যা হইয়া গিয়াছে, তা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান কালেও কি রমেন তার স্বাভাবিক অলসতা দূর করিতে পারিয়াছে? যারা তাকে জানে তারা সকলে জানে, পারে নাই। এখনও রমেন যা উপার্জ্জন করে, তার চেয়ে বেশী উপার্জ্জন করিতে পারে, ইচ্ছা থাকিলে। কিন্তু তার সে ইচ্ছা নাই। সে যা তা কাজ করিতে সম্মত নয়। তারপর তার মনে এক অহংকার আছে, সে বিশ্ববিদ্যালযের উচ্চ উপাধিধারী। বাজারে এই উপাধির দাম যে কত কম, সে বুঝিতে চায় না। কত লোক অল্প বেতনের বহু কাজ জুটাইয়া লইয়াছে, প্রাণপণে খাটিয়া যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতেছে। রমেন সে পথে যাইবে না। তার পণ, তার উপাধির সে অসম্মান করিবে না, নিজেকে অল্প মূল্যে বিকাইবে না। কাজেই তার মনের মত কাজ জুটে না। সে অনাহারে থাকে। এজন্য তাকে ঘরে বাইরে যথেষ্ট গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়। তবু উপায় নাই। নিজের স্বভাবকে সে অতিক্রম করিতে পারে না। লোকে বলে, তার নাক উঁচু, তার আত্ম-সম্মান জ্ঞান বড় প্রবল। কিন্তু সে মনে জানে, ইহা আত্ম-সম্মান

জ্ঞান নয়, ইহা অভিমান। এই অভিমানে তার সর্ব্বনাশ হইতেছে, তথাপি ইহার হাত সে এড়াইতে পারে না। আসলে, সে দরিদ্রের ঘরে জন্মিয়াছে বটে, কিন্তু তার মন ধনীর মন। সে জন্য পদে পদে তাকে এত হোঁচট খাইতে হয়।

তার চাল-চলনেও সে পরিচয় পাওয়া যায়। রমেনকে দেখিলে কেহ বলিবে না, সে অত্যন্ত গরীব। তার রং কালো হইলেও তার সমগ্র চেহারায় একটা আভিজাত্যের ছাপ আছে। তার চোখে মুখে একটা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, প্রতিভার দীপ্তি রহিয়াছে। তার প্রশস্ত কপাল, দীর্ঘ আয়ত দুই চোখ; তাকাইলে মনে সংশয় থাকে না যে, সে আর দশ জন হইতে ভিন্ন প্রকৃতির। তার বৈশিষ্ট্য সহজে ধরা পড়ে না। কারণ, চোখ ও কপাল বাদ দিয়া তাকে দেখিতে অত্যন্ত সাধারণ মানুষের মত। সে অনেক পড়িয়াছে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলিয়া তা বুঝিবার উপায় নাই। সে মোটেই দ্রুত কথা বলিতে পারে না, বরং কথার মধ্যে আধ আধ ভাব আছে। বহু বাক্য আরম্ভ করিয়া সে শেষ করিতে পারে না। নিজের খুব যুক্তিপূর্ণ কথাও সে জোর দিয়া বলে না, বহু ত্রুটি সত্ত্বেও তার বলিবার ভঙ্গী সুন্দর, বিনীত অথচ অযথা বিনয়-ব্যঞ্জক নহে। তার কথা-বার্ত্তায় কাজ-কর্ম্মে সর্ব্বাগ্রে যে ভাব ফুটিয়া উঠে, তা হইতেছে আত্ম-অবিশ্বাস। জীবনে বহু বিফলতা লাভ করিয়া তার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে যে, তার দ্বারা কোন কাজ হইবে না। নিজের শক্তির উপর তার কোন আস্থা নাই।

রমেনের তুলনায় নরেশ ঢের বেশী অজ্ঞ। সে পড়াশুনার অত ধার ধারে না। তার মনের গতিই অন্যরূপ। সে জানে, জীবন সর্ব্বপ্রকারে ভোগ করিবার জিনিষ। আর সে প্রকাশ্য ভাবে উপভোগ করিতে লজ্জিত নয়। নিজের রূপ, অবস্থা, ক্ষমতা সম্বন্ধে তার জ্ঞান সর্ব্বদা পুরামাত্রায় রহিয়াছে। তথাপি তার মন অপরিষ্কার নয়। সে যখন হাসিতে হাসিতে দান বা ত্যাগ করে, তখন সত্যই দান বা ত্যাগ করে। দান করিয়া তার

কোন দিন অনুতাপ হয় না ; এমন কি, অপাত্রে দান করিলেও সে হাসে মাত্র। তার হাসি বিধাতা-প্রদত্ত ঐশ্বর্য্য বলিলেও হয়। তার হাসির মধ্য দিয়া সমগ্র মানুষটা যেন ঝলকিত হইয়া উঠে। রমেন ও নরেশের মধ্যে একটা বড় পার্থক্য এই যে, নরেশের মুখে হাসি যেমন শোভা পায়, রমেনের মুখে গাম্ভীর্য্য সেরূপ শোভা পায়। বিষাদ-মাখা গম্ভীর রমেন হইল রমেনের আসল স্বরূপ। আরও একটা পার্থক্য এই যে, নরেশ খোলা, তার পেটে কোন কথা থাকে না। বলিতে গেলে, তার গোপন কথা বলিয়া কিছু নাই, অর্থাৎ তার এমন কথা নাই যা সে শুধু বন্ধুবিশেষকে বলিবে, অন্যকে বলিবে না। সে সকলকেই গোপন কথা বলিয়া দেয় ও আমোদ উপভোগ করে। অন্য দিকে রমেনের স্বভাব কতকটা চাপা। সে সব কথা সকলকে বলিতে পারে না। কোন কোন কথা হয়ত কাহাকেও বলে না। আর গোপন কথা বিশিষ্ট দু একজনকে বলে। কোন কোন বিষয়ের পবিত্রতা সম্বন্ধে সে বিশেষ সচেতন। সেগুলি লইয়া সে কখনও হাসি তামাসা করিতে পারে না। তার ন্যায়-অন্যায় বোধ অত্যন্ত সূক্ষ্ম।

নরেশ রমেনের সহিত ঠিক বন্ধুর মত ব্যবহার করে। বিশেষ-বন্ধু নয়। বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম। সে নিজে বড় লোক আর রমেন গরীব, এ চেতনা হয়ত সর্ব্বদাই তার মনে বর্ত্তমান আছে। কারণ, প্রত্যেক ধনীর মনেই তা থাকে। তথাপি তার ব্যবহার লোকে সমানে সমানে যেরূপ করে সেরূপ। তার আচরণের বিরুদ্ধে রমেন কোন দিন কিছু বলিবার পায় নাই। তথাপি রমেন তার সহিত একটা দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলে। নরেশ লোকের কাছে অত্যন্ত সহজে রমেনের পরিচয় দেয় বন্ধু বলিয়া। রমেন তা পারে না। রমেন মনে করে গরীবে ও বড়লোকে কখনও সত্যকার বন্ধুতা হইতে পারে না। নরেশকে তার ভাল লাগে, যখন খুসী সে তার কাছে যাওয়া আসা করে, বেশ সহজে মেশে, এমন কি, মনের কোন কোন গোপন কথাও বলে, কিন্তু তথাপি সে তার বাড়ীতে নরেশকে কখনও যাইতে বলে না। নরেশ

জানে, রমেন চায় না সে তার বাড়ী যায়, সুতরাং ইহা লইয়া পীড়াপীড়ি করে না। রমেনের হৃদয় চাহিত, নরেশ তাকে নিকটতম ও প্রিয়তম বন্ধু বলিয়া মনে করুক্, কিন্তু নরেশের কথায় যদি কোনদিন তার বিন্দুমাত্র আভাস পাইত ত তা হাসিয়া উড়াইয়া দিত। বস্তুত, রমেনের পক্ষে বন্ধু-প্রীতির যত দরকার ছিল, নরেশের পক্ষে তত ছিল না। নরেশের অভাব কিছু ছিল না। তথাপি এবং হয়ত সে জন্যই তার মন কতকটা নির্লিপ্ত ছিল, কিন্তু রমেনের বুকের মধ্যে ভালবাসা পাইবার এবং দিবার একটা তৃষ্ণা সর্ব্বদাই লুকাইয়া ছিল। ইহা তার দেশ-বিদেশের নানা প্রেম-কাব্য ও সাহিত্য পাঠের ফলে বাড়িয়াছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু ইহার জন্য তার মনে সর্ব্বদা একটা অস্বস্তি জাগিয়া থাকিত। সে নিজের মনের এই ভাবকে দুর্ব্বলতা বলিযা মনে করিত, কিন্তু চেষ্টা করিয়াও তার চরিত্রের এই দুর্ব্বলতা দূর করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সম্প্রতি এই দুর্ব্বলতার ফলে সে ভুগিতেছে। বছর তিন হইল, একটি মেয়ের সহিত তার আলাপ হইয়াছে। প্রথম আলাপেই তার ভাল লাগিয়াছে। এত ভাল লাগিয়াছে যে, বলা চলে, সে তাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। তার ধারণা, কমলাকে দেখিয়া কেহ না ভালবাসিয়া থাকিতে পাবে না। সে তার এই নূতন দুর্ব্বলতার জন্য বিশেষ লজ্জিত, অথচ দিন অতীত হইতেছে ও ভালবাসা গভীর হইতেছে, আর নিজের অন্তরে একটা অবর্ণনীয় আনন্দ উচ্ছ্বাস আবিষ্কার করিয়া সে ভীত হইতেছে। সে এই মনোভাব লইয়া যে কি করিবে ভাবিয়া পায় না।

কমলা সুন্দরী কি না, সে বলিতে পারিবে না। বাস্তবিক, নিজের মা-ভগিনী ব্যতীত সে এত মেয়ে দেখিবার সুযোগ পায় নাই যে, তুলনা-মূলক সমালোচনা করিতে পারিবে। তথাপি তার মনে হয়, কমলার মত সুন্দরী, না—লাবণ্যবতী, মেয়ে বেশী নাই। ভালবাসার অঞ্জন চোখে লাগিলে বোধ হয় দৃষ্টি বদ্‌লাইয়া যায়। কমলাকে সে যে চোখে দেখিতেছে, অন্যের সে

চোখে দেখা সম্ভবপর নয়। কি সুন্দর তার গায়ের রং! কি সুন্দর তার বড় পক্ষ্মযুক্ত চোখ! কি শান্ত, নম্র, স্নিগ্ধ ভাব তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ফুটিয়া বাহির হয়! (এমন রমণীকে আপনার করিয়া পাইতে, বুকে জড়াইয়া ধরিতে, কার না ইচ্ছা হয়?)

কিন্তু বৃথা স্বপ্ন। কমলাকে ভালবাসিয়া কোন লাভ নাই। সে জানে, কমলার পিতা কখনও তাকে তার হাতে সম্প্রদান করিবেন না। তা ছাড়া, তার নিজেরও কমলাকে কামনা করা অন্যায়। কমলাব জন্য একখানা ভাল শাড়ীর দাম যোগাইবার সাধ্য তার নাই, সে কেন কমলাকে পত্নীরূপে পাইতে ইচ্ছা করে? ইচ্ছা করার উপব ত কারও হাত নাই। রমেনেরও নাই। সুতরাং ইচ্ছা সে করে। কিন্তু এ জ্ঞান তাব আছে, তার ইচ্ছা সফল হওয়া উচিত নয়। ভালবাসা সে দমন কবিতে পারিবে না,—তার উচিত ভালবাসিযা সন্তুষ্ট থাকা। তাব বেশী অগ্রসর হওযা তার পক্ষে নিষিদ্ধ। সহজভাবে সে যদি মিশিতে পাবে ত ভাল কথা। তা না পাবিলে তার পক্ষে কমলার সহিত মেশাও অন্যায হইবে; ধর, যদি কমলা তাকে এমন ভালবাসিয়া ফেলে যে, তাকে ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিতে রাজি না হয়, তা হইলে অবস্থা ঘোর সঙ্কটজনক হইবে। এই সঙ্কটেব কথা ভাবিতেও সুখ! কিন্তু হায় দুরাশা! তার মত দবিদ্রকে না কি দুলালী কমলা ভালবাসিবে? রাজকন্যা না হোক্, কমলাব মত মেযের পক্ষে রাজপুত্রই শোভা পায়। সে রাজরাণী হইবার যোগ্য, তাতে সন্দেহ নাই। তার সহিত কমলাব ভাগ্য মিলিত হইলে সে চিরদুঃখিনী হইবে। ভগবান্ তাকে সেই পথ হইতে রক্ষা করুন।

প্রথম পরিচয়ের কথা মনে করিতে তার সমগ্র মন প্রীতিতে ভরিয়া যায়। কমলা আস্তে আস্তে নম্রভাবে কথা বলে। কিন্তু কৈ, তার কথার মধ্যে অবজ্ঞার কোন ইঙ্গিত নাই ত। কমলা অবশ্যই রমেনদের প্রতিবেশী হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সে আসা অবধি রমেন একদিনও কোন প্রকার অন্যায়

কৌতূহল দেখায় নাই। দিনের মধ্যে অনেকবার সাক্ষাৎ হইয়াছে, কিন্তু ইচ্ছা করিয়া নহে, আর সে জন্যই লজ্জিত হইবার কারণ ঘটে নাই। কমলাকে দেখিতে ভাল লাগে, তবু তাকে লুকাইয়া দেখিবার প্রবৃত্তি রমেনের নাই। রমেনের অন্তঃকরণ অত্যন্ত ভদ্র অন্তঃকরণ। তা ছাড়া পাশের বাড়ীতে যে রহিয়াছে, তাকে লুকাইয়া দেখিবার প্রয়োজনই বা কি? দিনের মধ্যে আপনা হইতেই কতবার দেখা হয়, তার কি ইয়ত্তা আছে। আশ্চয্য! কমলার দৃষ্টি নত, এবং সহজ, সে চোখ ফিরাইয়া লয় না। রমেনকে দেখিয়া লজ্জার ভাণ করে না বা হাতের কাজ ফেলিয়া পলায় না। অথচ, রমেন মনে মনে বুঝিতে পারে মেয়েটি তাকে উপেক্ষা করিতেছে না, এমন ভাব দেখাইতেছে না, যেন তাকে দেখিতে পায় নাই। বরং সে যে দেখে তা স্পষ্টই বুঝা যায়। চোখে চোখ পড়িলেই কমলা হয়ত তা দোষের মনে করে না। তার আচরণে মনে হয় সে রমেনকে ভদ্রলোক ও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করে। রমেনের ভারী ভাল লাগে কমলার এই ভাব, ভারী ভাল লাগে।

কমলাদের বাড়ী হইতে সেদিন কমলার একটা সেমিজ উড়িয়া আসিয়া রমেনদের ছাতে পড়িয়াছিল। রমেন সে কথা জানিত না। বিকাল বেলা কমলার চোখে চোখ পড়িবা মাত্র সে রমেনকে ডাকিয়া বলিল, 'দেখুন—'

রমেন আশ্চর্য্য হইয়া চাহিল। নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। এতদিন কাছে আসিয়াছে, কিন্তু এ দুই বাড়ীর কেহ কাহারও সঙ্গে কথা কহে নাই। মেয়েরাও না। কাজেই আজ কমলা রমেনকে ডাকিবে, ইহা আশ্চর্য্য নয় ত কি?

কমলা পুনরায় ডাকিল, 'দেখুন—'

সন্দেহ করা চলে না। রমেন জানালার খুব নিকটে আসিয়া বলিল, 'আমায় বল্‌ছো কিছু?'

'হাঁ, আমার সেমিজটা আপনাদের ছাতে উড়ে পড়েছে। যদি তুলে এনে দেন।'

স্পষ্ট। কথার মধ্যে লজ্জিতের ভাব হয়ত ছিল, কিন্তু ধ্বনি অসঙ্কোচ।

অন্য কেহ এরূপ আদেশ করিলে রমেন কি মনে করিত, জানি না। যে বাড়ীতে রমেন থাকে সেটা তাদের নিজেদের বাড়ী নয়। তার পর ছাত তাদের নয়। দোতালার তিনটি মাত্র ঘর তারা ভাড়া লইয়াছে। এই তিনটি ঘরের মধ্যে তার ঘরটাই কমলাদের ঘরের লাগালাগি। সেখানে তারা দু ভাইয়ে থাকে, পড়ে, খায়, শোয়। কিন্তু কমলার কথায় সে অসুখী হইল না। সেমিজ আনিতে সে ছাতে ছুটিয়া গেল। অত্যন্ত তুচ্ছ সাধারণ সাদা লংক্লথের সেমিজ। কিন্তু তার ইচ্ছা হইল উহা বুকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করে। সে কিছুই না করিয়া নিজের ঘরে আসিয়া তা কমলার দিকে ছুড়িয়া দিল: 'এই নাও সেমিজ।' কমলা একবার তার দিকে তাকাইয়া লুফিয়া লইল।

রমেন একেবারে কমলাকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিল। মনে মনে একটু হয়ত ইতস্তত করিয়াছিল, কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র। তার মনে হইল কমলাকে 'তুমি' সম্বোধন করাই স্বাভাবিক, 'আপনি' বলা অস্বাভাবিক। বয়সে কমলা নিশ্চয়ই তার চেয়ে ঢের ছোট, অন্তত দশ বৎসরের ছোট। সুতরাং কোন প্রকার ক্ষমা ভিক্ষা করিবার চেষ্টা না করিয়া 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিল। ভাবিল, কমলার জন্য অন্তরের মধ্যে যে প্রীতি সঞ্চিত হইতেছে, তা কি 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিলেই চাপা পড়িবে? তার চেয়ে হৃদয় যা বলিতে চায়, তা বলিতে দেওয়াই ভাল। অন্তত এখানে কপটতার হাত এড়ান যাইবে। কমলা সম্বন্ধে যদি তার কোন প্রকার মানসিক দুর্ব্বলতা না থাকিত, সে তাকে অনায়াসে 'তুমি' বলিতে পারিত। 'আপনি' বলিয়া সে-দুর্ব্বলতার সে প্রশ্রয় দিতে চায় না।

কিন্তু কমলা অমন ভাবে তার দিকে চাহিল কেন? সে কি তাকে 'তুমি' বলিতে শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইয়াছে বা রাগ করিয়াছে? অনেক ক্ষণ ভাবিয়াও সে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কমলা কিন্তু তাকে তার কষ্টের জন্য

কৃতজ্ঞতা জানাইল না। তার মুখ দিয়া কোন প্রকার শুষ্ক ধন্যবাদ বাহির হইল না। রমেন কি তার মুখ হইতে কোন শিষ্টতাসূচক বাক্য শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিল এবং তা শুনিতে না পাইয়া নিরাশ হইল? বলিতে পারি না। তার মনে হইল, ছোট একটা কাণ্ড ছোট ও তুচ্ছই রহিয়া গেল। উহার ভিতরকার বৃহৎ সম্ভাবনাটা মারা গেল। হয়ত সংসারে কোন বস্তুই ধ্বংস পায় না। রমেনের জীবনে এই তুচ্ছ ঘটনা নিরর্থক না হইতেও পারে। সে কথা ভাবিয়া রমেন তখনকার মত কিন্তু কোন সান্ত্বনা পাইল না।

কমলা যে রাগ করে নাই বা অসন্তুষ্ট হয় নাই, তার প্রমাণ পাইতে বেশী দেরী হইল না। সেদিনকার আলাপ ঐ পর্য্যন্ত। তখন কে জানিত যে অল্পদিনের মধ্যে কমলাদের সহিত তাদের এতটা ঘনিষ্ঠতা হইবে? এই বিপুল পৃথিবীতে অনেক কিছুই সম্ভব হয়। সুতরাং অল্পকালের মধ্যেই যে দুই পরিবারের মধ্যে যাতায়াত এবং হৃদয়ের আদান-প্রদান হইতে লাগিল, তাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। রমেন কতদিন গিয়া কমলাদের বাড়ীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইতে লাগিল, এমন কি, একা কমলার সহবাসে বহুক্ষণ কাটাইয়া দিল। আবার কমলা এ বাড়ীতে আসিয়া সহজে তাদের পরিবারের সকলের সঙ্গে মিশিল, তার ঘরে বসিয়া কখনও দুই ভাইয়ের সহিত, কখনও বা একা তার সহিত, গল্প করিল। ইহা সংঘটিত হইতে কোন দৈবের প্রয়োজন হইল না, কোন অতিপ্রাকৃত বা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটিল না। এবং ইহা সংঘটিত হইবার পর আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল না। এই দুই পরিবারের প্রত্যেক মানবের জীবন-যাত্রা যে পথে হইয়াছিল, সে পথেই রহিল। যেমন সহজে আমরা নিঃশ্বাস গ্রহণ করি, যেমন সহজে আমরা খাদ্য গ্রহণ করি, তেমনই সহজে এই দুই পরিবারের মধ্যে হৃদ্যতা জন্মিল। অন্তর লোকে কোথাও কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিল কি না এবং তা দ্বারা কাহারও জীবন কোনভাবে প্রভাবান্বিত হইল কি না, সে খবর আমরা পরে লইব। আপাতত প্রতিদিনকার বাহিরের জীবন যে অবিরাম গতিতে পূর্ব্বপথে বহিয়া চলিল, তাতে সন্দেহ নাই।

নদীতে ঢিল ছুড়িলে ঢেউ উঠে। ঢিল আস্তে ছুড়ি আর জোরে ছুড়ি, ঢেউ উঠিবেই। নিস্তরঙ্গ এক মানব-মনকে যদি অন্য মানব-মন স্পর্শ করে, উভয় মানব মনেই অল্প-বিস্তর তরঙ্গ উঠে। মানুষের মন কখনও শূন্য থাকে না। দুজনে যদি কথা না বলিয়াও কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়ায়, তবু দুজনের মনে তরঙ্গ উঠে। একের চিন্তারাশি অন্যের চিন্তারাশিকে গিয়া ধাক্কা দেয়। সুতরাং এই দুই পরিবারের প্রত্যেকে অপরের দ্বারা কতকটা প্রভাবান্বিত হইবে, তা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু এক পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্র ভিন্ন, প্রত্যেকের একটা নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে। সুতরাং এক মনের উপর অন্য মনের প্রভাব সর্ব্বত্র সমান নয়। ধর, রমেনদের পরিবারের সকলে কমলাকে এক চোখে দেখে না। হয়ত কমলাকে ভালবাসে সকলেই, একটি সুন্দরী শান্ত মেয়েকে ভালবাসা সহজ, কিন্তু রমেন তাকে যে চোখে দেখে অন্য কাহারও সে চোখে দেখা অসম্ভব। রমেনের তাকে বুঝিবার ও জানিবার জন্য যে আগ্রহ, অন্যের তা না থাকাই স্বাভাবিক। তথাপি মানুষের এমন বিচিত্র স্বভাব যে, সে চায় তার যাকে ভাল লাগে, তার প্রিয়জনদেরও তাকে ভাল লাগুক্। কমলাকে ভাল না লাগিবার কাহারও কোন কারণ ছিল না। বরং কমলারা রমেনদের চেয়ে সঙ্গতিপন্ন। সংসারে ধন যেরূপ প্রত্যেক মানুষের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, এমন আর কিছুই নহে। ধনের হিসাবে কমলারা উর্দ্ধে অবস্থিত, স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং কমলারা যদি রমেনদের সহিত মেশে, তা সৌভাগ্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কমলাদের সঙ্গ নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়। তারপর কমলাদের বাড়ীর মেয়েরা সকলেই নিরহঙ্কার। অন্যান্য দোষ আছে এবং সে সব দোষ চোখে পড়ে, কিন্তু তারা ধনের জাঁক করে না। মানুষ কোন প্রকার জাঁকই সহ্য করিতে প্রস্তুত নয়। তথাপি সাধারণত গরীবের পক্ষে যে জাঁক সহ্য না করিয়া উপায় নাই, তা হইতেছে ধনের জাঁক। কমলাদের যে এই জাঁক প্রকাশিত হয় না, এজন্য রমেনেরা কৃতজ্ঞতা বোধ করে। সুতরাং

দুই পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির পক্ষে কোন অন্তরায় উপস্থিত হয় না।

কমলার আচরণে রমেনের ছোট ভাই রণেন মুগ্ধ। সে একেবারে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে: 'এমন মেয়ে হয় না।' যেন সে অনেক মেয়ে দেখিয়াছে। তার বিদ্যার দৌড় ত তার দাদাব মত। কমলা তার চেয়েও বয়সে ছোট, তথাপি সে তাকে শ্রদ্ধা করিয়া চলে। দেখিয়া মনে হয়, সে মনে মনে একটা কিছু ভাবিয়া লইযাছে। তার ভাব দেখিয়া রমেন মনে মনে হাসে।

কিন্তু রমেনের ভগিনীরা কমলা সম্বন্ধে তত উৎসাহী নহে। 'মন্দ নয়', এই হইল তাদের সুচিন্তিত মত। তাই বলিয়া তারা মনে করে না, এমন মেয়ে কোথাও পাওয়া যায় না। না রূপে, না গুণে। এই লইয়া তাদের সঙ্গে রণেনেব অবিরত তর্ক ও ঝগড়া হয়। রণেন হারিবার পাত্র নয়। তাদের হিংসক বলিয়া গালি দেয়। উত্তরে বোনেরা তাকে অন্ধ, অনভিজ্ঞ, বলিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। কয়টা মেয়েকে সে দেখিয়াছে? কয় জনকে সে ভাল করিযা জানে? নাম করুক্ দেখি রণেন। বলা বাহুল্য, রণেন বেশী নাম করিতে পারে না। নাই বা জানিল বেশী মেয়েকে। যে কয়জনকে জানে—। বোনেরা বাধা দিয়া বলে, জানে! সত্যই সে কাহাকেও ভাল করিয়া জানে না কি? মেয়েদের চেনা অত সহজ নয়। মেয়েরা যে নিজেদের স্বরূপ কিরূপ লুকাইয়া রাখিতে পারে, রণেন তার কি বুঝিবে? বোনেরা মেয়ে হইয়া যখন এ কথা বলে, তখন রণেনকে চুপ করিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু মনে মনে সে গজ্‌রাইতে থাকে। যত তাব বোনেরা প্রমাণ করিয়া দেয় যে, কমলার সম্বন্ধে অত উৎসাহিত হইবার কিছু নাই, তত তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়, কমলার মত মেয়ে সচরাচর মেলে না।

কিন্তু বেচারার এই মত আর কেহ সমর্থন করে না। প্রথমত দাদার কাছে এ কথা উত্থাপন করাই মুস্কিল, দ্বিতীয়ত এ বিষয়ে তার মতামত যে কি, তা বোঝা যায় না। তার মনে মনে নিশ্চিত ধারণা রমেন কমলার

পক্ষপাতী। তথাপি কেন যে সে কখনও তার হইয়া কথা বলে না, তা বুঝিতে পারে না। বাপকে দেখিয়া মনে হয়, তিনি কমলাকে প্রীতির চোখে দেখেন। মোটের উপর বলা যাইতে পারে, রমেনদের বাড়ীর পুরুষেরা সকলেই কমলার পক্ষে অর্থাৎ কমলার সম্বন্ধে প্রশংসা করে, কিন্তু মেয়েরা তাকে তেমন বিশ্বাস করে না।

একদিন রণেন বলিয়া ফেলিয়াছিল, 'দাদা, কমলা যদি আমাদের বৌদি হয় ত বেশ হয়।'

রমেন রণেনের মুখের দিকে তাকাইল। রণেন কেন এ কথা বলিল? সে কি তার মনের অত্যন্ত গোপন কথা জানিতে পারিয়াছে? সে স্বভাবত চাপা। বাড়ীতে কমলার সম্বন্ধে কাহারও সহিত এমন কোন কথা বলে নাই যাতে কাহারও মনে তার মনোভাব সম্বন্ধে একটুও সন্দেহ হইতে পারে। অথচ তার ভাই আজ এই কথা বলিল। কিন্তু এই কথায় তার মনের মধ্য দিয়া কোন বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলিয়া গেল না। সে শুধু একটা গভীর নৈরাশ্য বোধ করিল। নিজের অবস্থা তার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। ভাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া তার মনে হইল সে সরলভাবেই ঐ কথা বলিয়াছে। তথাপি তাকে সাবধান করিয়া দিতে হইবে। যা কখনও সম্ভব হইবার সম্ভাবনা নাই, তা লইয়া আলোচনা গোড়াতেই বন্ধ করিয়া দেওয়া দরকার।

সুতরাং রণেনকে কঠোরভাবে বলিতে হইল, 'রণেন, এ রকম কথা তুমি আর কোন দিন মুখেও উচ্চারণ করবে না।'

রণেন দাদার কঠোরতায় বিস্মিত হইল। সে এমন কিছু খারাপ কথা বলে নাই। বধূ হিসাবে কমলা কি রমেনের নিকটও বাঞ্ছনীয় নয়? তার এতদিনকার ধারণা কি ভুল? আর রমেন কেন এই সামান্য বিষয়ে এমন অনাবশ্যক কঠোরতার সহিত শাসন করিল? সে ত এ প্রস্তাব হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিত। তা করিল না কেন?

রমেনের কাছে ধমক খাইয়া রণেন মার কাছে গেল। ভাগ্যক্রমে সে

যা চাহিতেছিল, তাই হইল। বোনেরা কাছে ছিল না। সে মাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মা, কমলাকে কি তোমার ভাল লাগে না ?'

মা তার মুখের দিকে তাকাইলেন, 'কেন বল্‌ত ?'

'তুমি বল, ভাল লাগে কি না।'

'লাগে।'

'সত্যি বল্‌ছ ?'

'মিথ্যা কেন বল্‌ব, বাবা ?'

'আচ্ছা, মা, কমলা যদি আমাদের ঘরের বউ হয় ত কেমন হয় ?'

মা ভুল করিলেন। ভাবিলেন, কমলাকে রণেনের খুব পছন্দ হইয়াছে এবং বিবাহ করিতে চায়। তা ছেলে কি নিজে না আসিয়া পারিত না ? নিজের বিবাহের কথা না হয় নিজ মুখে নাই বলিত। ছেলেব মনের কথা জানিতে পারিলে, তিনি নিশ্চয়ই কিছু ব্যবস্থা করিতেন। তারপর বড় ভাই এখনও বিবাহ করে নাই। সে কি বলিয়া বিবাহ করিতে চায় ? সে কি এখনই বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়াছে ? কৈ, এ বিষয়ে রমেন ত কোন প্রকার আগ্রহ দেখায় না।

তৎক্ষণাৎ মার জবাব না পাইয়া রণেন অধীরতা প্রকাশ করিল, 'কি মা, কি বল।'

দেখ, ছেলের অধীরতা দেখ। বলিলেন, 'তুই কি কমলাকে বিয়ে কর্‌তে চাস্‌ ?'

রণেন জিব কাটিল। দেখ, মায়ের কাণ্ড দেখ। রণেন আসিল রমেনের জন্য বলিতে, আর তিনি মনে করিলেন সে নিজের জন্য ওকালতি করিতে আসিয়াছে। দূর্ কর্ ছাই ! রণেন রাগ করিয়া বলিল, 'মা, তোমার কি বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পাচ্ছে ? দাদার বিয়ে না হতে আমি নিজের বিয়ের কথা ভাব্‌ব ?'

এতক্ষণে মা বুঝিলেন। 'ওঃ তাই বল্, রমেনের ঘট্‌কালি কর্‌তে এসেছিস্ ?'

'যদি আসি, তাতে দোষ কি ?'

'না, দোষের কথা নয়। আমি জান্‌তে চাই, রমেন তোকে বলেছে কি না।

সে বুঝি মনে মনে কমলাকে পছন্দ করে ? আমার কাছে কথা পাড়্তে পাঠিয়েছে ?'

ইহারা কি কিছুতেই সোজা পথে যাইবে না ? দাদা পাঠাইয়াছে মায়ের মন জানিতে ? রক্ষা কর ! এই কথা বলিয়া তার কাছে যে শাসন লাভ করিয়াছে, তা একবার যদি দেখিতে ! বরেন গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, 'কেন যে মা তোমরা যা তা ভাব, জানি না। দাদা জানেই না, আমি তোমার কাছে কমলার কথা তুলছি। আমি কি নিজের মন থেকে এ প্রস্তাব তুলতে পারি না ?'

'তা পারিস্।'

'তবে বল্ছি, আমিই জানতে চাই, তোমার কি মত ?'

'তোর দাদা তোকে পাঠায় নি ?'

'না গো না।'

'তোর বাবা ?'

'না। উঃ, তোমাদের সঙ্গে কথা বলাও ঝকমারি।'

তখন মাতা কমলার বেশ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেন। স্বীকার করিলেন যে, তার মত মেয়েকে ঘরের বধূরূপে পাওয়া অনেক সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু সে সৌভাগ্য কি হইবে ? কমলার বাবার অর্থ আছে। সুতরাং তিনি তাদের মত অবস্থাপন্ন লোকের ঘরে কেন মেয়ে দিতে যাইবেন ? এ প্রকার আশা করাও পাগ্লামি মাত্র। কমলা নানা গুণে ভূষিতা। তাকে তাঁর পছন্দ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু পছন্দ হওয়া এক কথা, আর তাকে বধূরূপে পাওয়া অন্য কথা। প্রত্যেকের নিজ অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন থাকা উচিত। কমলার মা নিজেদের অবস্থার কথা ভুলিতে পারেন না। সুতরাং কমলাকে তাঁর ভাল লাগিলেও তিনি পুত্রবধূ রূপে কল্পনা করেন না। সে প্রতিবেশী-কন্যা মাত্র।

মা যে মনে মনে কমলার মূল্য বুঝেন, বরেন ইহাতেই সন্তুষ্ট হইল। তা দাদাও কিছু এমন ফেলনা ছেলে নয়। একটু অলস, এই যা। তা না হইলে সে

কি না করিতে পারিত? অন্যে যাই ভাবুক, দাদার মনুষ্যত্বের প্রতি তার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। সে মনে করে লোকে দাদার গুণ যথার্থ বুঝিতে পারে নাই, সে নিজেকে জাহির করিতে জানে না বলিয়া পারে নাই, সে জন্য সে নিজের ও পরিবারের জন্যও কিছু করিতে পারিতেছে না। সে নিজের শক্তি সম্বন্ধে অন্ধ। সাহস করিয়া দাবী করিতে পারে না। অন্যেরা অনেক কম যোগ্যতা লইয়া জোরের সহিত দাবী করে এবং জীবনের পথে জয়যুক্ত হয়। রমেন কি কোন দিন নিজের শক্তি উপলব্ধি করিতে শিখিবে না? প্রয়োজন শুধু তার নিজেকে জাহির করা। সংসারে ভাল মানুষ হইয়া বসিয়া থাকিলে চলে না। তোমার কি গুণ আছে, কেহ আসিয়া তা অনুসন্ধান করিবে না। তোমার নিজেকেই চেষ্টা করিয়া দশ জনের সম্মুখে নিজ গুণ প্রকাশিত করিতে হইবে। নিজের ঢাক নিজে না পিটাইলে কেহ তোমাকে জিজ্ঞাসাও করিবে না।

রণেন যা বুঝে রমেন তা বুঝিতে পারে না কেন? রণেনকে নিজের কাছে স্বীকার করিতে হয় যে, রমেনের বুদ্ধির দোষ আছে। সৃষ্টিকর্তা তাকে সব দিয়াও কোথায় একটা অভাব রাখিয়া দিয়াছেন। রমেনকে বলিলে সে জবাব দেয়—ইহাই তার বিধিলিপি, অদৃষ্ট। এক কালে অদৃষ্টে সে বিশ্বাস করিত না। মনে করিত, মানুষ পুরুষকারের বলে সকল প্রকার বাধা জয় করিতে পারে। অদৃষ্টে বিশ্বাস কাপুরুষেরা করে। কিন্তু এখন জীবনে বহু বিফলতার অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়াছে। যারা জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছে, অথবা যারা কোন দিন বিফলতার মুখ দেখে নাই, সেই সৌভাগ্যবানেরা বড় গলায় পুরুষকারের কথা প্রচার করিতে পারে, রমেন নয়। এক অদৃশ্য শক্তি মানুষের পথ ঠিক করিয়া দিতেছে। মানুষের সাধ্য নাই তা লঙ্ঘন করে। বাহুবল প্রয়োজন। যুদ্ধ করা প্রয়োজন। বিনা সংগ্রামে পরাস্ত হইলে চলিবে না। রমেনের যতদিন সামর্থ্য থাকিবে সে অদৃষ্টের বিরুদ্ধে লড়িবে। কিন্তু অদৃষ্টকে স্বীকার না করিয়া আর তার উপায় নাই। সে স্থির বুঝিয়াছে, নিজের চেষ্টায় সে তার ভবিষ্যৎকে কিছুমাত্র সুখময় করিয়া গড়িতে

পারিবে না। যদি হঠাৎ কোন দিন কিছু হয়, তাহা হইলেই পারিবে। এমন কি, দৈবযোগে সে ধনীও হইয়া যাইতে পারে। নিজে বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়াও পারে। হাজার চেষ্টা করিয়া ত দেখিয়াছে, কিছু হয় নাই। যদি কিছু হয়, কোন্ পথে হইবে, সে বলিতে পারে না। সে যে মনে মনে সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, তা নয়। চির জীবন দারিদ্র্যের মধ্যে কাটানই তার অদৃষ্ট হইতে পারে। ছট্ফট্ করিলেও তা হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই। ছট্ফট্ করিয়া লাভ কি? বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার মনে নৈরাশ্য প্রবলতা লাভ করিতেছে। আর কবে দৈব উপায়ে সে সফলতা লাভ করিবে? একটি বৎসর অতিক্রান্ত হয়, আর রমেনের মনের অন্ধকার আরও বাড়িয়া যায়। তবে মানুষের মনের আশা না কি সহজে মরিতে চায় না। তাই রমেন এখনও স্বপ্ন দেখা ভুলিয়া যায় নাই। বিশেষ, কমলার সংস্পর্শে আসা অবধি এই স্বপ্ন যেন তাকে মাঝে মাঝে পাইয়া বসে। তার আচরণে তা যে প্রকাশিত হয়, তা নয়। সে নিজেকে বেশ সংযত করিয়া রাখিতে পারে। কিন্তু সে নিজের মনে জানে, মাঝে মাঝে তার তৃষিত হৃদয় হাহাকারে ভরিয়া উঠে। কোথাও একটা ঘর বাঁধিতে হইবে। নিতান্ত আপনার ঘর। সেখানে স্থান থাকিবে শুধু তার এবং প্রিয়ার। এই প্রিয়া যে কমলাই হইবে, এমন কোন কথা নাই। এমন কোন মেয়ে যে তাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে। কমলা হইলে ভাল হয়। কিন্তু তখনই মনে হয় ঘর বাঁধিবে কি দিয়া? ঘর বাঁধিবার সম্বল তার কৈ? নিজেদের অবস্থার কথা ভাবিয়া তাকে ঘর বাঁধিবার আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে হয়।

ঘর বাঁধিবার পক্ষে এমন কি গুরুতর বাধা আছে? তার চেয়েও খারাপ অবস্থার লোকেরা কি স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া সুখে-দুঃখে ঘরকন্না করিতেছে না? হইলই বা অল্প আয়। সকলের আয় আর কিছু বেশী থাকে না। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক দরিদ্র। দরিদ্র লোকদের পরিবার থাকিবে না, এমন কথা কে বলিল? তার ত ধনী হইবার কোন আশা নাই। তবু কি সে এমন

ভাবে নিজের জীবন বহিয়া যাইতে দিবে? পারিবারিক জীবনের বিমল সুখ সে কি কোন দিন উপলব্ধি করিতে পারিবে না? তার যা আয় তাতে তার পক্ষে স্ত্রী ও সন্তান প্রতিপালন করা কষ্টকর হইলেও অসম্ভব নহে। কিন্তু রমেন মনে করে এটা নিতান্ত স্বার্থপরের মত কথা। শুধু নিজের সুখের কথা ভাবা তার পক্ষে অন্যায়। সে বিবাহ করিতে পারে বটে, কিন্তু তা হইলে তাকে তার পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে এবং পরিবারের কাহাকেও আর কোন প্রকার সাহায্য করিতে পারিবে না। তার সাহায্য যত সামান্যই হোক্, সে মনে করে তা প্রয়োজনীয়। তার চেষ্টার ফলে সে যে পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য আরও বাড়াইতে পারে না, এ জন্য সে মর্ম্মান্তিক দুঃখিত। নিজ পরিবারের লোকদের আরও সুখে রাখিতে পারিলে সে তৃপ্ত হইত। এরূপ অবস্থায় সে কেমন করিয়া নিজের বিবাহের কথা ভাবিতে পারে? বর্ত্তমান অবস্থায় তার একেবারে বিবাহ না করাই হয়ত শ্রেয় হইবে। এই চিন্তা তার মনকে তৃপ্তি দেয় না। কিন্তু তথাপি সে নিজের কথা আগে ভাবা অন্যায় বলিয়া মনে করে। পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে হয়ত তা ততটা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না যতটা সে মনে করিতেছে। কাল যদি সে মরিয়া যায়, তবু ত পরিবারের প্রত্যেক লোককেই কোন রকমে সংসার-পথে চলিতে হইবে। তার জন্য শোক করিবে সকলেই, পরম দুঃখে চোখের জল ফেলিবে, কিন্তু জীবন-যাত্রা ত বন্ধ হইয়া যাইবে না। জীবন বড় কঠিন প্রভু। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ সে কাজ আদায় করিয়া লইবেই। সুতরাং নিজের দামটা সে কি বড় বেশী করিয়া ধরিতেছে না? তাকে বাদ দিলে সংসার অচল হইবে না। তবে কেন সে মনে করিতেছে, সে নিজে ঘর বাঁধিলে পরিবারের ক্ষতি হইবে? কিছু ক্ষতি হয় ত হইবে, কিন্তু তা সামান্য। আর সময়ে সে ক্ষতি সহিয়া যাইবে। ইহা লইয়া এত মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন আছে কি? এক এক সময়ে রমেনের মনে হয়, এত দিক্ ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিবার দরকার নাই। সে নিজের পথ নিজে দেখিবে। কিন্তু পরিবারের চিন্তা সে এড়াইতে

পারে না। পারিবারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কাছে সে এ পর্য্যন্ত নিজেকে বলি দিয়া আসিয়াছে। ইহাকে দুর্ব্বলতা বল, বলিতে পার। কিন্তু ইহার হাত সে অতিক্রম করিতে পারে নাই। সে যে কিসের আশা করিতেছিল সেই জানে। বিবাহ করিবে না, এমন প্রতিজ্ঞা তার মনে ছিল না। কিন্তু বিবাহ করিবার সুযোগ কই? কোন একদিন হয় ত সে বিবাহ করিবে। কিন্তু কখন, কি অবস্থায়, তা আজ বলিতে পারে না। তার বন্ধুবান্ধবেরা কিন্তু মনে করে, সে ভীরুতাবশত কোনপ্রকার দায়িত্ব লইতে চায় না। তাকে এই ভীরু অপবাদ সহ্য করিতে হয়। তার পক্ষে প্রকৃত কারণ বুঝান সহজ নয়, আর বুঝাইতেও চায় না। এটা একপ্রকার আত্মত্যাগ। কিন্তু এই ত্যাগের কথা লোকের কাছে বলিয়া ফল কি? লোকের কাছে শুধু এই কথা বলে যে, তার অবস্থা এমন নয় যে, সে বিবাহ করিতে পারে, যদিও সে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক নহে।

রণেন দাদার বিবাহের কথা আলোচনা করিল বটে, কিন্তু তা বোনেদের নিকট গোপন রহিল না। বোনেরা রণেনকে শাসন করিল। দাদা যখন নিজে এ বিষয়ে কোন কথা উঠায় নাই, তখন সে কেন মাথা ঘামাইতেছে? কমলাকে সে যত ভাল মেয়ে মনে করিতেছে, তত ভাল মেয়ে সে নয়। তার ভাল না হওয়ার স্বপক্ষে তারা অনেকগুলি প্রমাণ উপস্থিত করিল। সে লজ্জাহীনা, রমেন বা রণেনের সঙ্গে সে দিব্য অসঙ্কোচে কথা কয়, ইহা তারা লক্ষ্য করিয়াছে। তাদের সঙ্গে উচ্চ হাস্য করে পর্য্যন্ত। ইহা যে কোন মেয়ের পক্ষে দোষাবহ। কমলার পক্ষে আরও দোষাবহ এইজন্য যে, সে দেখায় সে নম্র, কিন্তু আসল নম্রতা তার কিছুই নাই। তার স্বভাবের মধ্যে যথেষ্ট ভাণ আছে। সে অভিনয় করিতে এমন সুনিপুণ যে, দেখিয়া মনে হইবে, মেয়েটি কি সরল। আঠার বছরের মেয়ে কখনও অত সরল, অত অনভিজ্ঞ, থাকিতে পারে না। তার বিদ্যার দৌড় সামান্য। ইস্কুল কলেজে লেখাপড়া শিখে নাই। তার হেতু এই দেখান হয় যে, একবার অসুখে ভুগিয়াছিল বলিয়া তার

বাবা পড়াশুনা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। আসলে তার মাথা নাই। পড়াশুনা করিবার মত শক্তি তার নাই। রমেনের মত বিদ্বান্ লোকের এরূপ মূর্খ বধূ শোভা পায় না। তার কতকটা সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু বাংলা দেশে তার চেয়ে সুন্দরী মেয়ের অভাব নাই। অবশ্য তাদের ধন আছে। কিন্তু তা গুণ না বলিয়া দোষ বিবেচনা করা উচিত। কারণ, তাদের পরিবারে আসিলে সে কখনও ভুলিতে পারিবে না যে, সে তাদের তুলনায় বড়লোকের মেয়ে। তা হইতে অশান্তির সৃষ্টি হইবে। দেখিয়া মনে হয় বটে যে, সে নিরহঙ্কার, কিন্তু তা ভুল। স্ত্রীলোকের আসল পরিচয় অনেক সময় তার বিবাহের পর পাওয়া যায়, আগে নয়; এবং বোনেদের মনে কোন সন্দেহ নাই যে, বিবাহের পর কমলা যে রূপে দেখা দিবে তাতে রমেনের অসুখের কারণ ঘটিবে।

বোনেরা নিজেদের এই সব মন্তব্য শুধু রণেনকে শুনাইয়া ক্ষান্ত হইল না, রমেনের নিকট গিয়া সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিয়া বলিল। তারা ধরিয়া লইল, রমেন কমলাকে বিবাহ করিবে বলিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছে। সেজন্য তারা যথেষ্ট উপদেশ বর্ষণ করিতে কার্পণ্য করিল না। রমেন তাদের কথাবার্ত্তায় চমৎকৃত হইল। ইহার অর্থ কি? কমলাকে সে বিবাহ করিবে, এ কথা কেন উঠিল? সে স্পষ্টই বলিল, 'কমলার সম্বন্ধে এত সব কথা আমায় কেন শোনাচ্ছ, আমি বুঝ্‌তে পারি না।'

'বাঃ তোমায় শোনাব না ত কাকে শোনাব? তুমি কমলাকে বিয়ে কর্‌তে চাচ্ছ না?'

রমেন চোখ ঘূর্ণিত করিল, 'কে বলেছে এ কথা?'

'কেন, রণেন।'

'রণেন বলেছে এই কথা?'

'রণেনই ত।'

'ডাক রণেনকে। আমি তোমাদের সাম্‌নে জিজ্ঞাসা কর্‌তে চাই।'

রণেনকে ডাকা হইল। তার দিকে কঠিন ভাবে চাহিয়া রমেন বলিল, 'হ্যা রে রণেন, আমি তোকে বলেছি, আমি কমলাকে বিয়ে করতে চাই ?'

'না ত।'

রমেন বোনেদের দিকে তাকাইল। কিন্তু তারা দমিবার পাত্র নয়। তারা বলিল, রণেন ঠিক ঐ কথা না বলিলেও, যা বলিয়াছে, তার অর্থ ঐ। রণেন তাও অস্বীকার করিল। সে বলিল, সে যা বলিয়াছে, নিজের দায়িত্বে বলিয়াছে, তার দাদা কিছুই জানে না।

'কি বলেছিস্ তুই ?'

রণেন দেখিল, বিপদ্। দাদার কাছে তাড়া খাইয়া সে মাকে যা বলিয়াছে, তা যে আবার তাকে তাড়া করিবে, সে ভাবিতে পারে নাই। সত্য কথা বলিলে রমেন খুসী হইবে না, তা সে জানিত। তথাপি সে আনুপূর্ব্বিক সত্য কথা বলিল। রমেন জিজ্ঞাসা করিল, রণেন যদি বানাইয়া কোন কথা বলিয়া থাকে ত সেজন্য কি তাকে দায়ী হইতে হইবে ?

বানাইয়া কথা বলা ! বোনেরা বলিল, 'আচ্ছা, বুঝ্‌লাম, রণেন বলেছে। কিন্তু রণেন আর কিছু ছেলেমানুষ নয়। তোমার ভাব দেখেই বলেছে। তুমি সত্য করে বল দেখি, কমলাকে বিয়ে করতে চাও কি না।'

রমেন দৃঢ় ও স্পষ্টস্বরে বলিল, 'না।'

এতটা দৃঢ়তার প্রয়োজন ছিল না। বলিবার পর সেও বুঝিল। তা ছাড়া ভবিষ্যতের কথা কেহ বলিতে পারে না। আর সম্পূর্ণ সত্য কথা বলিতে হইলে বলিতে হয়, হয়ত চাই, কিন্তু করিব না। সে অনেক কথা এবং সে সব মনের কথা, ইহারা বুঝিবে না। সুতরাং তাকে জোরের সঙ্গে অস্বীকার করিতে হইল। তার মনে নাকি তখন অত্যন্ত ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল, তাই অত দৃঢ়তার সহিত বলিয়া বসিল, না।

রমেন আর যাই হোক্, তার সত্যবাদিতায় কেহ সন্দেহ করে না। সে যখন বলিয়াছে 'না', তখন তা লইয়া আর কোন তর্ক করিবার প্রয়োজন নাই।

তথাপি তাকে আরও একচোট্ উপদেশ দিয়া বোনেরা নিবৃত্ত হইল। রমেনের মনে হইল, তারা যেন তাকে গালাগালি দিয়া গেল।

বোনেরা চলিয়া গেলে রমেন রণেনকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুই মাকে কেন একথা বল্‌তে গেলি ?'

রণেন অকপট ভাবে জবাব দিল, 'এত সব কাণ্ড ঘট্‌বে জান্‌লে আমি কিছুই বল্‌তাম না। কিন্তু যে কথা আমার মনে উঠেছে, তা মার সঙ্গে আলোচনা কর্‌তে যাওয়া এতই কি অন্যায়, দাদা ?'

'অন্যায়', ইহা রমেন বলিতে পারে না। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় সে বিশ্বাসী। মাকে তার যা খুসী মনের কথা বলিবার অধিকার আছে। আর সে যা বলিয়াছে, তা নিজের দায়িত্বে বলিয়াছে। সুতরাং তাকে দোষ দেওয়া যায় না। রণেনকে কোন তিরস্কার রমেন করিতে পারিল না। সে তার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়া তাকে বিদায় করিয়া দিল।

কিন্তু রণেন তার এই পরাজয়ের শোধ অন্য প্রকারে তুলিল। সে একদিন রমেনের ঘরে কমলাকে একা পাইয়া সহসা বলিয়া বসিল, 'তুমি যদি দাদার বউ হও ত বেশ হয়।' কমলাকে তুমি বলা রণেনের পক্ষে কোন দিন কঠিন হয় নাই।

কমলা এ কথার কোন উত্তর না দিয়া যেমন গল্প করিতেছিল, তেমনি গল্প করিতে থাকে। রণেন তখন সহসা প্রশ্ন করিল, 'আচ্ছা, দাদাকে তোমার ভাল লাগে না ?'

'কেন, মন্দ কি ?'

কিন্তু এই প্রকার উত্তরে রণেন সন্তুষ্ট হইল না। কমলার মুখের দিকে চাহিয়া সে যখন তার মনের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিল না, তখন সহসা স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিল, 'দাদা যদি তোমায় বিয়ে কর্‌তে চায়, তুমি কি অমত কর্‌বে ?'

কমলার গৌরবর্ণ মুখ লাল হইয়া উঠিল, সিন্দুরের মত। কিন্তু সে

মুহূর্তের জন্য। ধীরস্বরে প্রশ্ন করিল, 'তোমার দাদা নিজে কি এই কথা জানিয়েছেন ?'

এই প্রতিপ্রশ্নে রণেন জব্দ হইয়া গেল। সে ইহার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। বিস্মিতও হইল। কমলা এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারে ? কি সে বুঝাইতে চায় এই প্রশ্ন করিয়া ? কিন্তু রণেন সত্যবাদিতায় রমেনের তুল্য। সুতরাং সে জবাব দিল, 'না।'

'তা হলে আমায় কেন জিজ্ঞাসা করছ ?'

'আমি তোমার মত জান্‌তে চাই।'

'কি বিষয়ে মত ?'

রণেন ভাবিল, বলে, 'তুমি দাদাকে ভালবাস কি না।' কিন্তু তা বাড়াবাড়ি হইয়া যাইবে। কাজেই বলিতে হইল, 'দাদাকে বিয়ে করা সম্বন্ধে তোমার আপত্তি আছে কি না।'

কমলা হাস্য করিয়া রণেনকে দ্বিতীয় বার বিব্রত করিল, 'আমার মতে কি আসে যায় ?'

'যায় না ?'

'না ত। আমার বিয়ে আমার মত নিয়ে হবে না।'

'তবু আমি তোমার নিজের মতটা জান্‌তে চাই।'

'এ বিষয়ে আমার কোন মত নাই।'

'মানে ?'

'মানে, তোমার দাদার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব আন্‌তে চাও ? বেশ ত, আমার বাবা মাকে বল গিয়ে। তাঁরা যা বল্‌বেন, তাই হবে।'

তবু রণেন মানে বুঝিতে পারে না। কমলা কি ধরা দিতে চায় না ? নিজের মনের কথা রণেনের নিকট প্রকাশ করিতে চায় না ? অবশ্য কমলা যদি রণেনের কাছে মন না খুলে, কিছু বলিবার নাই। রণেন তার নিজের হৃদয়ের ঔৎসুক্য চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছে। তার সুযোগ কমলা যদি

না দেয়, তা হইলে তাকে সে দোষ দিতে পারে না। কিন্তু এই প্রস্তাবে কমলা এমন কিছুই করিল না, যা তার কাছে আশা করা যাইতে পারিত। সে রাগ করিল না, পলাইয়া গেল না, অহেতুক লজ্জা প্রকাশ করিল না, অন্য দশ কথার মত ইহার আলোচনা করিল। কমলা যেন প্রহেলিকা। মধুর প্রহেলিকা! এই মিষ্ট আচরণের জন্য রণেনের কমলাকে খুব ভাল লাগে।

কমলা ও রণেনের এই কথোপকথনের মর্ম্ম রমেনের নিকট পৌঁছিল। তা যে পৌঁছাইয়া দিল সে রণেন নয়, কমলা নিজে। কমলা হাসিতে হাসিতে বলিল, 'দেখেছেন আপনার ভাইয়ের কীর্ত্তি।'

'কি ?'

'আপনার জন্য ঘট্‌কালি করে বেড়াচ্ছে।'

রমেন আশ্চর্য্য হইল। মায়ের সহিত রণেনের যে কথা হইয়াছে, তা কমলা জানিল কি করিয়া ? বোনেরা কি বলিয়া দিয়াছে ? না রণেন নিজে ? বড়ই লজ্জার কথা। ইহাদের কি কাণ্ডজ্ঞান নাই ? এ কথা কমলাকে না জানাইলে মহাভারত অশুদ্ধ হইত না। সে গম্ভীর ভাবে বলিল, 'আমি জানি।'

'ওঃ, জানেন! আমি ভেবেছিলাম, আপনি জানেন না। তা হলে ভাই আপনার সম্মতিক্রমেই ঘট্‌কালি করে বেড়াচ্ছে!'

'কার সঙ্গে বিয়ের ঘট্‌কালি করছে, শুনি।'

কমলা আঙ্গুল দিয়া নিজের দিকে দেখাইয়া দিল ও হাসিতে লাগিল। অমনি রমেন হাতজোড় করিয়া বলিল, 'কমলা, আমায় বিশ্বাস কর, আমি রণেনকে কখনও এ কাজ করতে বলিনি, বরং বকেছি।'

কমলা তাড়াতাড়ি রমেনের যুক্তকর ছাড়াইয়া দিল, 'ও কি করছেন, রমেন বাবু ? আমি যে আপনার থেকে ছোট, আমার কাছে জোড়হাত করলে আমাকে লজ্জা দেওয়া হয়, এটা বুঝেন না কেন ? আমি ত কিছু মনে করি নি। আপনি যে এর মধ্যে নাই, তা কি আমি বুঝতে পারি নি ?'

'এমন দুর্দ্দৈব, মা আর বোনেরা ভেবেছে, আমি ওকে শিখিয়ে দিয়েছি।'

'মা আর বোনেরা! তারা জান্‌ল কেমন করে?'

কমলার মুখের রেখায় রেখায় যে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল, তাতে রমেন বুঝিল কোথায় তার ভুল হইয়াছে। কমলা হয়ত বলিতেছে এক কথা, সে বুঝিতেছে অন্য কথা। সুতরাং সাবধান হইয়া পদক্ষেপ করা উচিত।

কমলা বুঝিল, এই পরিবারে এ বিষয় লইয়া আরও আলোচনা নিশ্চয় হইয়াছে। এমন হইতে পারে, রণেন পরিবারের মুখপাত্র রূপে পূর্ব্বাহ্লে সকলের মতটা জানাইয়া দিয়াছে। আগে মনে হইয়াছিল, রণেনের কথা তার নির্দ্দোষ খেয়ালপ্রসূত। এখন মনে হইল, ইহার পিছনে মাথা আছে। তার সুন্দর মুখে ছায়া দেখা দিল। রমেনকে তার প্রশ্নের উত্তর দিতে না দেখিয়া তার মনের সন্দেহ বাড়িয়া গেল। কিন্তু রমেনের জবাবের জন্য অপেক্ষা না করিয়া সে নিজেই বলিল, 'না, না, আপনার ভাই আমাকে একা পেয়ে প্রস্তাব পেশ করেছে।' এই বলিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণনা করিল।

শুনিয়া রমেন মনে মনে অদ্ভুত স্বস্তি বোধ করিল। রণেন ত আচ্ছা নাছোড়বান্দা। কমলা পর্য্যন্ত ধাওয়া করিতে ইতস্তত করে নাই। সে ভাইয়ের জন্য একটু স্নেহও অনুভব করিল। কিন্তু কমলার এই সরল উক্তিতে তার অন্তঃকরণের সমস্ত সঞ্চিত গ্লানি দূর হইয়া গেল। তখন তার মনে হইল, কমলা তার সঙ্গে যেরূপ অকপট ব্যবহার করিতেছে, সে ত তার সঙ্গে সেরূপ অকপট ব্যবহার করিতেছে না। কোন রূপ দ্বিধা না করিয়া কমলা তাকে রণেনের কথা বলিয়া দিল। তারও কি উচিত নয় বলা, কেন সে মা বোনের নাম উল্লেখ করিয়াছে? কমলা অবশ্য অনাবশ্যক প্রশ্ন করিতেছে না, জানিতে চাহিতেছে না, কি সে বলিতে চাহিয়াছিল। তথাপি তার নিজের উচিত কমলার নিকট অকপট থাকা। তার অত্যন্ত ইচ্ছাও হইল পূর্ব্বেকার সকল কথা খুলিয়া বলিতে। কিন্তু পারিল না। তার প্রকৃতি নাকি চাপা, তাই সে নিজের প্রকৃতিকে অতিক্রম করিতে পারিল না। তারপর, তার বোনেদের

যে রঙে রঞ্জিত করিতে হইবে, তা তার অপ্রয়োজনীয় বোধ হইল। কমলার নিকট তাদের ছোট করিতে মন সরিল না। সে তাদের বহু পূর্ব্বেই ক্ষমা করিয়াছে। এখন এরূপ ভাবে প্রতিহিংসা লওয়া সে কাপুরুষোচিত কাজ মনে করিল।

কমলা বলিল, 'আমাকে বিয়ে কর্‌বার আশা আপনি ছেড়ে দিন।'

রমেনের কান লাল হইয়া উঠিল, 'আমি ত কোন দিন সে কথা ভাবি নি।'

'ভাবেন নি ?'

'অন্তত আশা করি নি।'

'তাই বলুন। ভালই করেছেন।' তারপর একটুখানি দ্বিধা করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'বাবা আপনার হাতে আমাকে কিছুতে দেবেন না।' যেন সে কথার মধ্যে মিষ্টতা ঢালিয়া দিয়া তার আঘাত হইতে তাকে রক্ষা করিতে চাহিল।

কিন্তু তার কোন প্রয়োজন ছিল না। এক কালে হয় ত নিজের অবস্থার কথা এমন ভাবে মনে করাইয়া দিলে রমেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইত, কিন্তু এখন আর হয় না। তার অবস্থা সম্বন্ধে এখন সে পূর্ণমাত্রায় সচেতন। সুতরাং সে তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, 'আমি তা জানি, কমলা।'

কমলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'রাগ কর্‌লেন আপনি ? কিন্তু আমার বাবা মাকে আমি ভাল করে জানি। তাঁরা আমার জন্য রাজপুত্তুরের খোঁজ কর্‌ছেন।' হাসিল। 'সেখানে আপনার সুযোগ কোথায় ? পাছে আপনার মনে মিথ্যা মোহের সৃষ্টি হয়, তাই আমি আগে জানালাম। আশা করি, আপনি কিছু মনে কর্‌বেন না।'

সত্য কথায় মনে করিবার কি আছে ? রমেন কোন জবাব না দিয়া চুপ করিয়া রহিল। আজ সে প্রথম বুঝিল, কমলাকে সে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। কমলাকে সে পাইবে না, এ ত জানা কথা। কিন্তু সেই জানা কথাকে যখন ভাষায় পরিষ্কার করিয়া ব্যক্ত করা হইল, তখন মনে এত বেদনা জাগে কেন ? হায় ! কমলাকে হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন দেওয়া হয় ত এত সহজ

নহে। তাকে না পাইলে তার জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে, এ কথা সে বলিতে পারে না। তার জীবন সার্থক জীবন নয়। সুতরাং তা আর কি প্রকারে ব্যর্থ হইতে পারে? কিন্তু এই ব্যর্থ জীবনেও কমলাকে পাইলে যে শান্তি ও তৃপ্তি পাওয়া যাইত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ইহার পূর্ব্বে কমলার সহিত রমেনের অনেক দিন বহু বিষয়ে কথা হইয়াছে। তাদের দুজনকে তন্ময় হইয়া কথা বলিতে দেখিয়া বোনেরা কতবার ভাবিয়াছে, এত কি কথা বলে উহারা? রণেনও ভাবিয়া পায় নাই, দুজনে কি কথা বলিতে পারে। কমলা ও রমেন হাজার হাজার বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ কোনদিন নিজের ভালবাসা জানায় নাই। কমলার মনের কথা রমেন জানে না, জানিয়া কোন ফল নাই বলিয়া জানিতে চায় নাই। কিন্তু রমেন নিজের মনের কথা ত জানে। তার মনের মধ্যে রহিয়াছে গভীর ভালবাসার তৃষা। কমলার জন্য কি? আস্তে আস্তে কমলার জন্য তার মনে কিরূপ ব্যাকুলতা জন্মিতেছে, তা সে কাহাকেও বুঝাইতে পারিবে না। দুজনে ভালবাসা বিষয়েও আলোচনা করিয়াছে, নানা ব্যক্তির প্রেম সম্পর্কে কত রকম মন্তব্য করিয়াছে, কিন্তু তবু রমেন বলে নাই, 'কমলা, তোমায় ভালবাসি।' এক হৃদয়ের কথা অন্য হৃদয় হয় ত বুঝিতে পারে, হয় ত পারে না। কিন্তু নিজ হৃদয়ের কথা রমেন গোপন রাখিতেই চেষ্টা করিয়াছে। কমলা কি তার আঁচ পাইয়াছে? তাই আজ কমলা তাকে সাবধান করিয়া দিল? কিন্তু সে নিজেকে সর্ব্বদা যত সাবধান করিতেছে, কমলা কি তত পারে? সে যে কমলাকে চায়, এ কথা পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়াছে। সুতরাং তার পক্ষে আর এ কথা বলা সম্ভব নয় যে, সে নিজেকে অসংযত করিয়া রাখিয়াছে। রমেন ভাবিল, কমলার কথায় দুঃখ পাইবে না, কিন্তু তার কথাগুলি তীরের মত তার হৃদয়ে গিয়া বিঁধিয়া রহিল। হয় ত কমলা তাকে সাবধান করিয়া না দিলেও পারিত। রমেন অন্তত তার কাছ হইতে আশা করে নাই, সে নিজেদের ধনবত্তা সম্বন্ধে সচেতনতা দেখাইবে। কমলা মিথ্যা কথা বলে

নাই, কটু কথা বলে নাই, তথাপি কেন যে রমেনের মনে এত অসন্তোষ ও অভিমানের সৃষ্টি হইল, সে বুঝিতে পারে না। মানুষের মন সৃষ্টিছাড়া বস্তু। উহার সন্তোষ ও অসন্তোষের অনেক কারণই বুঝিতে পারা যায় না। রমেন তার মনের মেঘ কিছুতেই দূর করিতে না পারিয়া নিজের উপর রাগ করিতে লাগিল। সে যে কমলার নিকট কি ব্যবহার প্রত্যাশা করিয়াছিল, তা সে নিজেই বলিতে পারে না।

রমেন বলিল, 'এর পর তুমি বোধ হয় আর আমাদের বাড়ী আস্‌বে না!'

'কেন?' কমলা অকপট বিস্ময়ে চোখ বড় করিয়া রমেনের দিকে তাকাইল। আশ্চর্য্য মেয়ে কমলা! এই সহজ কথা বুঝিতে পারে না।

রমেন তখন জবাব দিল, 'বোধ হয়, তোমার আর আমাদের সঙ্গে না মেশাই উচিত হবে।'

'কিন্তু আমার ত আপনাদের সঙ্গে মিশ্‌তে ভাল লাগে।'

'আমি বলি, আর মিশো না।'

কমলা কিছু ক্ষণ স্থির ভাবে রমেনের চোখের দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর অতি মৃদুস্বরে বলিল, 'এটা কি আপনি রাগ করে বল্‌ছেন?'

'মোটেই না। ভেবে বল্‌ছি।'

কমলার স্বর আরও মৃদু হইয়া গেল, 'রমেন বাবু, ছেলে মেয়ে মিশ্‌লেই কি বুঝ্‌তে হবে, সেখানে ভালবাসা হবে, বিয়ে হবে? সম্পূর্ণ নির্দ্দোষভাবে ও বন্ধুভাবে কোন ছেলে কি মেয়ের সঙ্গে মিশ্‌তে পারে না? মিশ্‌তে গেলেই আপনারা সর্ব্বদা সন্দেহ করবেন, কোন উদ্দেশ্য আছে? আপনার সঙ্গে আমি যেমন মিশে আস্‌ছি, তেমনি মিশ্‌ব। অবশ্য আপনার যদি আপত্তি থাকে, আলাদা কথা। কিন্তু আমার মন নিষ্পাপ!'

কে যেন রমেনের মুখের উপর চাবুক মারিল। সে কি নিজের অজ্ঞাতেও নিজেকে অথবা কমলাকে সন্দেহ করিতেছিল? এইবার সে তার পূর্ণ দৃষ্টি কমলার চোখের উপর রাখিতে পারিল। সেখানে কি জল ছিল? ঠিক

বুঝিতে পারিল না। একবার যেন মনে হইল কমলার চোখের কোণে জল চক্‌চক্‌ করিতেছে। অন্যবার মনে হইল, তার দেখিবার ভুল। কেন কমলা কাঁদিবে? তার কাঁদিবার ত কোন কারণ নাই। কিন্তু কি সুন্দর কমলার চোখ! রমেনের পক্ষে কমলার চোখের মোহ অসাধারণ। এই চোখ যেন তাকে দিনরাত্রি যাদু করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এই মুহূর্তে কমলার চোখে যে সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তা সে ইহার পূর্ব্বে কোন দিন দেখে নাই। মরি, মরি! কোন্‌ চিত্রকর কমলাকে এমন করিয়া আঁকিযাছে? কোথায পাইল সে এমন চোখ? ঐ দুটি কালো চোখের জন্য রমেন কি যে করিতে না পারে, বলিতে পারে না। ঐ কালো চোখের মধ্য দিযা হৃদয প্রতিফলিত হইযা উঠে কি? হয় ত উঠে। কিন্তু হয ত তাহা বিক্রীত হৃদয। কমলা রাজপুত্তুরের কথা বলিল। কে জানে, কোন রাজপুত্রের পায়ে সে নিজের জীবন যৌবন সমর্পণ করিযাছে কি না। সে কথা ত আর তাকে জিজ্ঞাসা করা যায় না। জিজ্ঞাসা করিবার তার কোন অধিকার নাই। কিন্তু সে ত বলিয়াছে, নিজের বিবাহের কথা সে নিজে ভাবে না, বাপ মা যাকে তার জন্য পছন্দ করিবেন, সে তাকেই বিবাহ করিবে। উহাই কি তার পরিচয়ের পক্ষে যথেষ্ট নয? সে তার নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা লইযা কোন প্রকার আলোচনাই করে নাই। এমন শান্ত, এমন স্নিগ্ধ, কমলা!

কমলার চোখের দিকে তাকাইবার পর রমেন দ্বিধামাত্র না করিয়া বলিল, 'আমি জানি, কমলা, তুমি নিষ্পাপ।'

এই কথাতে কমলা কি শিহরিয়া উঠিল? রমেনের যেন মনে হইল, সে শিহরিয়াছে। কিন্তু কমলা কেন শিহরিয়া উঠিবে? সে নিজেকে নিষ্পাপ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, আর পরের মুখে ঐ কথা শুনিয়া তার ভাবান্তর হইবে, এ কেমন কথা? তবে কি কমলা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ নয়? এমন সুন্দর কমলা, তার জীবনে যদি কালি লাগিয়া থাকে ত তার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। সে কথা মনে করিতেও বুক ফাটিয়া যায়।

কিন্তু কমলার গায়ে কি কখনও কালি লাগিতে পারে? হাঁসের গায়ে যেমন কখনও জল লাগিয়া থাকে না, কমলার গায়েও সেরূপ কোন ময়লা থাকিতে পারে না। আর কেন সে ভাবিতেছে, কমলার গায়ে মাটি লাগিয়াছে? অনুমান করিবার মত কোন তথ্যইশএ পর্যন্ত জুটে নাই। সুতরাং কমলা তার কাছে কমলাই থাকিবে।

কমলা হাত বাড়াইয়া দিয়া হাসিল, 'শোধবোধ।' রমেন সে হাত গ্রহণ করিল। এই প্রথম।

রমেন রাস্তায় যাইতে যাইতে এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছে। আরও নানা কথা, নানা দৃশ্য, তার মনের মধ্য দিয়া আনাগোনা করিতেছে।

২

নরেশ বলে, গয়না, গাড়ী, বাড়ী, আর শাড়ী, এই হইল প্রত্যেক স্ত্রীলোকের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু। নরেশেব ধারণায় মেয়েরা একপ্রকার ছোট জাতের জীব। তাদের মধ্যে সত্যকার ভাল ও মহৎ গুণ কিছু নাই। পুরুষেরা তাদের বড় করিয়াছে। প্রথমত, প্রত্যেক রমণী ছলনাময়ী। পুরুষ মানুষও ছলনা করে, কিন্তু তারা জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়া করে। অর্থাৎ ছলনা করা তাদের স্বভাব নয়। কিন্তু রমণীর স্বভাব ছলনা করা। সে ছলনা না করিয়া থাকিতে পারে না, তাই করে। ছলনা বাদ দিয়া কোন রমণীর রমণীত্ব কল্পনা করা যায় না। অনেক সময়ে সে নিজের অজ্ঞাতে ছলনা করে এবং সেজন্য তা আরও সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। যে একবার স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করিয়াছে, সেই ঠকিয়াছে। দ্বিতীয়ত, স্ত্রীলোকের ভালবাসার কথা গল্প মাত্র। রমণী চায় সুখে থাকিতে। তার ভালবাসা না হইলে চলে, কিন্তু গয়না, গাড়ী, বাড়ী, আর শাড়ী না হইলে চলে না। যার অর্থ নাই সে যেন কখনও স্ত্রীলোকের ভালবাসা পাইবার কল্পনা করে না। লক্ষ রমণীর মধ্যে একজন পাওয়া যাইবে

না, যে ভালবাসাব জন্য সর্ব্বপ্রকার স্বার্থত্যাগে প্রস্তুত। সে বড় সুখের জন্য ছোট সুখ ত্যাগ করিতে পারে মাত্র। তার কাছে আদর্শ বা ভাববিলাসিতার কোন মূল্য নাই। কিন্তু ভালবাসার জন্য জীবন পণ করিতে পারে, সব কিছু ত্যাগ করিতে পারে, এমন পুরুষ মানুষের সংখ্যা অগণ্য। তাদের আদর্শবাদিতা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। তৃতীয়ত, স্ত্রীলোক মাত্রেই স্বার্থপর। দুঃখ দেখিলে তাদের চিত্ত সহজে গলিয়া যায়, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ছলনা যেমন রমণীর স্বভাব, করুণাও তেমনি তার স্বভাব। দুঃখ দেখিলেই তার তা মোচন কবিবার ইচ্ছা জন্মে। রমণী ছলনাময়ী হইলেও করুণাময়ী। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে সে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেয়। বিশেষ কারণে তার স্বভাবের ব্যত্যয় ঘটিতে দেখা যায়। তথাপি তাকে করুণাময়ী না বলিয়া উপায় নাই। কিন্তু করুণাময়ী হইলে কি হইবে? সে স্বার্থপর। পরের জন্য তার মাথাব্যথা নাই বলিলেও চলে। নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সর্ব্বাগ্রে চাই। তারপর নিজ স্বামী-পুত্র-কন্যা আত্মীয়স্বজনের মঙ্গল চাই। ইহার উপরে তার দৃষ্টি যায় না। সে নিজেব স্বার্থ ভুলিয়া পুরুষের মত বৃহৎ স্বার্থের কথা কখনও ভাবিতে পারে না। তাব পক্ষে নিজ আত্মীয় ব্যতীত অনাত্মীয় ব্যক্তির জন্য বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। তার আত্ম-পর জ্ঞান অত্যন্ত প্রবল। কখনও কখনও অনাত্মীয়কে সে আত্মীয় করিয়াছে, দেখা গিয়াছে। কিন্তু সেখানে সে আত্মীয় বলিয়া আগে তাকে গণ্য করিয়া লইয়াছে। চতুর্থত, রমণী মাত্রেই হিংসক। তারা যেমন হিংসা করিতে পারে, এমন পুরুষেরা পারে না। আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্ত্রীলোক স্ত্রীলোককেই অধিক হিংসা করিয়া থাকে। এই হিংসার ফলে কত জীবন যে বিষাক্ত হইয়া গিয়াছে, কত পরিবার ধ্বংস হইয়াছে, কে তার ইয়ত্তা করিবে? পঞ্চমত, রমণী অত্যন্ত অন্তঃসারশূন্য জীব। তার মধ্যে গভীরতা নাই। এমন কি, সে কোন গভীর বিষয় আলোচনা পর্য্যন্ত করিতে পারে না। তার চপল স্বভাবের জন্য সে এ পর্য্যন্ত এমন কিছু করিতে পারিল না, যাতে তার কীর্ত্তি অবিনশ্বর হয়। তার সঙ্গে

কথা কহিয়া সুখ নাই। দুটি পুরুষ মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা একেবারে নিমগ্ন হইয়া কত না বিষয় আলোচনা করিতে পারে। মেয়েরা শুধু বাজে বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে অভ্যস্ত। হাজার লেখাপড়া শিখাইলেও মেয়েদের এই স্বভাব বদ্‌লায় না। তারা বুঝিতেই পারে না, তাদের চিত্ত কত সঙ্কীর্ণ।

এই সব ও অনুরূপ অন্যান্য মত নরেশ বেশ জোরের সহিত প্রচার করে। সে সব কথাই হাসিমুখে বলে এবং যা বলে তাই উপভোগ করে। ঠিক বুঝা যায় না, সে যা বলে তা নিজে বিশ্বাস করে কি না। সে বলে, সে নিশ্চয় বিশ্বাস করে। কেন করিবে না? এ সকল কথা সে তার অভিজ্ঞতা হইতে আহরণ করিয়াছে। সে খোলা মনে সকল বিষয়েই নিজের গোপন কথাও বলিতে পারে। সুতরাং ভালবাসিয়া যে সে কয়েকবার ঠকিয়াছে, সে গল্প অম্লানবদনে সকলের কাছে করে। সে জন্য তার মতের আরও জোর হয়। এত বয়স অবধি সে স্ত্রীলোককে যতটা দেখিয়াছে, তাতে তার মত দৃঢ় হইয়াছে। তাকে ঠিক স্ত্রী-বিদ্বেষী বলা চলে না। ভালবাসিয়া কয়েকবার তার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; কিন্তু তা লইয়া দিনরাত শোক করিবার পাত্র সে নয়। সে পড়িয়াছে, উঠিয়াছে এবং আবার উঠা-পড়ার জন্য প্রস্তুত আছে। তার মধ্যে প্রাণ-স্রোত এরূপ বহমান, আনন্দ-রস এত অফুরন্ত যে, সহজে তার গায়ে দাগ পড়ে না। তার বন্ধুরা তাকে বলে চপল। সে তা হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। জীবনকে সে সহজভাবে লইতে পারে, তাই কি সে চপল? কিন্তু নিজের ব্যর্থতা লইয়া সে যদি দিনরাত কাঁদিত, তা হইলেই কি তার জীবন সার্থক হইয়া উঠিত? সে তা মনে করে না। সে যতটা পারে জীবনকে উপভোগ করিয়া লইতে চায়। ইহার জন্য যদি তাকে দোষ দাও তা হইলে সে দোষ কবুল করিবে। যদি তাকে চপল বলিতে চাও, তা হইলে সে চপল। কিন্তু সে জানে জীবনকে সহজভাবে লওয়ায় তার কিছু ক্ষতি হয় নাই, বরং এই লাভ হইয়াছে যে, কোন দুঃখ-কষ্ট তার জীবনকে পঙ্গু করিয়া ফেলিতে পারে নাই। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তার ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট। কিন্তু সেজন্য সে ঐ জাতির বিরুদ্ধে

বিদ্বেষ পুষিয়া রাখিয়া নিজের জীবনকে দুর্ব্বহ করিয়া তোলে নাই। সে যত সহজে কোন রমণীর সহিত আলাপ করিতে পারে, রমণী-পুজকেরা তত সহজে পারে কি না সন্দেহ। সে বহু স্ত্রীলোকের কাছে পরিচিত এবং অনেকের প্রিয়পাত্র।

রমণী সম্বন্ধে মতামত নরেশ যত জোরের সহিত প্রচার করে, রমেন ঠিক তত অথবা ততোধিক জোরের সহিত প্রতিবাদ করে। রমেনের কথা হইল, বিশ্বাসের কথা। রমণীর প্রকৃতিতে তার গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আছে। সে জন্য সে বহু যুক্তি দিয়া তর্ক করিতে পারে। তার অভিজ্ঞতা কম। কিন্তু কম অভিজ্ঞতার মূল্য কম, ইহা সে স্বীকার করিতে চায় না। অভিজ্ঞতার মূল্য যাচাই পরিমাণ দ্বারা হয় না, গভীরতা দ্বারা হয়। সে মনে করে, তার প্রত্যেক অভিজ্ঞতা অত্যন্ত গভীর। এখানেও বিশ্বাসের কথা। তার বিশ্বাস, সে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে গভীর উপলব্ধি করিতে পারিযাছে। তার তর্কে সাহায্য করে তার প্রচুর জ্ঞান। দেশবিদেশের সাহিত্য তার এত ভাল করিয়া পড়া আছে যে, সে রাশি রাশি দৃষ্টান্ত দিয়া তার সিদ্ধান্তকে যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রমাণ করিতে কোন ক্লেশ বোধ করে না। পুস্তকেব মানুষ আর সত্যকার মানুষ এক নহে, একথা বলিয়া পার পাইবার উপায় নাই। ভাল লেখক মাত্রেই তাঁর লেখার মধ্যে নিজ অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত করেন। তাঁরা মিথ্যা কথা বলেন না। যা সত্য বলিয়া বুঝেন, তাই অকপটে প্রকাশ করেন। তাঁদের চিত্রিত চরিত্র কবি-কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। ইহারা নারী সম্বন্ধে কখনও এমন হীন ধারণা পোষণ করেন না। নারীর মধ্যেও ভালমন্দ আছে এবং তার অন্তরেও নানা সংগ্রাম নিরন্তর হইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া নরেশের মত নারীকে সর্ব্বগুণহীনা কেহ মনে করেন না।

রমেন নরেশকে নিরুত্তর করিবার জন্য রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী হইতে সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সংবাদের নিম্নলিখিত অংশ পড়িয়া শুনাইয়াছে :

"নিবর্ত্তক—এই যে কারণ কহিলা তাহা যথেষ্ট বটে, এবং আমারদিগের সুন্দররূপে বিদিত অছে, কিন্তু স্ত্রীলোককে যে পর্য্যন্ত দোষান্বিত আপনি কহিলেন, তাহা স্বভাবসিদ্ধ নহে। অতএব কেবল সন্দেহের নিমিত্তে বধ পয্যন্ত করা লোকত ধর্ম্মত বিরুদ্ধ হয়, এবং স্ত্রীলোকের প্রতি এইরূপ নানাবিধ দোষোল্লেখ সর্ব্বদা করিয়া তাহারদিগকে সকলের নিকট অত্যন্ত হেয় এবং দুঃখ দাবক জানাইয়া থাকেন, যাহার দ্বারা তাহাবা নিরন্তর ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, এ নিমিত্ত এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। স্ত্রীলোকেরা শারীরিক পরাক্রমে পুরুষ হইতে প্রায় ন্যূন হয়, ইহাতে পুরুষেরা তাহারদিগকে আপনা হইতে দুর্ব্বল জানিয়া যে যে উত্তম পদবীর প্রাপ্তিতে তাহারা স্বভাবত যোগ্যা ছিল, তাহা হইতে উহারদিগকে পূর্ব্বাপর বঞ্চিত করিয়া আসিতেছেন ; পরে কহেন, যে স্বভাবত তাহারা সেই পদ প্রাপ্তিব যোগ্যা নহে, কিন্তু বিবেচনা করিলে তাহারদিগকে যে যে দোষ আপনি দিলেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা ব্যক্ত হইবেক।

"প্রথমত বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকেব বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন ? কারণ বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পবে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ কবিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্প বুদ্ধি কহা সম্ভব হয়, আপনাবা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কি রূপে নিশ্চয় করেন ? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজার পত্নী, কালীদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকে যাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্ব্ব শাস্ত্রের পারগ রূপে বিখ্যাত আছে, বিশেষত বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে, যে অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ীও তাহার গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হয়েন।

"দ্বিতীয়ত তাহারদিগকে অস্থিরান্তঃকরণ কহিয়া থাকেন, ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করি, কারণ যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য দ্বারা স্বামির উদ্দেশে অগ্নি প্রবেশ করিতে উদ্যত

হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, তথাচ কহেন, যে তাহারদের অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য নাই।

"তৃতীয়ত বিশ্বাস ঘাতকতার বিষয়। এ দোষ পুরুষে অধিক কি স্ত্রীতে অধিক উভয়ের চরিত্র দৃষ্টি করিলে বিদিত হইবেক। প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে বিবেচনা কর, যে কত স্ত্রী পুরুষ হইতে প্রতারিত হইয়াছে, আর কত পুরুষ স্ত্রী হইতে প্রতারণা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমরা অনুভব করি যে প্রতারিত স্ত্রীর সংখ্যা দশগুণ অধিক হইবেক, তবে পুরুষেরা প্রায় লেখাপড়াতে পারগ এবং নানা রাজকর্ম্মে অধিকার রাখেন, যাহার দ্বারা স্ত্রীলোকের কোন এরূপ অপরাধ কদাচিৎ হইলে সর্ব্বত্র বিখ্যাত অনায়াসেই করেন, অথচ পুরুষে স্ত্রীলোককে প্রতারণা করিলে তাহা দোষের মধ্যে গণনা করেন না। স্ত্রীলোকের এই এক দোষ আমরা স্বীকার করি, যে আপনাদের ন্যায় অন্যকে সরল জ্ঞান করিয়া হঠাৎ বিশ্বাস করে, যাহার দ্বারা অনেকেই ক্লেশ পায় এ পর্য্যন্ত যে কেহ কেহ প্রতারিত হইয়া অগ্নিতে দগ্ধ হয়।

"চতুর্থ যে সানুরাগা কহিলেন, তাহা উভয়ের বিবাহ গণনাতেই ব্যক্ত আছে, অর্থাৎ এক এক পুরুষের প্রায় দুই তিন দশ বরঞ্চ অধিক পত্নী দেখিতেছি, আর স্ত্রীলোকের এক পতি সে ব্যক্তি মরিলে কেহ তাবৎ সুখ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গে মরিতে বাসনা করে, কেহ বা যাবজ্জীবন অতিকষ্ট যে ব্রহ্মচর্য্য তাহার অনুষ্ঠান করে।

"পঞ্চম তাহারদের ধর্ম্মভয় অল্প, এ অতি অধর্ম্মের কথা, দেখ কি পর্য্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্ম্ম ভয়ে সহিষ্ণুতা করে। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ যাহারা দশ পোনর বিবাহ অর্থের নিমিত্ত করেন, তাহারদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই চারিবার সাক্ষাৎ করেন, তথাপি ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্মভয়ে স্বামির সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং স্বামি দ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃ গৃহে অথবা ভ্রাতৃ গৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা

দুঃখ সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন; আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্য বর্ণের মধ্যে যাহারা আপন আপন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন, তাহারদের বাটীতে প্রায় স্ত্রীলোক লইয়া কি কি দুর্গতি না পায়? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যেহেতু স্বামির গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্য বৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে কি বর্ষাতে স্থান মার্জ্জন, ভোজনাদি পাত্র মার্জ্জন, গৃহ লেপনাদি তাবৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে; এবং সূপকারের কর্ম্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে, অর্থাৎ স্বামি শ্বশুর শাশুড়ি ও স্বামির ভ্রাতৃবর্গ অমাত্য বর্গ এ সকলের রন্ধন পরিবেশনাদি আপন আপন নিয়মিত কালে করে, যেহেতু হিন্দু বর্গের অন্য জাতি অপেক্ষা ভাই সকল ও অমাত্য সকল একত্র স্থিতি অধিক কাল করেন এই নিমিত্ত বিষয় ঘটিত ভ্রাতৃবিরোধ ইহারদের মধ্যে অধিক হইয়া থাকে; ঐ রন্ধনে ও পরিবেশনে যদি কোনো অংশে ত্রুটি হয়, তবে তাহারদের স্বামি শাশুড়ি দেবর প্রভৃতি কি কি তিরস্কার না করেন; এ সকলকেও স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্ম ভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদর পূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা সন্তোষপূর্ব্বক আহার করিয়া কালযাপন করে; আর অনেক ব্রাহ্মণ যাঁহারদের ধনবত্তা নাই, তাহারদের স্ত্রীলোক সকল গোসেবাদি কর্ম্ম করেন, এবং পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘসি স্বহস্তে দেন, বৈকালে পুষ্করিণী অথবা নদী হইতে জলাহরণ করেন, রাত্রিতে শয্যাদি করা যাহা ভৃত্যের কর্ম্ম তাহাও করেন, মধ্যে মধ্যে কোনো কর্ম্মে কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যদ্যপি কদাচিৎ ঐ স্বামির ধনবত্তা হইল, তবে ঐ স্ত্রীর সর্ব্ব প্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায় ব্যভিচার দোষে মগ্ন হয়, এবং মাস মধ্যে এক দিবসও তাহার সহিত আলাপ নাই। স্বামি দরিদ্র যে পর্য্যন্ত থাকেন, তাবৎ নানা প্রকার কায়ক্লেশ পায়, আর দৈবাৎ ধনবান হইলে মানস দুঃখে কাতর হয়, এ সকল দুঃখ ও মনস্তাপ কেবল ধর্ম্ম ভয়েই তাহারা সহিষ্ণুতা করে, আর

যাহার স্বামি দুই তিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করে, তাহারা দিবারাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধর্ম্ম ভয়ে এ ক্লেশ সহ্য করে ; কখন এমত উপস্থিত হয়, যে এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়া অন্য স্ত্রীকে সর্ব্বদা তাড়ন করে, এবং নীচলোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহারা সৎসঙ্গ না পায়, তাহারা আপন স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ ত্রুটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহারদের প্রতি হইলে চোরের তাড়না তাহারদিগকে করে, অনেকেই ধর্ম্ম ভয়ে লোক ভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে, যদ্যপিও কেহ তাদৃশ যন্ত্রণায় অসহিষ্ণু হইয়া পতির সহিত ভিন্ন রূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহ ত্যাগ করে, তবে রাজ দ্বারে পুরুষের প্রাবল্য নিমিত্ত পুনরায় প্রায় তাহারদিগকে সেই সেই পতিহস্তে আসিতে হয়, পতিও সেই পূর্ব্বজাতক্রোধের নিমিত্ত নানা ছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, কখন বা ছলে প্রাণ বধ করে ; এ সকল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, সুতরাং অপলাপ করিতে পারিবেন না। দুঃখ এই, যে এই পর্য্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধন পূর্ব্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।"

সতীদাহের বিরুদ্ধে ইহা রামমোহনের যুক্তি বটে, কিন্তু নরেশ স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে যে সকল দোষারোপ করে, তার উত্তর রামমোহনের যুক্তির মধ্যে যথেষ্ট পাওয়া যায়। নরেশের রামমোহন সম্বন্ধে জ্ঞান কিছুই ছিল না। সুতরাং সে এই চমৎকার যুক্তি পরম্পরা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হয় এবং রামমোহনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। কিন্তু নরেশ রামমোহনকে নারী-আন্দোলনের পাণ্ডা মনে করে। পাণ্ডার যে সকল গুণ থাকা দরকার, তা তাঁর প্রচুর পরিমাণে ছিল। একশত বৎসরেরও পূর্ব্বে বাংলার এই ব্যক্তি বর্ত্তমান যুগের নারী-আন্দোলনের চরম সমর্থনকারীদিগকেও হারাইয়া দিয়াছেন, তা নরেশ গর্ব্বের সহিত স্বীকার করে। তাঁর সমগ্র লেখার মধ্য দিয়া তখনকার সামাজিক জীবনের যে উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যায়, তা বহুমূল্য জিনিষ, তাও স্বীকার করে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, আন্দোলনকারীর দুর্ব্বলতা রামমোহনের ছিল।

তিনি সাধারণভাবে স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে কথা বলিয়াছেন, কিন্তু সে কথা চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লইবার কোন প্রয়োজন নাই। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা কোথাও পাই না। হয়ত প্রয়োজন হইলে তার্কিক হিসাবে রামমোহন স্ত্রী-লোকের বিপক্ষে তুল্য ওজস্বিতা সহকারে বক্তৃতা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁর সেরূপ ইচ্ছা না হওয়ায় তা করেন নাই। নরেশ একথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়, সে নিজ অভিজ্ঞতার বলে যা বুঝিয়াছে, রামমোহনের যুক্তিতে তা খণ্ডিত হয়।

বস্তুত, নরেশ স্ত্রীলোকের স্বভাব বর্ণনা করিয়াছে মাত্র। স্ত্রীলোককে মসীবর্ণে চিত্রিত করিয়া তার কোন লাভ নাই। জল সম্বন্ধে যদি বলা হয় যে, উহার প্রবণতা হইতেছে নীচের দিকে যাওয়া, তা হইলে জলকে কি লোকের চোখে ছোট করিয়া দেওয়া হয়? স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তার যা ধারণা তা সত্য বলিয়াই তাতে রমণীর সম্মানের কোন লাঘব হয় না। তার মন হয়ত একেবারে মুক্ত নহে। নারীর কাছে আঘাত পাইয়া তার মনের কোণে একটা নারী-বিরুদ্ধতা থাকিতে পারে, তা হয়ত সে নিজেই জানে না। তথাপি, যথাসম্ভব অপক্ষপাত ভাবে সে স্ত্রীলোককে বুঝিতে চেষ্টা করিয়া থাকে।

রামমোহন যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু মাত্র রমণীর হইয়া ওকালতি করিয়াছেন। কিন্তু রমেনের হাতে নজীরের অভাব নাই, যা দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে নরেশের ধারণা ভুল। ইদানীং ইয়োরোপ ও আমেরিকায় একপ্রকার সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে। তাতে প্রতি ব্যক্তি,—পুরুষ ও নারী,—অকপটে আপনার জীবন-কাহিনী ব্যক্ত করে। এইরূপ বহু স্ত্রীলোকের কাহিনী রমেন মনোযোগ সহকারে পড়িয়াছে। প্রতি বার তার মনে হইয়াছে লেখিকা সত্য কথা বলিতেছে। এই সকল সত্য কাহিনী রমণীর সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মাইয়া দেয়, তাতে তার প্রতি সর্ব্বত্র শ্রদ্ধা না জন্মিলেও মনে হয় না যে, নরেশের ধারণা সত্য। এইরূপ বহু কাহিনী রমেন দিনের পর দিন নরেশকে পড়িয়া শুনাইয়াছে এবং তারপর জিজ্ঞাসা করিয়াছে, সে তার মত বদলাইতে প্রস্তুত কি না।

না, নরেশ প্রস্তুত নয়। সমস্ত কাহিনী সে খুব মনোযোগ দিয়া শুনিয়াছে, তথাপি তার মত বদ্‌লাইবার কোন কারণ খুঁজিয়া পায় নাই। লোকে নিজের কাহিনী যতই অকপটে বলিতে চেষ্টা করুক, নিজের অজ্ঞাতেও সে আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা করিবে, ইহা স্বাভাবিক। খুব খারাপ লোককেও যদি তার কাহিনী বলিতে দেওয়া হয়, আর তার যদি বলিবার ক্ষমতা থাকে, তা হইলে সে নিজের কথা এমন ভাবে সাজাইয়া বলিবে যে, মনে হইবে, তাই ত লোকটা তত মন্দ নয় যত মন্দ ভাবিয়াছিলাম। সুতরাং খাঁটি বিচারের জন্য চাই একেবারে পক্ষপাতিতাশূন্য মন। নরেশ কোন পীরের নজীর দিয়া নিজের বিচার শক্তিকে ঘুম পাড়াইতে চায় না। সে খোলা চোখে নিজের অভিজ্ঞতার ফলে যা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছে, তা প্রচার করিতে কুণ্ঠিত নহে। হইতে পারে, রমেনের চোখে রমণীর এই সত্যকার রূপ ধরা পড়ে নাই। তার মন স্বভাবতই নারীর পক্ষপাতী। তার পক্ষে নারীকে ঠিকমত চেনা কঠিন। তদুপরি, তার অভিজ্ঞতা গভীর হইতে পারে, কিন্তু ব্যাপক নয়; তা বহু ব্যক্তিকে পর্য্যবেক্ষণ করিবার ফল নয়। তাতে তার দৃষ্টিভঙ্গী সঙ্কীর্ণ হইতে বাধ্য। সুতরাং নিজের জীবন দ্বারা নরেশ যা বুঝিয়াছে, তা রমেন তর্ক করিয়া মিথ্যা প্রমাণিত করিতে পারিবে না। রমেন অপেক্ষা করুক। সে যদি নরেশের মত স্ত্রীলোককে দেখিবার সুযোগ পায়, তা হইলে সেও যে নরেশের কথা আবৃত্তি করিবে, এ বিষয়ে নরেশের মনে কোন সন্দেহ নাই।

নরেশের কাছে আজ রমেনের আসিবার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। মানুষ কখন কখন একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দ্বারা যেরূপ অভিভূত হয়, হাজার তর্কে পরাস্ত হইয়াও সেরূপ অভিভূত হয় না। রমেন দেখিতে চায়, কমলার মত মেয়ের সঙ্গে মিশিয়াও নরেশ তার মত বদ্‌লায় কি না। তার দৃঢ় বিশ্বাস একা কমলা তার সত্য দৃষ্টি খুলিয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট। যদি কমলা নরেশের ভুল ধারণা দূর করিতে না পারে, তা হইলে আর কেহ পারিবে না। এ বিষয়ে

রমেনের মনে কোন সংশয় নাই। সেজন্য এখন সে কমলার সহিত নরেশের পরিচয় করাইয়া দিতে ব্যগ্র।

কিন্তু কমলার কাছে এই প্রস্তাব করা মাত্র, সে অদ্ভুত হাস্য করিয়াছিল, যদিও আপত্তি করে নাই। তাঁর হাসির কারণ বুঝা ভার। রমেন মাত্র এই কথা বলিয়াছিল যে সে নরেশের সহিত তার পরিচয় করাইয়া দিতে চায়। তাতেই হাসি।

হাসি থামিলে কমলা জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন ?'

'তোমার কি নরেশের সঙ্গে আলাপ করতে আপত্তি আছে ?'

'কিছুমাত্র না, কিন্তু আগ্রহও নাই।

'বুঝি লজ্জা করে !'

'কেন করবে ? নরেশ বাবু মানুষ ত। মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে আমার লজ্জা নাই।' মনে হইল যেন 'মানুষ' কথাটার উপর কমলা অনাবশ্যক জোর দিতেছে।

'তবে ত আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক।'

'যাকে চিনি না, কোন দিন চোখে দেখি নি, তার সম্বন্ধে আগ্রহ কি করে হয় ?'

'আমাকেও ত চিনতে না।'

'বলতে চান কি আপনাকে জানবার জন্য আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল ? মোটেই না।' কমলা অপাঙ্গে চাহিয়া লঘুভাবে হাস্য করিল।

বোধ হয়, রমেনের দুই কান একটু লাল হইয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি বলিল 'তা আমি বলতে চাই নি কখনও। আমার সঙ্গে আলাপ না করলে তোমার কোন ক্ষতি হত না, জানি। তবু ত করেছ। আমি তার কথা বার বার এত বলি, অন্তত আমার কথা শুনে তার সম্বন্ধে তোমার কৌতূহল হবে মনে করেছিলাম। হয় নি ?'

'না।'

'আশ্চর্য্য বটে !'

'তিনি আপনার বন্ধু ?'

'ঠিক বন্ধু বলা চলে না। আমার তেমন বন্ধু কেউ নাই, কমলা।'

নিজের অজ্ঞাতসারে স্বরের মধ্যে হতাশার ভাব ছিল কি ? সে কমলাকে তার দিকে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া যোগ করিয়া দিল, 'কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা করা বোধ হয় আমার ধাত নয়।'

কমলা যেন কথাটাকে চাপা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার বন্ধু, মানে নরেশ বাবু, কি খুব ধনী ?'

কমলা কেন এই প্রশ্ন করে ? এইরূপ প্রশ্ন করার মধ্যে বুদ্ধির পরিচয় হয়ত আছে। কমলা কি সেই পরিচয় দিবার জন্য ব্যগ্র ? কিন্তু ইহার মধ্যে যে একটা ইতরতা আছে, তা কি সে বুঝিতে পারে না ? কমলা জিজ্ঞাসা করিল না, নরেশের কি কি গুণ আছে ; একেবারেই জানিতে চাহিল, সে ধনী কি না। যেহেতু রমেনের নিজের কোন ভরসা নাই, সেই হেতু সে তাড়াতাড়ি একজন সম্পন্ন ব্যক্তির সহিত আলাপ করাইয়া দিতেছে, সে চাহিলে কমলার পিতামাতা তাকে 'না' বলিতে পারিবেন না,—এই কি কমলা মনে করিয়াছে ? অথচ এ প্রকার মনে করিবার কোন কারণ নাই। রমেন স্তব্ধ হইয়া গেল।

কমলা হাসিতে লাগিল, 'আপনি যে চুপ মেরে গেলেন। আমার প্রশ্নের জবাব দিন। প্রশ্নমাত্র, কোন উদ্দেশ্য নাই, জান্‌বেন।' যেন কমলা রমেনের মনের কথা বুঝিতে পারিয়াছে।

কমলাকে বুঝা ভার। রমেন বলিল, 'খুব ধনী বল্‌তে পারি না, তবে ধনী বটে।' রমেনের মুখ এই কথা বলিল বটে, কিন্তু তার চোখ অন্য কথা বলিল।

এইবার কমলার গম্ভীর হইবার পালা। সে গম্ভীর ভাবে কহিল, 'আচ্ছা বেশ, তাঁকে আপনার বাড়িতে এনে আমায় খবর দিবেন, আমি এসে আলাপ করব।

কমলার প্রস্তাবে রমেন চমৎকৃত হইল, 'না, না, তোমার সঙ্গে তোমাদের বাড়ীতেই দেখা করুক।'

কমলা আরও গম্ভীর হইয়া বলিল, 'কিছুতেই নয়। তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা আপনার বাড়ীতেই হবে।'

'তোমাদের বাড়ীতে হতে আপত্তি কি ?'

'আপনার বাড়ীতে হতেই বা আপত্তি কি ? আপনার বাড়ীতে না হলে, থাক, আপনার বন্ধুকে আন্‌বার কোন দরকার নাই। তাঁকে না দেখে আমি মরে যাচ্ছি না।' স্পষ্ট জেদের স্বর।

বিব্রত রমেন কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

কমলা কহিল, 'আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? এর পর এত যাবেন যে, বন্ধুকে তাড়াবার পথ পাবেন না।' হাসিল। রমেনকে গম্ভীর হইতে দেখিয়া পুনরায় বলিল, 'রাগ কর্‌লেন ?'

রমেনের রাগ করা উচিত ছিল, কিন্তু রাগ করিতে পারিল না। কমলা কথা বলিতে জানে। সে তার কথা এমন ভাবে বলে যে, রাগ করিবার জো থাকে না। যা হোক, রমেন এখন কমলার সহিত নরেশের সাক্ষাৎ ঘটাইতে ব্যগ্র। অগত্যা তাকে ধনি-পুত্র নরেশকে তার নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিতে হইবে। সে যেদিন আসিবে সেদিন তার নিজের ঘরটাকে একটু সাজাইয়া রাখিলেই চলিবে। এইরূপ সাজান ঘরে কমলারা প্রথম দিন আসিলে কি সুন্দর হইত! কিন্তু তারা আসিয়াছিল অতর্কিত ভাবে, একেবারে স্বাভাবিক প্রেরণায়। কমলা প্রতিদিন তাদের আটপৌরে জীবনের মধ্যে আসে যায়, তাতে কিছুই মনে হয় না। সে জন্য কেহ ঘর সাজাইতেও বসে না। অথচ নরেশের আগমন উপলক্ষ্যে তাকে বিশেষ সাবধান ও পরিচ্ছন্ন হইতে হইবে, ইহা ভাবিতেও রমেনের মনে দুঃখ হয়। কিন্তু উপায় নাই। সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে নরেশের এতকালকার ধারণা একেবারে চুরমার করিয়া দিবে। অন্য দিকে মনোযোগ দিবার অবকাশ অথবা ইচ্ছা তার এখন নাই।

কিন্তু সে একেবারে অন্য কোন কথা ভাবে নাই, এমন বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। সে এমন নির্ব্বোধ নহে যে, এই সাক্ষাৎকারের ভিতরে যে বিপদের বীজ আছে, তার সম্বন্ধে অজ্ঞ। সে পরিষ্কার বুঝিল, সে নিজের পরাজয়ের সূত্রপাত নিজেই করিতেছে। নরেশকে দেখিয়া কমলা যদি রমেনের প্রতি বিমুখ হয়, তা হইলে ? অধিকন্তু, নরেশকে দেখিয়া কমলার বাপ-মা তাকে বাঞ্ছনীয় মনে করিবেন। হয়ত নরেশ ইচ্ছা করিলে সহজেই কমলাকে বিবাহ করিতে পারিবে। কমলার আকর্ষণ-শক্তি যেরূপ প্রচণ্ড, তাতে নারীজাতি সম্বন্ধে নরেশের বিরূপতা সত্ত্বেও সে কি নিজেকে সংবরণ করিতে পারিবে ? কমলার কাছে কেহ যে নিজেকে সংবরণ করিতে পারে, তা রমেন বিশ্বাস করে না। আর নরেশের যা স্বভাব, তাতে সে ত নিজ মনোভাবকে চাপিয়া রাখিবে না। সে রমণীর সম্বন্ধে হাজার বিরুদ্ধ মত পোষণ করিয়াও তাকে ভালবাসিতে ইতস্তত করে না। কমলা তার প্রতিদান দিলে বিবাহের কোন বাধা থাকিবে না। আর কমলা প্রতিদান দিবেই না বা কেন ? নরেশের মত ছেলে সচরাচর কয়টা পাওয়া যায় ? জীবন-সংগ্রামে নরেশ পূর্ব্ব হইতেই জয়ী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

রমেন বুঝিল, নরেশের সহিত সাক্ষাতের ফলে সে কমলাকে চিরদিনের মত হারাইতে পারে। কিন্তু তার নিজের যখন কোন আশা নাই, তখন কেন সে নিজের দুর্ব্বলতাকেই নিরন্তর বাড়াইয়া তুলিবে ? বেশ ত, নরেশ যদি কমলাকে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে এবং তার বাপ-মা তাতে সম্মতি দেন, ভালই ত ; সে ত সুখের কথা। কোন দিন কমলাকে কেহ না কেহ বিবাহ করিবে। সেই কেহ নরেশ হইলে দোষ কি ? বরং নরেশকে অনেকের চেয়ে যোগ্য ও ভাল মনে করা যাইতে পারে। নিজে কমলাকে পাইবে না বলিয়া অন্যকে ঐ বিষয়ে বাধা দিবার কোন অধিকার তার নাই। আর তার বাধা যখন নিষ্ফল, তখন নির্ব্বোধের মত সে চেষ্টা করা সাজে না। বরং কমলাকে নরেশের সহিত সহজভাবে মিশিতে দাও, যা হইবার তা হউক।

রমেন গিয়া দেখিল, নরেশ একটা গ্রন্থের এক স্থান পড়িতেছে আর খুব হাসিতেছে। রমেন বলিল, 'এত হাসির কারণ কি ঘট্‌ল ?'

নরেশ পড়িবার যায়গায় একটা আঙ্গুল রাখিয়া বই মুড়িয়া বলিল, 'এই যে ঠিক সময়েই এসেছ। আমি পড়্‌ছিলাম আর তোমার কথা ভাব্‌ছিলাম।'

'কেন, বল ত ?'

'এই বইয়ে একটা লেখা আছে, নারীজাতি সম্বন্ধে। ওঃ, এত সরস লেখা আমি আর কোনদিন পড়িনি। স্ত্রীলোককে একেবারে চোস্ত চোস্ত কথায় বর্ণনা করেছে। ভাষার কি জোর! শেষকালে অকারাদি বর্ণক্রমে স্ত্রীলোকের স্বভাব ও গুণ বর্ণনা করেছে। আমি একবার প'ড়ে দ্বিতীয়বার পড়্‌ছিলাম। তুমি একবার শুধু এই ক্যাটালগখানায় চোখ বুলিয়ে দেখ।'

রমেন পড়িল :

'অ। অর্থ, অলঙ্কার, অপরাধ—এই তিন জিনিষের জন্য স্ত্রীলোকের অসীম লোভ। অর্থ ও অলঙ্কার চায় না বা পাইয়া খুসী হয় না, এরূপ রমণী জগতে দুর্লভ, আর অপরাধ বা অন্যায় সম্বন্ধে তাদের লোভ কিরূপ উগ্র, তা ইতিহাস হইতে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়।

আ। আজ, আপন, আশা—এই তিন জিনিষ স্ত্রীলোক ভাল করিয়া বুঝে। রমণীর বর্ত্তমান-প্রীতি প্রসিদ্ধ, সে ভবিষ্যতের কথা প্রায় ভাবিতে চায় না। পর কে আর আপন কে, এ সম্বন্ধে তার জ্ঞান টন্‌টনে। অত্যন্ত বর্ত্তমান-নিষ্ঠ হইলেও তার আশা কিন্তু সহজে মরিতে চায় না।

ই। ইচ্ছা, ইতরতা, ইনাম বা ইজ্জৎ—এই তিনই স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রবল। কোন রমণী তার ইচ্ছা সহজে চাপিতে পারে না, ইচ্ছা করিলে সে যে কি ইতরতা না করিতে পারে, তা বলা দুঃসাধ্য ; আর তার ইজ্জৎ জ্ঞান প্রতিপদে তাকে ঘিরিয়া আছে।

ঈ। ঈর্ষ্যা-

রমেন এই পর্যান্ত পড়িয়া বই বন্ধ করিয়া ছুড়িয়া ফেলিল। নরেশ হাসিতে লাগিল, 'আহা রাগ করছ কেন? পড়ই না সবটা।'

রমেন হাত উল্টাইয়া বলিল, 'পড়ে কি হবে আর! হতভাগা লেখকের উদ্দেশ্য ত স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। মেয়েদের সকল রকম গুণহীনা বলে প্রমাণ করতে চান।'

'লোকটি সাহিত্য-জগতে নেহাৎ অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি নয়।'

'তা হোক্। এর চেয়ে ঢের বেশী প্রসিদ্ধ ব্যক্তি শোপেনহৌয়ের ছিলেন। সেই জগৎবিখ্যাত জার্ম্মাণ দার্শনিকের নারী-বিদ্বেষকে কেউ হার মানাতে পারবে না। আর তাঁর নারী-দর্শন তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার ফল। তবু বল্‌ব না, তিনি রমণী সম্বন্ধে সত্য কথা বল্‌তে পেরেছেন।'

নরেশ শোপেনহৌয়েরের জীবন-কথা শুনিতে চাহিল। রমেন সংক্ষেপে তা তাকে শুনাইয়া দিল। শুনিয়া নরেশ বলিল, 'তুমি বল্‌তে চাও বাড়ীউলির ঝাড়ুর বাড়ি খেয়ে সে বেচারা ভদ্রলোক মেয়ে জাতটার উপর জাতক্রোধ হয়ে গেলেন?'

'একা বাড়ীউলি তাঁর কিছু করতে পারত কিনা সন্দেহ। তাঁর সমস্ত জীবন তিক্ত ও বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল নানা কারণে। তার মত এত বড় গুণী ব্যক্তি জার্ম্মাণ সমাজে দুর্ল্লভ ছিল। তবু তাঁর কপালে জুটেছিল কি? অপমান আর দুঃখ। বহুবিধ কারণ একত্র হয়ে তাঁর দর্শনকে দিয়েছে গলিয়ে। কোন কোন বিষয়ে তিনি গভীর অন্তর্দ্দৃষ্টির সঙ্গে সত্য কথা প্রচার করলেও, নারী সম্বন্ধে তাঁর কথাগুলি সত্য নয়, যদিও তা থেকে ভাব্‌বার খোরাক যথেষ্ট জোটে।'

নরেশ বলিল, 'রমেন, তুমি একথা কিছুতেই বোলো না যে, শোপেনহৌয়ের জীবনে পরম দুঃখ পেয়েছিলেন বলেই তার শোধ তুলেছেন নারীদের সম্বন্ধে যা তা বলে। নিশ্চয়ই তিনি মনে প্রাণে যা বিশ্বাস করতেন, তাই লিখে গেছেন। এতে যদি তাঁর লেখনীর মুখে নারী-চরিত্র এমনভাবে দেখা দিয়ে থাকে, যাতে রমণীর উপর আর শ্রদ্ধা থাকে না, তা হলে উপায় নাই।'

'এ কথা আমি মানি, এই লোকটির দর্শনশাস্ত্র জন্ম নিয়েছে তাঁর স্বভাব থেকে। অর্থাৎ ঠিক অনুরূপ দুঃখকষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্যে পড়েও অন্য কারু পক্ষে শোপেনহৌয়েরের মত নারী-বিদ্বেষ্টা না হওয়া সম্ভবপর হত। ধর রুশো। যে রুশোর বাণী একদিন শুধু ফ্রান্স নয়, সমগ্র ইয়োরোপকে এক নূতন আলোকের সন্ধানে মাতিয়ে দিয়েছিল, সেই রুশোর জীবন কি অসীম দুঃখ-পূর্ণ ছিল, ভাব্‌লেও আশ্চর্য্য হতে হয়। তার জন্মস্থান হতে লোকে তাঁকে ঢিল মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তিনি ভিখারীর মত ইয়োরোপের এক স্থান হতে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। নানা রমণীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু একথা ঠিক, তাঁর মুখ দিয়ে নারী সম্বন্ধে শোপেন-হৌয়েরের কথা কখনও বেরুত না।'

'সুতরাং দাঁড়াল এই যে, কে সত্য কথা বলছে, তার বিচারের ভার আমাদের উপর পড়ে। আমি বল্‌ব, রুশো হাজার দুঃখকষ্টের মধ্যেও আশাবাদী ছিলেন, আর শোপেনহৌয়ের ছিলেন সত্যবাদী। তিনি দুঃখে অভিভূত হয়ে সত্যকে বিকৃত করেন নি, তার প্রমাণ—তাঁর অন্য সব লেখা। সেগুলিকে তুমি অত্যন্ত উঁচু দরের মনে কর, কিন্তু নারীর কথা সম্বন্ধে তোমার মাপকাঠি বদ্‌লে যায় কেন?'

'কারণ, নারীর কাছেই তিনি সব চেয়ে বেশী আঘাত পেয়েছেন যে। সেই নিদারুণ আঘাত তাঁকে নারীর জীবনের অন্য এক দিক্‌ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন করে ফেলে।'

'তুমি এই লোকটির জীবন-কথা যদি পড় ত বুঝ্‌বে, ও রকম আঘাত না পেলেও শোপেনহৌয়েরের চোখে নারীকে দেখা যায়। তুমি বইখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলে বটে, কিন্তু সবটা পড়্‌লে বুঝ্‌তে এর কথা ভাব্‌বার মত, নিশ্চয় ফেল্‌বার মত নয়।'

'আচ্ছা, তুমিই সংক্ষেপে বল, কি বল্‌তে চান ভদ্রলোক।'

'বল্‌তে চান, আমারই কথা, কিন্তু আরও স্পষ্ট করে। আমি ঠিক ভাষাটা

বল্‌তে পারব না, আমার ভাষায় তর্জ্জমা করে বলি। নারী হচ্ছে ইহ ও দেহ-সর্ব্বস্ব জীব। সুন্দর সে মোটেই নয়, কিন্তু ছলনা দ্বারা সকলের কাছে সুন্দর বলে প্রতিভাত হয়। তাকে হাজার শিক্ষাদীক্ষা দিলেও সে আদিম যুগের বর্ব্বরতা কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে না। সে স্বভাবত কুটিল, হিংসক; তার প্রকৃতি হিংস্র এবং তার উপর নির্ভর করা মানে জীবনের সর্ব্বনাশ করা। যে মানুষ নিজের উন্নতি করতে চায়, সে যেন কখনও স্ত্রীলোকের উপর নির্ভর না করে। পুরুষ সহজেই রমণীর ভালবাসার জন্য সমস্ত উচ্চ আশা বিসর্জ্জন করতে পারে। কিন্তু স্ত্রীলোক ভালবাসা চায় না, চায় ভাল বাড়ীতে থাকতে, ভাল খাবার খেতে, দামী ও ভাল শাড়ী আর গয়না পরতে। আজীবন তার ভালবাসা না পেলেও চলে, কিন্তু দেহ না পেলে চলে না। গয়না ইত্যাদি না পেলে আরও চলে না। তার স্বাভাবিক করুণা দেখে, তার স্বার্থপরতার কথা ভোলা চলে না, তার বিদ্যাবুদ্ধি, রূপগুণ তার অন্তঃসারশূন্যতা ঢাকতে পারে না।'

রমেন গম্ভীর হইয়া গিয়া বলিল, 'নরেশ, তোমাকে আমি একটি মাত্র মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চাই, যে প্রমাণ করবে, তোমার ধারণা কত ভুল।'

'সে বোধ হয় তোমার কমলা।' রমেন ইহার পূর্ব্বে সাধারণভাবে কমলার কথা নরেশকে বলিয়াছে। কিন্তু তাতে কমলার সম্বন্ধে রমেনের মনে কোন মোহ জন্মিয়াছে, তা বোঝা যায় না। তবু নরেশ বলিল, 'তোমার কমলা।' রমেন দুঃখিত হইল। সে কি নিজেকে যথেষ্ট পরিমাণে ঢাকিতে পারে নাই? কমলার সম্বন্ধে কথা বলিতে গিয়া সে কি আপনার অজ্ঞাতে মনোভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে? কে জানে! তার ত মনে পড়ে না, সে এমন কিছু বলিয়াছে, যাতে নরেশ তাকে সন্দেহ করিতে পারে।

রমেন নরেশের হাসিকে আমল না দিয়া বলিল, 'কমলার সঙ্গে বটে, কিন্তু আমার কমলা নয়।'

'আমার ত কেমন ধারণা হয়ে গিয়েছিল, কমলা তোমারই।'

'না, কমলা এখন পর্য্যন্ত কারও নয়।'

'সত্য বল্‌ছ ?'

'সত্য।'

'তাহলে আমি যদি কমলার মন জয় কর্‌তে চেষ্টা করি, কারু কোন ক্ষতি হবে না ?'

'না।'

'তুমি অপরাধ নেবে না ?'

'আমি ? আমি কেন নেব ? আমার সঙ্গে—'

'তোমার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক, আমি জানি না, জান্‌তেও চাই না। আমি শুধু এই জান্‌তে চাই, তার সঙ্গে মিশ্‌তে গিয়ে আমি কোন পক্ষের অভিশাপের কারণ হব কি না।'

'আমার কথা তুমি শেষ কর্‌তে দিলে না। আমি সম্পর্কের কথা বল্‌তে চাই নি। জিজ্ঞাসা করি, তার সঙ্গে মিশ্‌বার জন্য তোমার মনে কি খুব আগ্রহ আছে ?

'খুব।'

'কেন, বল ত ?'

'তোমার কাছে তার কথা শুনে অবধি, আমার এই আগ্রহ।'

'তবু যদি এত বড় নারী-বিদ্বেষ্টা না হতে।' হাসিল।

'সে কথা তার কাছেও প্রচার করেছ বুঝি ?'

'মোটেই না। তার ত নিজের বিচার কর্‌বার শক্তি আছে। সে তোমাকে দেখে যা ভাব্‌বার ভাব্‌বে। আমি আগেই কেন কিছু বল্‌তে যাব ?'

'ধন্যবাদ। কিন্তু রমেন, তোমরা ঐখানে ভুল কর। আমি তোমাদের বারে বারে বলেছি স্ত্রীলোকের প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নাই, বরং তার প্রতি আমার লোভ আছে।'

'তা বলেছ।'

'তবু কেন বল্‌বে, আমি তাদের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ ?'

'তোমার আচরণে।'

'আমার আচরণে ? আমি ত তাদের সঙ্গে মিশ্‌তেই চাই, পালাতে চাই না। আর সত্য কথা বলতে কি, মেয়েদের সঙ্গে মিশ্‌তে আমার ভাল লাগে। কিন্তু তাই বলে তাদের স্বভাব সম্বন্ধে আমি মিথ্যা বানিয়ে বল্‌তে পারব না। যা সত্য মনে করি, তাই বলেছি।'

'তুমি কমলাকে না দেখেও তার সম্বন্ধে ধারণা করেছ ?

'তোমার কাছে কমলা যাই হোক, আমার মনে সন্দেহ মাত্র নাই যে, সেও গয়না, গাড়ী, বাড়ী ও শাড়ী চাইবে। তবে তার চাওয়ার রকমটা অন্য পাচজনের থেকে ভিন্ন হতে পারে।'

রমেন কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, 'হায়, তাকেও তুমি বিচার করে রেখেছ !'

'বিচার করি নি। ভেবেছি সেও মেয়ে।'

'আমার আশা আছে, তুমি কমলাকে দেখে মত বদ্‌লাতে বাধ্য হবে।'

'দেখা যাক। কিন্তু একদিনে নয়।'

'একদিন তোমায় কে দেখ্‌তে বলছে ? যতদিন খুসী দেখ। বহু দিন।'

'বেশ।—কিন্তু আমি যদি কমলাকে পাবার চেষ্টা করি ?'

'দোষ কি তাতে ? কর না।'

'তাতে তোমার পথের কাঁটা হব না ত ?'

'না।'

'তা হলে আমি স্পষ্টই বলছি, আমি কমলাকে পেতে চাইব।'

'বিয়ে করতে চাও ?'

'বিয়ে নয়, বিয়ের কথা পরে। তাকে চাই, তার ভালবাসা চাই।'

বাস, সব স্বচ্ছ হইয়া গেল। মনে কোন প্রকার প্যাঁচ রাখিবার ছেলে

নরেশ নয়। রমেন অবশ্য নরেশের চরিত্রের এই দিক্‌টা বুঝিতে পারে না। যাকে কোনদিন চোখে দেখে নাই, তার প্রতি লোভ কি করিয়া হয়? রমণীর জন্য ক্ষুধা হয়ত প্রত্যেক পুরুষ মানুষের মনের মধ্যে রহিয়াছে, কিন্তু নরেশের মত কেহ তা এত স্পষ্টভাবে স্বীকার করে না, কিংবা প্রবৃত্তিকে বশ করিবার জন্য চেষ্টাহীন হয় না। রমেনের পক্ষে এমন কথা বলা ত দূরের কথা ভাবাও সম্ভবপর নহে।

রমেন জানাইল যে, তার গরীবের কুটিরেই কমলার সহিত নরেশের সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইয়াছে। নরেশ আশ্চয্য হইল। এত কালের মধ্যে রমেন কখনও তাকে তাদের বাড়ী যাইতে বলে নাই। তাকে তাদের বাড়ীতে লইয়া যাইবার আগ্রহ যে রমেনের মনে নাই তা নরেশ বুঝিত। কমলার সহিত দেখা কমলার বাড়ীতেই ত হইতে পারিত। অথচ এক্ষেত্রে রমেন তার নিজের বাড়ী নির্দ্দেশ করিতেছে। ইহার অর্থ কি? কমলাকে তার নিজের বাড়ীর আবেষ্টনে দেখিতে পাইলে নরেশ সুখী হইত। তথাপি সে তাতে সম্মতি দিল এবং মনে মনে ভাবিল, 'সময় ত আর পালিয়ে যাচ্ছে না। এর পরই না হয় কমলার বাড়ীতে কমলাকে দেখ্‌ব।'

রমেন এমন ঘর সাজাইবার ধূম লাগাইয়া দিয়াছে, যেন কোন্ রাজপুত্র আসিবে। কমলা আসিয়া দেখে, এই অবস্থা। সে ত হাসিয়াই অস্থির।

রমেন জিজ্ঞাসা করিল, 'অত হাস্‌ছ কেন?'

'আপনার কাণ্ড দেখে।'

কমলার আগমনে রমেন নিজের মনে আগেই লজ্জা পাইয়াছিল। সেই লজ্জাকে চাপা দিবার জন্য জোর করিয়া বলিল, 'অন্যায় কিছু কর্‌ছি না ত।'

'অন্যায়ের কথা বল্‌ছি না, কিন্তু যা ধূম লাগিয়েছেন—'

'সে ত এর আগে কোন দিন আমার বাড়ী আসে নি। তার এই প্রথম আসার দিনে একটু [illegible]য়ে করা উচিত নয়?'

'একে বলেন একটু ?'

'একটু না ত কি। আমার বেশী কিছু করবার সামর্থ্য কই, কমলা ?'

'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, কোন রাজপুত্তুরের অপেক্ষায় যেন আপনি রয়েছেন।'

'আমার তুলনায় সে রাজপুত্তুর, তা ত তুমি জান, কমলা।'

কমলা রীতিমত রাগ করিল, 'রমেন বাবু, আপনি বার বার অমন করে নিজেকে গরীব বলে প্রচার করেন কেন ? আমার ভাল লাগে না।'

কমলাকে যাইতে উদ্যত দেখিয়া রমেন বলিল, 'ও কি, চল্‌লে ?'

'তা ছাড়া আর কি করব ?'

'কিন্তু আমার ত মনে হয়, তুমি আমায় সাহায্য করতে এসেছিলে।'

'হয়ত এসেছিলাম।'

'তা হলে রাগ করে যাচ্ছ ?'

'হয়ত যাচ্ছি।'

'কিন্তু এত সামান্য কারণে তুমি রাগ করবে ?'

'হয়ত কারণটা সামান্য নয়।'

কমলার চোখে নূতন ভাষা জাগিয়া উঠিল কি ? রমেন সে সম্বন্ধে কোন কথা চিন্তা করিবার পূর্ব্বেই কমলা বলিল, 'আসুন, আপনাকে সাহায্য করি।' যেন কমলা নিজের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে চাহিল।

৩

নরেশ কমলাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। সে অনেক সুন্দরী মেয়ে ইহার পূর্ব্বে দেখিয়াছে, তাদের অনেকের কাছে কমলা নিশ্চয় দাঁড়াইতে পারে না। [illegible] কমলার মধ্যে, যা আর কারও [illegible]ধ্যে সে কোন দিন দেখে নাই। তার গায়ের রং ফরসা বটে, কিন্তু ঠিক এই [illegible]রণের রং খুঁজিয়া

পাওয়া শক্ত। উহার উজ্জ্বলতা একেবারে অন্য ধরণের। অথচ কি মধুর, কি স্নিগ্ধ! মুখখানা অপরূপ শোভায় মণ্ডিত। কোন শিল্পী যেন অত্যন্ত যত্নে, অত্যন্ত আদরে, মূর্ত্তিখানি গড়িয়াছে। এত লাবণ্য ঝরিয়া পড়িতেছে যে, চোখ ফিরান যায় না। এমন বলিতে পারি না, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একেবারে নিখুঁত। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলে তার শরীরে অনেক খুঁত বাহির করা যায়। যেমন তার কান দুটা সমান নয়, নাকের উপর অস্পষ্ট একটা তিল আছে, মাথার চুল লম্বা কিন্তু আরও লম্বা এবং আরও কাল হইলে আরও ভাল হইত, রংটা আরও ফর্সা হইতে পারিত, ইত্যাদি। কিন্তু একবার কমলা সম্মুখে দাঁড়াইলে এ সব কথা আর মনেই আসে না। নরেশের মত অভিজ্ঞ লোকের পক্ষে অবশ্য একবার দেখিয়াই তার শরীরের সমস্ত খুঁতগুলি বুঝিয়া লওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল, কিন্তু তাকেও মনে মনে একথা স্বীকার করিতে হয়, কমলার খুঁতগুলি মহিমান্বিত হইয়াছে। ইহাকে দেখিয়া লোকে পাগল হইয়া না যাইবে ত আর কাকে দেখিয়া হইবে? ইহার মনের পরিচয় পাইতে এখনও দেরী আছে, আর রূপ দিয়া রমেনকে ভুলান যায় না, তা নরেশ জানে, কিন্তু রমেনের পক্ষে কমলা যদি পরম ভালবাসা ও পরম যত্নের ধন হয়, তা হইলে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, মূঢ় রমেন এমন গোপন বস্তুকে প্রাণ ধরিয়া অন্য লোককে দেখাইতেছে। সেই নির্ব্বোধ জানে না কি, এই রত্ন চুরি যাইবার আশঙ্কা আছে? আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই, কমলা যে পরিবারে জন্মিয়াছে, তারা তার অতুলনীয় রূপের মর্য্যাদা কিছু বুঝে না। তারা অতি সহজে যা পাইয়াছে, তা যে লোকে তপস্যা করিয়াও পায় না, একথা বুঝে না। ফলে, কমলার মনে নিজের রূপ সম্বন্ধে কোন প্রকার অহংকার জন্মিবার অবসর পাইয়াছে কি না সন্দেহ। দিন অতিবাহিত হইয়া চলিয়াছে, এমন দিন আসিবে যখন কমলার এই কোমল সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। সেই দিন আসিবার আগে, হায় কমলা, তুমি এত রূপের অধিকারী হইয়াও কি কিছু করিবে না? কিন্তু কি কমলা করিতে পারে!

কমলা কি করিতে পারে? নিজের মনে বার বার এ প্রশ্ন করিয়াও নরেশ কোন সদুত্তর দিতে পারে না। সাধারণ বাঙ্গালী ঘরের কন্যা কোন একদিন সাধারণ বাঙ্গালী গৃহস্থ ঘরের বধূরূপে শোভা পাইবে। কিন্তু কোথায় শোভা পাইবে? হয়ত লোকচক্ষুর অগোচরে, অন্তঃপুরের অন্তরালে।—একথা ভাবিতেই নরেশের সমস্ত অন্তঃকরণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে চায়। কিন্তু ইহা ছাড়া আর কোন্ পরিণতি সে কমলার জন্য আশা করে? আজিকার কমলাকে অনাগত কালে কোন্ মূর্ত্তিতে দেখিতে পাইলে সে সুখী হইবে? সে কথা সেই কি ভাল করিয়া জানে? এইমাত্র জানে, কমলাকে পাইবার জন্য চেষ্টা করা, তাকে লাভ করা, পরম ভাগ্যের কথা বটে। এখন জীবন পণ করিয়া সেই ভাগ্যের অন্বেষণেই তাকে যাত্রা করিতে হইবে। যাত্রার ফল অনিশ্চিত। কিন্তু কমলাকে দেখিবার পর হইতে তার মনে অহরহ কামনা জাগিতেছে, তাকে পাইবার জন্য। নরেশ এইমাত্র জানে, কমলাকে তার পাইতে হইবে। বিধিদত্ত তার যে সকল সুবিধা আছে, সেগুলি সে অবশ্যই প্রয়োগ করিবে। তার বিদ্যাবুদ্ধি, তার ধনরত্ন দ্বারা সে কমলার পরিবারকে আকর্ষণ করিবে। সাংসারিক দিক্ হইতে সে অযোগ্য পাত্র, একথা বলিবার সাহস তার বাপ-মার হইবে না। অবশ্য বিবাহ তার একমাত্র কাম্য বস্তু নয়। কমলার ভালবাসা পাইলে, কমলাকে পাইলে সে সন্তুষ্ট হইবে। কিন্তু যদি বিবাহ না করিলে কমলার ভালবাসা বা কমলাকে পাওয়া না যায়, তা হইলে সে না হয় বিবাহই করিবে। রূপবতী কমলা নিশ্চয়ই নির্ব্বোধ নয়। তার সহিত বিবাহের সকল সুবিধার কথা নিশ্চয়ই সে সহজে বুঝিতে পারিবে। কোন মেয়ের পক্ষে এইরূপ শান্ত, নিশ্চিন্ত জীবনের লোভ ত্যাগ করা সহজ কি? গয়না, গাড়ী, শাড়ী, বাড়ী, —কিছুরই অপ্রতুল হইবে না, তা ত কমলা জানে। তার চেয়েও ভাল পাত্রের লোভ উহাদের মনে থাকিতে পারে না। বাংলা দেশে চাহিলেই আর কিছু হিন্দু মেয়ের পক্ষে সুপাত্র মিলে না। কমলার বিবাহের বয়স হইয়াছে। তারপর বিনাপণে হাতের কাছে নরেশের মত পাত্র পাইলে, কমলার পিতামাতা

কি নির্ব্বোধের মত সুযোগটি ছাড়িয়া দিবেন, না; নরেশের সহিত কমলার বিবাহ দিবার জন্য ব্যগ্র হইবেন?

নরেশের সহিত কমলার বিবাহ! বাগান-সংলগ্ন বারেন্দায় ঈজি চেয়ারে বসিয়া নরেশ সিগারেটের পর সিগারেট ভস্ম করিতেছিল এবং আকাশ-পাতাল নানা কথা ভাবিতেছিল। নরেশের সহিত কমলার বিবাহ! এইবার নরেশ একাকী উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল। ধীরে বন্ধু ধীরে। এত তাড়াতাড়ি করিতে যাইও না। তাড়াতাড়ি করিতে গেলে সব মাটি হইয়া যাইতে পারে। জান ত, নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে জান ত, তাড়াতাড়ি করিতে গিয়া কতবার ঘাটে আনিয়া তরণী ডুবাইয়াছ! ভুলিয়া গেলে চলিবে কেন? অবশ্য সত্যের খাতিরে এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে, তাড়াতাড়ি, যথেষ্ট তাড়াতাড়ি কর নাই বলিয়াও অনেক বার ঠকিয়াছ। তরণী কোথায় যে দ্রুত বাহিতে হইবে, আর কোথায় ধীরে, পূর্ব্বাহ্ণে বুঝা মুস্কিল। ঘটনা ঘটিবার পরে বুঝা যায়, দ্রুতগতি অথবা ধীরতা সাফল্য আনিত। কিন্তু কমলার দিকে চাহিয়া দেখ। ধীর তার গতি, ধীর তার বাক্য। নম্র। শান্ত। তার মনও কি অমনি ধীর? কে বলিবে? কোন্ অতল গহনে তার মন ডুবিয়া আছে, চোখের দিকে চাহিয়া ত তার কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় না। অথচ বৃথা লজ্জা সঙ্কোচ একটুও নাই। কেমন স্বাভাবিক ভাবে কথা বলে। কেমন স্বাভাবিক ভাবে উত্তর দেয়। নরেশকে কমলা নূতন দেখিল। কিন্তু সেজন্য কোন উত্তেজনা ত দেখা গেল না। সে অবশ্য প্রত্যাশিত। রমেন নিশ্চয়ই তার সম্বন্ধে অজস্র গল্প করিয়াছে। এত যে, হয়ত তার সম্বন্ধে কিছু জানিবার বা কৌতূহল করিবার বাকী ছিল না। বিশেষ, তার স্বভাব খোলা স্বভাব, তার সম্বন্ধে যা জানিবার প্রায় প্রত্যেকেই জানিয়া ফেলে। সুতরাং নূতন হইয়াও নরেশ কমলার কাছে একেবারে নূতন না হইতে পারে। কিন্তু তবু রমণী-সুলভ একটা চাঞ্চল্য বা ঐ রকম কিছু তার মধ্যে দেখিতে পাইবে বলিয়া নরেশ আশা করিয়াছিল। নিরাশ হইতে হইল।

হয়ত রমেনের বাড়ীর আবেষ্টনের মধ্যে কমলার সহিত নরেশের প্রথম সাক্ষাৎ না হইলেই ভাল হইত। এমন হইতে পারে, কমলা ইহার মধ্যে ঠিক তেমনটি ফুটিতে পারিল না, যেমন সে নিজ বাড়ীতে ফুটিত।

রমেন কি ভাবিয়া তার নিজের বাড়ীতে কমলার সহিত নরেশের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়াছিল, তা সেই জানে। কিন্তু না করিলেই হয়ত ভাল হইত। মানুষ যেমন নিজের কোন প্রিয় ও গৌরবের বস্তু আর দশজনকে দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হয়, রমেনও কি তাই হইয়াছিল? রমেন কি কমলাকে তার একান্ত আপনার বলিয়া ভাবিয়া রাখিয়াছে? অথবা তার চিত্ত সত্যই কমলার প্রতি আকৃষ্ট নয় বলিয়া সে সহজে তার বাড়ীতে নরেশ ও কমলার প্রথম সাক্ষাৎ সহ্য করিতে পারিল? নারী-জাতি সম্বন্ধে নরেশের বদ্ধমূল ধারণা রমেন উপ্‌ড়াইয়া ফেলিতে চায়, একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দ্বারা। এবং সেই দৃষ্টান্ত কমলা। এ কথা রমেন লুকায় নাই। অর্থাৎ, কমলার প্রতি রমেনের ভালবাসা থাক বা না থাক, গভীর শ্রদ্ধা আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এখন প্রশ্ন, এই শ্রদ্ধা জন্মিল কি প্রকারে? রমেন আর কিছু কমলাকে না জানিয়া তার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হয় নাই। কতটা সে কমলাকে জানিয়াছে? এবং জানিবার জন্য কিরূপ মেলামেশা সে করিয়াছে? ইহা নিশ্চিত, রমেন মনে করে সে কমলাকে ভাল করিয়া জানে, নতুবা সে কখন নরেশের বদ্ধমূল বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কমলাকে দাঁড় করাইতে সাহস করিত না। ইহাও নিশ্চিত, রমেন কমলার সহিত ততখানি মিশিবার সুযোগ পাইয়াছে, যতখানি পাইলে সে মনে করিতে পারে তাকে ভাল করিয়া জানে। তা যদি হয়, বেচারার এরূপ ভাবে নরেশকে মাঝখানে ডাকিয়া আনা ঠিক হয় নাই। সত্য বটে, সে নরেশকে বলিয়াছে, নরেশ কমলাকে লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে পারে, তাতে তার কোন ক্ষতি বা দুঃখ হইবে না, কিন্তু মানুষ কি সব সময়েই সত্য কথা বলে, না, নিজের মন বুঝিয়া কথা বলে? এমন হইতে পারে, রমেন নিজের মনের কথা নিজের কাছেও স্বীকার করিতে

চায় না। এমন হইতে পারে, রমেন নিজের মন এখন পর্য্যন্ত ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। সে অত্যন্ত সত্যবাদী বটে, কিন্তু তাই বলিয়া নিজের মনের গোপনতম বা গভীরতম কথা বলিবার পাত্র নয়। নরেশের তা ভাল করিয়া জানা আছে। নরেশ যদি শেষ পর্য্যন্ত সত্যই কমলাকে বিবাহ করে, আর তাতে যদি রমেনের বুক ভাঙ্গিয়া যায়? রমেন বলিয়াছে, নরেশ যদি কমলার মন জয় করিতে চেষ্টা করে, কোন ক্ষতি হইবে না। বলিয়াছে, সে কমলার সহিত মিশিলে কোন পক্ষের অভিশাপের কারণ হইবে না। কিন্তু তাতে কাহারও বুক ভাঙ্গিয়া যাইবে না, এমন কথা ত রমেন বলে নাই। এরূপ অবস্থায় কি করা যায়?

আবার নরেশ একাকী হাস্য করিল। কমলাকে দেখা অবধি তাকে যেন ভূতে পাইয়াছে। সে যেন বদ্‌লাইয়া অন্য মানুষ হইতে চলিয়াছে। আশ্চর্য্য বস্তু এই রমণীর রূপ! সে কোন দিন ইহার ইয়ত্তা করিতে পারিল না। রমণীর রূপ-সুধা সে চোখ ভরিয়া পান করিয়াছে। এ বিষয়ে বৃথা লজ্জা তার একটুও নাই। তবু তার তৃষ্ণা মিটে নাই। যারা রূপকে আমল দিতে চায় না, যারা দেহের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে উদাসীন, সেই তাপসদের দলে নরেশ নয়। মনের সৌন্দর্য্য সে অস্বীকার করে বা চায না, তা নয়; কিন্তু মনের সৌন্দর্য্যের আগেই দেহের রূপ চোখকে ভুলাইয়া লইয়া যায়। যদি নরেশকে সেজন্য চোখ বন্ধ করিতে বল, নরেশ করিবে না। নরেশ চোখ ভরিয়া দেখিবে। শুধু দেখায় দোষ আছে কি? রূপবতী নারী ভগবানের সৃষ্টি। অপূর্ব্ব সৃষ্টি। যে ভাগ্যবতী সৌন্দর্য্য লইয়া জন্মিয়াছে, ঈশ্বর যে তার প্রতি বিশেষ করুণা করিয়াছেন, তাতে সন্দেহ নাই। রূপ যদি তার চিরস্থায়ী নাও হয়, কি আসে যায় তাতে? আজিকার রূপ দেখিয়া নরেশ ধন্য হইতেছে, অনাগত কালের কথা ভাবিয়া কষ্ট পাইতেছে না। আগে দেহের রূপ, তারপর সব কিছু। যে নারী সুন্দরী নয়, তার ভাগ্য বিড়ম্বিত না বলিয়া উপায় কি? সে কি নিজ রূপহীনতার জন্য মনে মনে লজ্জিতা নয়? এমন

কোন্ নারী আছে পৃথিবীতে যে বিধাতার নিকট নিরন্তর প্রার্থনা জানায় না, যেন পরজন্মে রূপবতী হইয়া জন্মগ্রহণ করে? এমন কয়জন নারী আছে, যারা কৃত্রিম উপায়ে নিজের রূপের অভাবকে পূর্ণ করিতে চেষ্টা করে না? মনকে চোখ ঠারিয়া যা খুসী ভাবা যাইতে পারে, যা খুসী বলা যাইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সত্য কথা এই যে, সুন্দরী নারীর সুন্দর মুখ সর্ব্বত্র উপভোগ্য। নরেশ যে মনে প্রাণে সুন্দরীকে চায়, ইহা অস্বীকার করিয়া কোন লাভ নাই।

হাঁ, আশ্চর্য্য বস্তু রমণীর রূপ! নরেশ তা শতবার, সহস্রবার, স্বীকার করে, এবং স্বীকার করিয়া লজ্জিত হয় না। আবার সে সেই রূপ কমলার মধ্যে দেখিয়াছে। দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। তার মনে হইয়াছে, এই নারীর পায়ের কাছে তার সমস্ত ধনৈশ্বর্য্য বিলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। যদি নারী হইয়া জন্মিতে হয়, তা হইলে কমলার রূপ যেন জন্ম সার্থক করে। কমলাকে সে চায়, সে চায়। কে না সুখ বা সৌভাগ্য আকাঙ্ক্ষা করে? এতদিন সে যত নারীকে চাহিয়া বেড়াইয়াছে, তার চেয়েও বেশী করিয়া চায় কমলাকে। প্রথম-দর্শনেই কমলার জন্য তার ভালবাসা জন্মিয়াছে কি? ইহাকে ঠিক ভালবাসা বলা চলে না। মানুষ জীবনে অনেক কিছুর জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে, অথচ সেই সব না পাইলে যে, সে মৃত্যুকে বরণ করে, তা নয়। কমলাকে না পাইলে নরেশ মরিয়া যাইবে না, এটা ঠিক। কিন্তু তাকে পাইবার জন্য তার মনে যে ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে, তাও ঠিক। যতবার কমলার মুখ মনে পড়ে, ততবার তার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠে। এমন কিছু নাই এ জগতে যা এই অস্থিরতাকে নিবৃত্ত করিতে পারে। কমলাকে লাভ করিলে বোধ হয় তার মন শান্ত হইবে।

কিন্তু কমলার স্পর্শে সে যেন নূতন মানুষ হইয়া গিয়াছে। নহিলে সে নিজের সুখের কথা ভাবিতে গিয়া রমেনের বুক ভাঙ্গিয়া যাওয়ার কথা আলোচনা করে কেন? তার নিজের স্বার্থের অন্বেষণে কোথায় কে কষ্ট

পাইবে, তা ভাবিবার কি সার্থকতা? তার স্বভাবে এই দুর্ব্বলতা ত দেখা যায় নাই। আজিকার দুর্ব্বলতা দেখিয়াই সে হাস্য করিল। বাস্তবিক পক্ষে, সে কমলাকে রমেনের হাত হইতে ছিনাইয়া লইতেছে না। সে রমেনকে স্পষ্ট বলিয়াছে, কমলাকে লাভ করিবার জন্য যথারীতি চেষ্টা করিবে। রমেনের পশ্চাৎ হইতে কোন কিছু করিবার তার বাসনা নাই। আর রমেন তাকে স্পষ্ট অনুমতি দিয়াছে, সে কমলার জন্য চেষ্টা করিতে পারে। ব্যস্, ইহাব বেশী আর জানিবার প্রয়োজন কি? রমেন যদি মূঢ়তাবশত নিজ অধিকারে শত্রুকে প্রবেশ করাইয়া থাকে, তার দায়িত্ব নরেশের নয়। কমলার সহিত রমেনের সম্পর্কের কথা সে কিছুই জানে না। তাকে নিজ কল্পনার বলে রূপ দিবার প্রয়োজন কি? রমেন ও কমলা পরস্পরকে ভালবাসে, অথবা তাদের একজন ভালবাসে, সে কথা ত অল্পদিনে পরিষ্কার হইয়া যাইতে পারে। সে সম্বন্ধে আগে থেকে কোন কথা ভাবিয়া লাভ কি? যদি কমলার মন মুক্ত থাকে, তা হইলে সে নিশ্চয় তার মন পাইবার বা তাকে লাভ করিবার চেষ্টা করিবে। রমেনের বুক ভাঙ্গিয়া যায়, উপায় নাই। সে জানিয়া শুনিযা নিশ্চয় তার বুক ভাঙ্গিবে না। কিন্তু রমেন যদি হৃদয়ের কথা হৃদয়ে রাখে, তা হইলে কল্পিত তার ব্যথার কথা মনে করিয়া সে পশ্চাৎপদ হইবে না। তার নিজের সুখ ও স্বার্থ নিশ্চয়ই তার নিজের কাছে বড, এবং সুখী হইবার অধিকার তার পূর্ণমাত্রায় আছে। সুতরাং নরেশ মন স্থির করিয়া ফেলিল, সে বাজে কথাব পিছনে নিজের মনকে আর দৌড়াইতে দিবে না, কমলাকে লাভ করিবার চেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করিবে।

এইবার নরেশ ভস্মাবশেষ চুরুটটা ছুড়িযা ফেলিয়া দিল এবং পশ্চাৎ দিকে হাত দুইটা সংলগ্ন করিয়া কিছুক্ষণ বারেন্দায় পায়চারি করিল। কিন্তু মন স্থির করিয়া ফেলা সহজ, সংকল্প অনুসারে কাজ করা কঠিন। রমেন তার প্রিয়তম বন্ধু না হইতে পারে,—হয়ত তার প্রিয়তম বন্ধু কেহ নাই, অথবা সকলেই তার প্রিয়তম বন্ধু,—কিন্তু সে যে প্রিয়, এ কথা নরেশ নিজের কাছে

অস্বীকার করিতে পারে না। রমেনকে সে সর্ব্বদাই মহৎ চরিত্র বলিয়া ভাবে এবং নিজের চেয়ে উঁচু আকাশে ধরিয়া নিরীক্ষণ করে। সাংসারিক জীবনে রমেনের বিফলতা তাকে অনেকের কাছে কৃপাপাত্র করিয়া রাখিয়াছিল বটে, কিন্তু নরেশ তার তেজস্বিতাকে বরাবর সম্মান করিয়া আসিয়াছে। সেজন্য আর পাঁচজনের সঙ্গে মিশাইয়া সে রমেনকে দেখিতে পারে না। রমেন তার কাছে বিশেষ এক ব্যক্তি। তা ছাড়া রমেন যেন নিজেই একটা বিপুল জগৎ। নিজের ভারে কোন্ দিকে চলিতেছে, বুঝিতে পারে না। তার কাছে বসিলে যেন মনের সমস্ত জানালা দরজা খুলিয়া যায়, আর বিশ্বের যত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বার্তা দ্রুতবেগে ঢুকিতে থাকে। এই বয়সে এত বড় বিদ্বান্, এত বড় রসজ্ঞ, নরেশ খুব কম দেখিয়াছে। দুঃখ এই, রমেনকে কেহ চিনিল না। কেহ না চিনুক, নরেশ চিনে এবং তার জন্য গৌরব বোধ করে। সে নিজেকে যত বড স্বার্থপর ও সুখান্বেষী বলিয়া মনে করুক, রমেনকে কাঁদাইবে—এই কথা মনে করিতেই তার হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। সে অস্থির হইয়া যায়। কি করিবে ভাবিয়া পায় না। মনে করে, কাজ নাই অগ্রসর হইয়া। আরম্ভ হইতে না হইতেই সরিয়া পড়া ভাল। রমেন কি প্রত্যাশা করিতেছে যে, বন্ধুর মনের কথা বুঝিতে পারিয়া স্বাধীনতা সত্ত্বেও নরেশ তার মনোব্যথার কারণ হইবে না? নরেশ একবার ঝাঁপাইয়া পড়িলে আর তার নিজেকে সংবরণ করা সম্ভবপর হইবে না। তখন বন্ধুর চিন্তা কোথায় ভাসিয়া যাইবে, তার ঠিক নাই। তার চেয়ে আগে থেকে সাবধান হওয়া ভাল। রমেন-কমলার পথটাই নরেশ ছাড়িয়া দিক না। কিন্তু কমলাকে ছাড়িতে মন সরে না যে। রমেনকে সে ব্যথা দিতে চায় না, কমলাকেও ছাড়িবে না।

আহা! কি সুন্দর কমলার মুখখানি! ভাষা দিয়া সে মুখের কমনীয়তা, সে মুখের সৌন্দর্য্য প্রকাশ কবা যায় না। এ মুখের ছবি কেহ আঁকিতে পারে কি? কোন চিত্রকরের তলিকায় এ মখ ফুটিয়া উঠিবে? সে চিত্রকর

আজও জন্মায় নাই। বার বার করিয়া আজিকার সাক্ষাতের কথা মনে পড়ে। এই ত মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধান। ইহারই মধ্যে দৃশ্যপটের কি পরিবর্ত্তন! এখন বিকাল পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। সূর্য্য অস্তাচলের পথিক। আর তখন সবে জবাকুসুমসঙ্কাশ সূর্য্য পূর্ব্ব আকাশে দেখা দিয়াছেন। রাজপথে বেশী লোক চলাচল আরম্ভ হয় নাই। চারিদিক কোমল আভায় রঞ্জিত। সুশীতল বাতাস প্রাণ জুড়াইয়া দেয়। গাছপালা মাঠ ঘাট এত ভাল করিয়া ইহার পূর্ব্বে নরেশ আর লক্ষ্য করিয়াছে কি? হয়ত করিয়াছে। তথাপি সে না কি আজ নূতন জয়-যাত্রায় বাহির হইয়াছে, তাই তার কাছে সবই নূতন বোধ হইতে লাগিল। তার হৃৎস্পন্দনে জগৎ স্পন্দিত হইতেছিল। রাজপুত্র চলিয়াছে, যেন কোন রাজকুমারীকে জয় করিয়া আনিবার জন্য। কিন্তু রথ কৈ? রাজপুত্রের রথ কৈ? রথের ত অভাব ছিল না। নরেশের মোটর-রথ ঘরে বন্দী হইয়া রহিয়াছে। এইটুকু ত দূরত্ব, তার জন্য মোটরের প্রয়োজন নাই। শুধু ঐশ্বর্য্যের বিলাস একদিন না হয় নাই দেখাইল। তা ছাড়া, এমন দিনে হাঁটিয়া যাইতে বেশ আরাম। চৈত্রের এমন সকাল বেলাটা পরম উপভোগ্য। মোটরে বসিয়া তা উপভোগ করা চলিত না। সে চারিদিকের গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে যাইতে চায়। সে নিজেকে ও প্রকৃতিকে আজিকার এই সুন্দর সকালে সুন্দরী কমলার জন্য উপভোগ করিতে চায়। সে কবিত্বে মণ্ডিত হইয়া দেখা দিবে, যদিও কবিতার ধার সে ধারে না। তাই আজ তার বেশভূষাও হইয়াছে অনুরূপ। সে নিজের পারিপাট্যে নিজে সন্তুষ্ট, কারণ সে নিজে যা, তার চেয়েও তাকে সুন্দর দেখাইতেছে। ঠিক রাজপুত্তুর বলিয়া না ভাবিলেও কমলার প্রশংসমান দৃষ্টি সে লাভ করিবে, এ বিষয়ে তার কোন সন্দেহ নাই। মোটর না লইবার আর একটা গূঢ় কারণ হয়ত ছিল। হাঁটিয়া গেলে পথের দূরত্বটুকু বেশী হয়, ইহাতে সে নিজের মনে ভাবিবার বেশী সময় পাইবে। আগ্রহ তার প্রবল বটে, কিন্তু

ক্ষণকালের সংযমও স্পৃহনীয়। তাই চাদর উড়াইয়া এবং গন্ধ ছড়াইয়া সে ধীরে ধীরে চলিয়াছে।

এই রমেনের বাড়ী? বাড়ীর সম্মুখে নরেশ থমকিয়া দাঁড়াইল। ভাড়াটে বাড়ী অবশ্য কখনও তার নিজের বাড়ীর তুল্য হইতে পারে না। কিন্তু আজ উহাকে একটা অত্যন্ত কদাকার বিকট জীব বলিয়া মনে হইল। রমেনের বাড়ীর ভিতরে সে কোন দিন ঢুকে নাই বটে, কিন্তু বহুবার সে তার বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত রমেনকে পৌছাইয়া দিয়াছে। বহুবার সে এ পথে মোটরে যাতায়াত করিয়াছে। এমন কি, অনেক ক্ষণ ধরিয়া রাস্তায় রমেনের জন্য অপেক্ষা করিয়াছে। রমেনের ঘরের জানালার দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়াছে। কিন্তু আগে কোনদিন তার এই বাড়ীকে এত কুৎসিৎ মনে হয় নাই। আজিকার এই সুন্দর প্রভাতে তার মনে হইল, এটা যেন একটা উৎপাত। তার মনের এমন ভাব হইল যেন সে এখনই ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিলে বাঁচে। কেহ যদি তাকে এই দানবের হাত হইতে রক্ষা করে, তা হইলে সে তাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিতে প্রস্তুত আছে। এই দানব আর কিছু জীবন্ত নয়। এখনই তাকে তাড়া কবিয়া আসিতেছে না। তথাপি সেই দিন সমস্ত সকাল ধরিয়া নরেশ একটা আশ্চর্য্য অস্বস্তি অনুভব করিয়াছিল। তার মনে হইতেছিল, কে যেন পাষাণ-ভার তার বুকে চাপাইয়া দিয়াছে। এই বাড়ী বহুদিন পর্যন্ত তার চিত্তকে তোলপাড় করিয়াছে, এবং সেইদিন এই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, ওখানে আর কোনদিন সে কমলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবে না।

রমেনদের বাড়ী দেখিয়া কেন যে নরেশের চিত্ত এরূপ বিরূপ হইয়াছিল, তা নরেশ বুঝিতে পারে না। আরও ঢের খারাপ বাড়ী তার নজরে পড়িয়াছে। বাস্তবিক, সমস্ত বাংলা দেশ জুড়িয়া কদাকার বাড়ীর অভাব নাই। কোন নির্দ্দিষ্ট বাস্তুরীতি অবলম্বন করিয়া কেই বা এখানে বাড়ী-ঘর নির্ম্মাণ করে? বাস্তবিক পক্ষে দেশী বা বিলাতী কোন রীতিই অনুসৃত হয় না। প্রয়োজনের

খাতিরে যাব যেমন খুসী বাড়ী তৈরী করে। যদি ভাঙ্গিতে হয়, লক্ষ লক্ষ বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলা উচিত। এই ধরণের বাড়ীগুলি লোকে এত পয়সা খরচ করিয়া কেন করে, তা মালিকেরাই জানে। আর যারা আসিয়া সেগুলি ভাড়া লয় ও বাস করে, বলিহারি যাই তাদের রুচিকে! তারা পয়সা দিয়া ক্রয় করে, না স্বাস্থ্য, না আলো, না হাওয়া। গাছতলায় থাকাও ভাল, তবু এরকম বাড়ীতে বাস করা উচিত নয়। এমন বাড়ীতে লোকে টিকিয়া থাকে কি করিয়া? বিশৃঙ্খলভাবে, যেমন তেমন করিয়া, বাড়ীগুলি খাড়া করায় জায়গা বেশী লাগিয়াছে, দেখিতে অসুন্দর হইয়াছে, সর্ব্বোপরি অস্বাস্থ্যকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ আপত্তি করে না, কেহ চোখ রাঙ্গায় না। সকলেই সব কষ্ট চোখ বুজিয়া সহ্য করে। সুতরাং বাড়ীর উন্নতি করিবার জন্য বাড়ীওয়ালার কোন প্রকার গরজ নাই। পরন্তু নির্ব্বিবাদে সে যখন বাড়ী-ভাড়ার টাকা মাস মাস গণিয়া পায়, তখন কেনই বা সে বাস্তুর উন্নতির জন্য মাথা ঘামাইবে? ইহাতে গৃহ-সমস্যা যতই জটিল হোক, তার কিছু আসে যায় না। কোনদিন যদি এমন হয় যে, বাড়ী যারা ভাড়া লয়, তারা জোট বাঁধিয়া তাদের দাবী জোরের সঙ্গে জানায়, তা হইলে হয়ত চিন্তা করিবার অবসর বাড়ী-ওয়ালার ঘটে। তবে সে জানে সেদিন কখনও আসিবে না। তার পকেট বরাবর ভর্ত্তি হইতে থাকিবে।

সাধারণভাবে ভাড়া-বাড়ী সম্বন্ধে নরেশের আপত্তির অন্ত নাই। কিন্তু আজ সকালে রমেনদের বাড়ীর কাছে আসিয়া তার মন খারাপ হইয়া গেল। একবার তার মনে হইল, দূর হোক ছাই, ফিরিয়া যাই। কিন্তু কমলাকে দেখিবার জন্য প্রবল আগ্রহ না কি তার মনের মধ্যে, তাই সে কিছুতেই ফিরিয়া যাইতে পারিল না। আর চাহিলেও পারিত না। কারণ, ততক্ষণে রমেন আসিয়া হাসিমুখে তার কাছে দাঁড়াইয়াছে এবং কাঁধে হাত দিয়া বলিতেছে, 'এস ভাই, এস। আমার গরীবখানায় এস।'

আ, রমেনের এই সামান্য কয়টা কথা! মরুভূমির মধ্যে যেন জল। সে

বাঁচিয়া গেল। তা হইলে আর ভয় নাই। এই বাড়ী-দানব তার কিছুই করিতে পারিবে না। ইহার গহ্বরে থাকিয়াও একজন মানুষ অন্তত জ্যান্ত রহিয়াছে ও দিব্য চলাফেরা করিতেছে। নরেশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

রমেন চমকিয়া রূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করিল 'কি ?' অর্থাৎ ইতস্তত কেন ?

নরেশের মনে গরীবখানার প্রশ্ন ভ্রমেও উঁকি মারে নাই। সে ততক্ষণে সামলাইয়া লইয়াছে এবং তার দেব-দুর্লভ হাসি হাসিয়া বলিতেছে, 'বিশেষ কিছু নয়। আমার মনের এক ধাঁধাঁ। তোমাদের বাড়ীটাকে মনে হচ্ছিল যেন একটা দানব ; এখনই আমায় গিলে খাবে। কিন্তু ওর ভিতর থেকে তোমায় বেরুতে দেখে আমার সে ভয় কেটে গেছে। ভরসা হচ্ছে, আমিও আট্‌কে থাক্‌ব না।'

একজন কুঞ্চিত ভ্রূ এবং অন্য জন সহাস্য মুখ লইয়া দোতলার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। রমেনের ঘর। নরেশ আশ্চর্য্য হইল। দেখিল একটি চেয়ারে কমলা মাটির দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। নরেশ ভাবিল, তাকে চমৎকৃত করিয়া দিবার জন্য রমেন পরামর্শ করিয়া কমলাকে ঐ ভাবে বসাইয়া গিয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, কমলার উপর তার প্রভাব অনেক। এখানে তার নিজের স্থান করিয়া লওয়া সহজ কি ? ধীরে ধীরে তার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল।

অতি সাধারণ ধব্‌ধবে পরিষ্কার সাদা শাড়ী কমলার পরণে, লাল চওড়া পাড় সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। গলায় চিকণ লম্বা হার। কাণে হাঁস দুল। হাতে সরু চারগাছি চুড়ি। এই গয়নাগুলি আটপৌরে, সে সর্ব্বদা পরে। কপালে তার সিন্দুরের টিপ, আর পায়ে আল্‌তা। এই দুটাই সে ভালবাসে। নূতনের মধ্যে পরিয়াছে শুধু তিন রঙ্গা ব্লাউস্‌খানা। সাধারণত তার দুই হাত কাঁধ অবধি নগ্ন থাকে, কিন্তু আজ দুই সুন্দর বাহু আবরণে ঢাকিয়াছে, আর আঁচলে চাবির গোছা উঠিয়াছে। ইহাও নূতন। আচ্ছা, এই বেশে কোন মেয়ে কোন অপরিচিত যুবকের সম্মুখে প্রথম দেখা দেয় ?

কমলার বসন-ভূষণের অল্পতা বা হীনতা নরেশ লক্ষ্য করিল। সে ভাবিল, কমলা যথাসাধ্য তার উত্তম পোষাকে ও অলঙ্কারে দেখা দিয়াছে। তার মত অপরিচিত যুবকের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ কালে কমলার সুসজ্জিত হইয়া দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। সম্ভবত তাঁর পক্ষে ইহার অধিক সজ্জা করা সম্ভবপর নহে। তাদের অবস্থা খারাপ না হইলেও, হয়ত এমন নহে যে, সজ্জার ব্যাপারে ইহার অধিক ব্যয় করা চলিতে পারে। এজন্য নরেশ কমলার প্রতি কোন অনুকম্পা বোধ করিল না, কিন্তু মনে মনে প্রীত হইল। তাকে শাড়ী ও গয়না দিয়া মনের মত করিয়া সাজাইবার প্রচুর অবকাশ মিলিবে। ইহার দেহকে সাজাইতে যে অর্থ ব্যয় হইবে তা ত সার্থক ব্যয়। অত্যন্ত সাধারণ বেশে কমলাকে কি সুন্দর না দেখাইতেছে! চোখ ফিরাইয়া লওয়া যায় না। এই রমণীকে যদি সাজাইয়া লোকের সাম্‌নে বাহির করা যায়, তা হইলে ইহার মোহিনী শক্তি আরও না কত বৃদ্ধি পাইবে! নরেশ মনে মনে একবার ভাবিয়া লইল, ভবিষ্যতে ইহাকে কেমন করিয়া সাজাইবে।

রমেনের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া নরেশের মনে এতক্ষণ ধরিয়া যত কিছু গ্লানি ও অস্বস্তি সঞ্চিত হইয়াছিল, তা শূন্যে মিলাইয়া গেল। রূপসী কমলার উপস্থিতি যেন ঘরটিকে এক নূতন শোভা দান করিল। নরেশের মন প্রীতিতে ভরিয়া উঠিল। ঘরের পারিপাট্য ও সজ্জা সে লক্ষ্য করিল বটে এবং তাতে তার প্রতি রমেনের অনুরাগেরও পরিচয় পাইল, কিন্তু ঘরটিকে সুন্দর করিবার হাজার চেষ্টাও উহাকে এরূপ অপূর্ব্ব শোভা দান করিত কি, একমাত্র কমলার উপস্থিতি যা করিয়াছে? নরেশের মনে হইল, করিত না।

কমলা ফিরিয়া দুজনকেই দেখিতে পাইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে আগে অপরিচিত নরেশকে নমস্কার না জানাইয়া তার পরিপূর্ণ দৃষ্টি রমেনের উপর স্থাপিত করিল। তার ওষ্ঠে যেন ঈষৎ হাসি দেখা দিল। তারপর সে হাত তুলিয়া সুন্দর ভঙ্গীতে নরেশকে নমস্কার করিল। নরেশ অবশ্য প্রতিনমস্কার করিল, কিন্তু বিমনা হইয়া গেল। কমলার আচরণের

অর্থ কি ? এই আচরণ দ্বারা সে কি বুঝাইতে চাহিতেছে ? সে কি কিছু বুঝাইতে চাহিতেছে ? রমেনের উপর স্থাপিত তার সেই গভীর পরিপূর্ণ দৃষ্টি, আ, সে দৃষ্টি লাভ করিবার জন্য নরেশ অনেক কিছু ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছে। সে দৃষ্টিতে কোন সঙ্কেত, কোন নীরব ভাষা, লুকাইয়া ছিল কি ? সেই দৃষ্টিতে কোন অনির্ব্বচনীয় বাণী মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল কি ? আর সেই দৃষ্টির আঘাতে, মনে হইল, রমেন যেন বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। নরেশের ভুল হইতে পারে, সবটাই তার কল্পনা হইতে পারে, কিন্তু রমেন মুহূর্ত্তের জন্য তার সত্তা হারায় নাই কি ? মুহূর্ত্তের জন্য। কারণ সে-দৃষ্টির কোন জবাব রমেনকে দিতে নরেশ দেখে নাই। আর তার স্বাভাবিক কথাবার্ত্তা সে তখনই আরম্ভ করিয়াছে। তথাপি মানব-জীবনের দুর্ল্ভ মুহূর্ত্তে কি বিরাট সম্ভাবনা না লুকাইয়া থাকিতে পারে ? দুর্ল্ভ মুহূর্ত্তে এমন ঘটনা ঘটিতে পারে, যা সমস্ত জীবন সাধনা করিয়াও ঘটান যায় না। সুতরাং মুহূর্ত্তব্যাপী বলিয়া কোন কিছুকে নরেশ উড়াইয়া দিতে পারে না। মুহূর্ত্তগুলি সম্বন্ধেও সাবধান হওয়া দরকার। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, অল্প সময়ের মধ্যে নরেশ যেন তৃতীয় একটি নেত্র ও তৃতীয় একটি কর্ণ লাভ করিয়াছে। কোনদিন সে ভাব-বিলাসিতার ধার ধারে না। অথচ এখন এমন সব সূক্ষ্ম বিষয় লইয়া সে মাথা ঘামায় যা আগে হাসিয়া উড়াইয়া দিত।

নরেশ নিজের বাগানে নামিয়া পায়চারি করিতে লাগিল। মধুর চৈত্র-সন্ধ্যা! মধুর জীবন! মদির যৌবন! প্রিয় এক একটি ফুলগাছ হইতে ফুল তুলিয়া পায়চারি করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল। আজিকার মধুর চৈত্র-প্রভাত ব্যর্থ হয় নাই। যে এক ঘণ্টা কাল সে কমলার সংসর্গ পাইয়াছিল, তার স্মরণেও তার হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক হয়। এই এক ঘণ্টা তার জীবনে অমর হইয়া রহিল। সে যে রমেনের বাড়ীতে কমলাকে দেখিতে আসিয়াছিল, এজন্য নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করিল ও ধন্যবাদ দিল। রমেনের এই দানবরূপী পুরীতে সাক্ষাতের ব্যবস্থা না হইলে সে নিশ্চয়ই আরও খুসী হইত। কমলাকে

যে তার পূর্ণ স্বরূপে এখানে কখনও দেখা যাইতে পারে না, তা সে এখনও মনে করে। তথাপি সে কমলাকে যতটুকু দেখিয়াছে, তাতেই মুগ্ধ হইয়াছে। কমলা সেই মেয়ে, যাকে একবার দেখিলে বার বার দেখিতে ইচ্ছা হয়।

কমলা কথা বলিতে জানে। সত্য কথা এই যে, সে জন্ম-কথিকা। তার কথার মধ্যে কোন জড়তা নাই, কোথাও অস্পষ্টতা নাই। কাণ পাতিয়া শুনিতে ইচ্ছা করে। অথচ তার কথা-বস্তু হয়ত অতি সামান্য, অতি সাধারণ, ঠিক তার সাজসজ্জার মত। নরেশ চমৎকৃত হইয়া লক্ষ্য করিল, এ বিষয়ে রমেনের সহিত কমলার আকাশ-পাতাল তফাৎ। কমলা কোন গভীর তত্ত্ব-কথার উল্লেখমাত্র করে না। সাহিত্য, দর্শন বা বিজ্ঞানের কোন গন্ধ তার কথার মধ্যে নাই। সাদা মেঠো কথা! যে কথা উপদেশ নয়, বিচার নয়, যা মন্তি, শশীর মুখে সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়, অথচ যা জীবন্ত ও সর্ব্বদা অপার ঔৎসুক্যে ভরপূর। নরেশের ভয় ছিল, রমেন হয়ত কমলাকে তার শিষ্য করিয়া নিয়াছে, তাই তার মুখে বড় বড় কথা শোনা যাইবে। দেশ উদ্ধার হইতে আরম্ভ করিয়া রমণীর রূপ পর্য্যন্ত সে তীক্ষ্ণধার যুক্তিপূর্ণ কথা দ্বারা, অসংখ্য কথা দ্বারা, ব্যাখ্যা করিবে। কিন্তু দেখা গেল, কমলা তার কিছুই করিল না। তার কথার মধ্য দিয়া সে নিজের বিদ্যা বা বুদ্ধির কিছুমাত্র পরিচয় দিতে চেষ্টা করিল না। নরেশ ভারী আরাম বোধ করিল। কমলা যে অত্যন্ত লজ্জাবতী নহে, তজ্জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। প্রথম নমুনায় কমলাকে মাথা নীচু করিয়া থাকিতে দেখিয়া মনে হইয়াছিল, সে বুঝি মুখই খুলিবে না। কিন্তু সে যখন খুব সহজে মুখ খুলিল, আপনার জনের মত নরেশের সহিত কথা বলিল, তাকে নানা অনুযোগ করিয়া খাওয়াইল, তখন নরেশের আর আনন্দের সীমা রহিল না। কমলা বৃথা লজ্জা ত করেই না, বরং একবার মুখ খুলিলে মুখরা হয়, হাসি পাইলে হাসে এবং ব্যঙ্গ বা অনুকরণেও ওস্তাদ। কমলা যে স্বাভাবিক তাতে সন্দেহ নাই। সে আরও কি, নরেশ তা এখনও জানে না।

রমেন ছোট। এক বছরের বেশী নয়। মাস ধরে হিসাব করলে হয়ত কয়েক মাস মাত্র। কিন্তু আপনাকে আন্দাজ করতে বল্লে আপনি স্বচ্ছন্দে আমার বয়স পাঁচ বৎসর বাড়িয়ে দিতেন। এই ত ?"

কমলা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে হাসি থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার কোন্ মাসে জন্ম ?'

'বৈশাখ মাসে।'

'তারিখ ?'

'১০ই বৈশাখ।'

'সময় ?'

'সকাল বেলা ৭টা।'

'পক্ষ ?'

'শুক্ল।'

নরেশ এই সকল প্রশ্নে স্বস্তি না পাইলেও কৌতুক অনুভব করিতেছিল এবং উত্তর দিতে গিয়া ক্রমাগত হাসিতেছিল। আর রমেন ক্রমাগত গম্ভীর হইয়া পড়িতেছিল।

কমলা বলিল, 'আপনার যদি ১০ই বৈশাখ জন্ম হয়, তা হলে আজ ৫ই চৈত্র, মোটামুটি বলা যেতে পারে, আপনার বয়স' কমলা গণিতে আরম্ভ করিল, 'এক, দুই, তিন', তারপর শেষ করিল 'এগার', 'ত্রিশ বৎসর এগার মাস। ঠিক হয়েছে ?'

'হাঁ।'

কমলা এইবার রমেনের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার কোন্ মাসে জন্ম ?'

'আমি যদি না বলি।'

'আমি জোর করে বলাতে পারব না। জ্যোতিষীও নই।'

'জ্যোতিষী হবার চেষ্টা করছ না কি ?'

'মোটেই না।'

'আমার বয়স আজ উনত্রিশ বৎসর পাঁচ মাস চৌদ্দ দিন এগার ঘণ্টা ত্রিশ মিনিট। জন্ম কৃষ্ণ পক্ষে।'

'ওরে বাস্‌রে, দেখ্‌ছি আপনি আগে থেকে সব গণে বসে আছেন। দাঁড়ান, আমাকে মাস দিন সব অঙ্ক কষে বার করতে হবে। ভুল হলে ঠিক করে দিবেন।'

রমেন ও নরেশ দুজনেই হাসিল। রমেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও। আর কমলা রমেনের টেবিল হইতে কাগজ ও পেন্সিল টানিয়া লইয়া অঙ্ক কষিতে বসিল। বসিবার পূর্ব্বে একবার মন্তব্য করিল, 'রমেন বাবু, স্লেট পেন্সিল রাখ্‌তে পারেন না? স্লেট পেন্সিলে কত সুবিধা।' কতক্ষণ অঙ্ক কষিবার পর কমলা মুখ তুলিয়া বলিল, 'তা হলে আপনার জন্ম ২১শে আশ্বিন, বিকাল ৫টা ৩০ মিনিটে। কেমন, হয়েছে?'

রমেন বলিল, 'শুধু তারিখটা ভুল হয়েছে। ২১শে আশ্বিন নয়, ২০শে আশ্বিন।'

'তা বাংলা পাঁজির কারসাজি ধরা আমার কর্ম্ম নয়। যাক, প্রায় ঠিক হয়েছে ত?'

নরেশ বলিল, 'তা আর অস্বীকার করা যায় কি করে?'

রমেন কহিল, 'অঙ্কে তোমার মাথা আছে, তা তুমি প্রমাণ করতে পেরেছ।'

কমলা প্রথমে হাসিল, তারপর গম্ভীর হইয়া বলিল, 'নরেশ বাবু, আপনি এত বড় বিদ্বান্ হয়ে সামান্য ভুলটা কি করে করলেন?'

'কি ভুল?'

'আপনি একটু আগে বলেছেন যে, আপনার সঙ্গে রমেন বাবুর বয়সের তফাৎ এক বৎসরের বেশী নয়। কয়েক মাসও হতে পারে। অথচ দেখুন হিসাব করে, ত্রিশ বৎসর এগার মাস থেকে উনত্রিশ বৎসর পাঁচ মাস বাদ দিলে কত থাকে। দেড় বৎসর না?'

নরেশ বলিল, 'তা থাকে। আমি ভেবে বলিনি, এবং আমার ভ্রম-স্বীকার ও আপনার বুদ্ধির তারিফ্ করছি। এইবার আপনার পালা। এখন যদি আপনার বয়স জিজ্ঞাসা করি, আশা করি, বিরক্ত হবেন না।'

রমেন মনে মনে বলিল, 'কেমন জব্দ!'

কিন্তু কমলাকে জব্দ করা সহজ নয়। অনায়াসে বলিল, 'মোটেই না। আমার বয়স রমেন বাবু জানেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন।'

তৃতীয় বার রমেনের মুখ লাল হইল। মনে মনে ভয়ানক রাগ করিল। দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'আমি জানি না।'

'আমি ভেবেছিলাম, আপনি জানেন। আচ্ছা, আন্দাজ করুন।'

রমেন বলিল, 'আমার আন্দাজ করতে বয়ে গেছে।'

কমলা কিছুক্ষণ রমেনের বিরক্তি লক্ষ্য করিল, পরে বলিল, 'আমার বয়স আঠার বৎসর। বয়সটা বড় কম হল না।'

নরেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'মাস?'

'শূন্য।'

'তার মানে?'

'তার মানে, আজ আমার জন্মদিন। তাই মাস শূন্য, দিন শূন্য।' এই বলিয়া সে দুজনকেই প্রণাম করিল। মেয়েটার প্রগল্ভতার কি সীমা আছে?

আজ কমলার জন্মদিন! একথা কে ভাবিতে পারিত? জীবনে নরেশ কমলাকে এই প্রথম দেখিল। আর আজই কি না তার জন্মদিন! এই যোগাযোগ কি নিতান্ত অহেতুক? নরনারীর ভাগ্যবিধাতা এই ঘটনার দ্বারা কি কোন কিছুর ইঙ্গিত করিতেছেন? কি ইঙ্গিত করিতেছেন? ইহার পূর্ব্বে বহু এই চৈত্র আসিয়াছে এবং চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু নরেশের জীবনে এমন এই চৈত্র আর কোন দিন আসে নাই। এখন এই বাগানের মধ্যে একাকী নরেশের সেই কথা মনে পড়িতেই তার ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া গিয়া রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িতে আরম্ভ করে, অথবা গলা ছাড়িয়া গান গাহে, অথবা—অথবা—এমন কিছু করিয়া বসে,

যার জন্য পরে অত্যন্ত অনুতাপ করিতে হয়। তার নিজের মনের এই আবেগে সে অবাক্ হইয়া গেল। এটা যে বসন্ত কাল নরেশ তা ভুলিয়া গিয়াছিল। ফাল্গুনে দিকে দিকে যখন শিহরণ জাগে, তখন একবার মনে পড়ে, বসন্ত আসিয়াছে। তারপর ভুলিয়া যাই যে বসন্ত বাহিরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। হে বসন্ত, হে ঋতুরাজ, তোমায় নমস্কার। হে বসন্তের রাণি! তোমায় নমস্কার! কে বসন্তের রাণী? নরেশ তা বুঝিয়াছে। ভালই হইয়াছে যে, আজ বসন্ত কাল। ভালই হইয়াছে যে, বিপুল বসুধায় অনাদি কালের এক টুক্‌রা এই বসন্তে কমলার সহিত নরেশের দেখা হইয়াছে। পথে পথে লাল নাগকেশরের রক্তলেখায় এই কাহিনী লিখিত হইয়া গেল। সুন্দরী কমলার সহিত বসন্তের এক সুন্দর প্রভাতে নরেশের দেখা হইয়াছে, ইহার চেয়ে বড় ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে আর ঘটে নাই, নরেশ নিজের মনে বার বার এই কথা বলিল।

কমলাকে বয়সের আলোচনা করিতে দেখিয়া নরেশ আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। কোন মেয়ে এমন ভাবে তার সম্মুখে আলোচনা করিতে পারে, ইহা তার কল্পনারও অগোচর ছিল। কমলার আচরণে অশোভন কিছু ছিল না হয়ত, তথাপি ভাল লাগে নাই। কমলা বলিয়াই মানাইয়াছিল, অন্য কাহাকেও মানাইত না। আলোচনার অর্থ এখন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

কমলার সেই অসঙ্কোচ প্রণাম! তাকে আর রমেনকে। তা দেবতাদেরও দেখিবার বস্তু। নমস্কার নয়, প্রণাম। অপরিচিত নরেশকে কথার মাঝখানে এমন সুন্দর স্বাভাবিকভাবে আর কেহ নতি জানাইতে পারিত কি? কমলা বলিয়াই সম্ভব হইল। ইহাতে তার মাধুর্য্য ও গৌরব আরও প্রকটিত হইল। নরেশের হয়ত আশীর্ব্বাদ করা উচিত ছিল। কিন্তু রমেন আশীর্ব্বাদ করে নাই। সুতরাং তারও আশীর্ব্বাদ করা হয় নাই। আর সে কিই বা আশীর্ব্বাদ করিত? একটি আঠার বছরের অপরূপ সুন্দরী মেয়েকে কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে শোভন হয়, তা সে জানে না। সে যদি বলিত, 'মনের মত বর

জুটুক', তা হইলে তা উপহাসের মত শুনাইত। কারণ, সে ত কমলাকে লাভ করিবার কামনা লইয়াই আসিয়াছে। আজিকার সমস্ত আয়োজনের কেন্দ্র সে নিজে। নায়ক সে নিজে। নিজেকে সরাইয়া সেখানে আর কাহারও স্থান করিয়া দিতে সে প্রস্তুত আছে কি? যতক্ষণ সে কমলাকে দেখে নাই, ততক্ষণ তার পক্ষে কমলাকে আমল না দেওয়া সম্ভবপর ছিল।

নরেশের আজিকার আগমনের উদ্দেশ্য রমেন কি তাকে বলে নাই? রমেন যদি না বলিয়া থাকে, তা হইলেও কমলার পক্ষে আন্দাজে কিছু অনুমান করা কি অসম্ভব? অথচ, আশ্চর্য্য এই, কমলা তাতে বিচলিত নহে। কি ভাবে কমলা মনে মনে? পরের মন ভুলান সম্বন্ধে তার মনে কোন অহংকার আছে বলিয়া ত মনে হয় না। কমলা যেন স্বচ্ছ জলের মত। সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইলে বহুদূর পর্য্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। তার মনে কোন প্যাচ আছে বলিয়া মনে হয় না। তার ব্যবহার সরল। তার কথাবার্ত্তা সরল। তথাপি সে ভীরু বালিকামাত্র নয়। তার সাহস তার হৃদয়ের পবিত্রতা হইতে জাত। নরেশ তাকে অবিচার করিতে পারে না।

কমলা হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল, 'আপনি মোটরে এলেন না কেন?' অদ্ভুত প্রশ্ন। এরূপ প্রশ্ন করিবার কি কোন হেতু আছে?

নরেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কি করে জান্‌লেন, আমি মোটরে আসিনি?'

'আপনি এসেছেন না কি?

'না।'

'তবে?'

'আমি জিজ্ঞাসা করছি, আপনি জান্‌লেন কেমন করে!

কমলা হাস্য করিল, 'কেন, তা জানা কি খুব কঠিন কাজ! মোটরে এলে ত মোটরের শিঙ্গা বাজিয়ে পাড়া সচকিত করে তুল্‌তেন।'

ভালই করিয়াছে নরেশ যে, মোটরে আসে নাই। পাড়া সচকিত করিতে সে মোটেই চায় না। অন্তত, এখন না। কিন্তু কমলা কি উৎকর্ণ হইয়া ছিল?

সে কি রাস্তায় কোন মোটরের আওয়াজের জন্য কান পাতিয়া ছিল? ছিল, ভাবিতেও ভাল লাগে। বলিল, 'রাস্তা দিয়ে কত মোটর যাওয়া আসা করছে, আপনি কি করে বুঝ্‌তেন কোন্‌টা আমার?'

'ভুল করলেন, এ রাস্তা দিয়ে মোটর কম যায়—'

'হার মান্‌ছি। কিন্তু মোটরে এলেও আমি যে শিঙ্গা বাজাতাম, কে বল্লে? আমি নিঃশব্দে আস্‌তে পারি।'

'পারেন না কি? তা জান্‌তাম না। কিন্তু পারলেও আস্‌তেন না। শুধু তর্কের খাতিরে বল্‌ছেন, আস্‌তেন।'

'আপনিও কি তর্কের খাতিরে বল্‌ছেন না, মোটরের শিঙ্গা শুন্‌তে পেতেন? কি করে পেতেন? ঘরের মধ্যে নানা কাজে ব্যস্ত থেকে—'

'আপনি আমায় খুব কাজের মেয়ে বলে মনে করছেন বুঝি?'

'মনে করলে কি ভুল হবে?'

'হবে।'

নরেশ হাসিল, মাথা নাড়িয়া বলিল, 'বিশ্বাস হল না।'

'বিশ্বাস করতে বল্‌ছি না। একদিন হয়ত প্রমাণ হয়ে যাবে।'

নরেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'যেদিন হবে, সেদিন মানা যাবে।'

তুচ্ছ কথা! তবু একটা বৃহৎ আভাষ রহিয়াছে কি? নরেশের সহিত এই সাক্ষাৎ, কমলা ভাবী বহু সাক্ষাতের সূচক বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে!

নরেশ জানিতে চাহিল, কমলা কি করিয়া জানিল, সে মোটরে আসে নাই। কমলা কহিল, 'আগে বলুন, কেন আসেন নি?' এই লইয়া দুজনে একটু তর্ক হইল।

নরেশ বলিল, 'কি মুস্কিল! আমি আগে প্রশ্ন করেও আগে উত্তর পাব না?'

'আমি মেয়ে। আমি জিজ্ঞাসা করি, মেয়ের প্রাপ্য সম্মান হিসাবে আমি

আমার প্রশ্নের উত্তর আগে চাইতে পারি কি না।' তার পরেই মুখ ফিরাইয়া কমলা বলিল, 'আচ্ছা, আমার প্রাপ্য ছেড়ে দিলাম। মনে থাকে যেন।'

রমেন কহিল, 'থাক্‌বে।'

রমেনকে গ্রাহ্য না করিয়া কমলা বলিল, 'এর পর নরেশ বাবুকেও তার প্রাপ্য ছেড়ে দিতে হবে। শুনুন তবে, আমি সহজেই জেনেছি, আপনি মোটরে আসেন নি। কারণ, আমি জানালা থেকে আপনাকে হেঁটে আসতে দেখেছি।'

তুচ্ছ কথা, কিন্তু মধুর! তুচ্ছ কথা এত মধুর হইতে পারে, নরেশের জানা ছিল না। কমলা তা হইলে উৎকণ্ঠিত হইয়া তার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল! কমলা তারই জন্য রাস্তার দিকে চাহিয়াছিল! ভাবিতেও ভাল লাগে। হয়ত এক সময়ে সে জানালায় দাঁড়ায় ও হঠাৎ নরেশকে দেখিতে পায়। নরেশ ঘরে ঢুকিয়াই দেখিয়াছে, কমলা চুপ করিয়া বসিয়া আছে, সুতরাং কমলা তার প্রসাধন সারিয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

নরেশ হাসি-মুখে জিজ্ঞাসা করিল, 'এবার জবাব দিবার পালা আমার, না?'

'হাঁ।'

'আজকের সুন্দর চৈত্র-প্রভাতে মোটরে চড়্‌তে ইচ্ছা হল না। ভাব্‌লাম আজ একজনের জন্মদিন—'

কমলা কলহাস্য করিয়া উঠিল, 'মিছে কথা বল্‌ছেন। আপনি কক্ষণ জান্‌তেন না, আজ আমার জন্মদিন। জান্‌তেন?'

'এমন ত হতে পারে, আমি গণ্‌তে জানি। সকলের একটা করে পেশা থাকে। আমার পেশা গণা।'

'আপনার পেশা গণা হতে পারে না।'

'আমার পেশা তবে কি?' নরেশ বেশ আমোদ বোধ করিল।

'সে প্রশ্ন আমিই কর্‌ছি। বলুন, আপনি কি?'

'আমি কি, আমি তা নিজেই ভাল করে জানি না।'

'এর মধ্যে অত দার্শনিকতা আন্‌ছেন কেন? আপনার পেশার কথা জিজ্ঞাসা করছি। আপনি নিজের পেশা নিজে বল্‌তে পারেন না?'

'পারি, কিন্তু মুখে বাধে।'

রমেন বলিল, 'নরেশ এ অঞ্চলের একজন জমিদার।'

নরেশ বাধা দিল, 'জমিদার নয়, সামান্য জমির মালিক মাত্র।'

'আপনার জমিদারি কোন্ কোন্ জায়গায়?' কমলা বুঝিল, প্রশ্ন অনুচিত। তথাপি করিল।

'ঢাকা আর বাখরগঞ্জে।'

'তা হলে অনেক জায়গা জুড়ে।'

'অল্প জায়গা—।'

'জমি দিয়ে আপনি কি করেন?'

'আমি কিছু করি না। প্রজারা চাষ করে।'

'আপনার জন্য?'

'না। নিজেদের জন্য।'

'তাতে আপনার কি লাভ?'

'লাভ খাজনা। আমি খাজনা পাই।'

'আপনি খাজনা খান

'যা বলেন।'

'কত খাজনা খান?'

কমলার জিজ্ঞাসায় নরেশ অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিল। তার বন্ধুদের কেহ এ পর্যন্ত তাকে এ সব প্রশ্ন করে নাই। রমেন অস্বস্তি বোধ করিয়া কমলাকে বাধা দিতে চাহিল। কিন্তু কমলা বাধা মানিল না। সে জমিদারি সম্বন্ধে কিছুই জানে না, ইহা স্বাভাবিক। হয়ত বালিকা-সুলভ চপলতা ও কৌতূহলবশত জিজ্ঞাসা করিতেছে। কিন্তু চাপিয়া যাইবার প্রবৃত্তি নরেশের দেখা গেল না। সে ভ্রূক্ষেপে বলিল, 'আমার বাৎসরিক আয় প্রায় লক্ষ টাকা।'

কমলা চোখ বড় করিয়া বলিল, 'লক্ষ ? এত টাকা নিয়ে কি করেন ?' -

'কি করি ? সিন্দুকে তুলে রাখি।'

কমলা একটু ভাবিয়া বলিল, 'তা হতে পারে না।'

'কেন পারে না ?'

'আপনি অত নিষ্ঠুর হতে পারেন না।'

'নিজের প্রাপ্য নেওয়ার নাম কি নিষ্ঠুরতা ? জমিদার মাত্রেই নেয়।'

'নিক। কিন্তু আমি জানি, আপনি প্রজাদের জন্য অনেক টাকা খরচ করেন।'

নরেশ সোজাসুজি কোন উত্তর না দিয়া বলিল, 'খাজনা আমার ন্যায্য পাওনা।'

কমলা গম্ভীরভাবে বলিল, 'লক্ষ টাকা কখনও আপনার পাওনা হতে পারে না।'

'সে কি কথা ? আমি ত বলেছি ওটা আমি পাই।'

'কিন্তু বৎসরে লক্ষ টাকা কি আপনার দরকার ?'

'মানে ?'

'মানে, আপনি নিজের জন্য বৎসরে কত টাকা খরচ করেন ?'

'চব্বিশ-পচিশ হাজার।'

'একজন লোকের জন্য এ অনেক বেশী।'

নরেশ হাসিল। বলিল, 'টাকা খরচের কোন মাপকাঠি নেই। একজনের পঁচিশ টাকায় চলে, অন্য জন পঁচিশ হাজার টাকায়ও কুলাতে পারে না।

'মান্‌লাম, আপনার পঁচিশ হাজার টাকা লাগে। আচ্ছা আরও পঁচিশ হাজার আপনাকে দেওয়া গেল জমাবার জন্য। বাকী থাকে পঞ্চাশ হাজার।'

'হুঁ।'

'আপনি ইচ্ছা করলে, পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রতি বৎসর দান করতে পারেন।'

নরেশ হাসিতে হাসিতে বলিল, 'রক্ষা করুন, ঐটি করতে আমি কিছুতেই রাজী নই।'

'তবে সব টাকাই জমান হচ্ছে ?'

'হঁ।।'

'অর্থাৎ, দশ বৎসরে আপনার জমান টাকা হয়ে দাঁড়ায় পাচ লাখ। উঃ, এত টাকার কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না। এত টাকা আপনি কি করবেন ?'

'ভাবিনি কোন দিন।'

'আচ্ছা, আপনার কে আছেন ?'

'আপনি রমেনের কাছে শুনে থাকবেন, আমি বিয়ে করিনি, অর্থাৎ আমার স্ত্রী নাই।'

'বেশ।'

'স্থতরাং ছেলে বা মেয়ে নাই।'

'বেশ।'

'মা মারা গেছেন জন্মের পরে। বাবা চৌদ্দ বৎসর বয়সে। ছিলাম একমাত্র সন্তান।'

'আত্মীয় স্বজন ?'

'তিন কুলে কেউ নাই।'

কমলার চো[illegible] লোভে উগ্র হইয়া উঠিবে, ইহাই কি নরেশ আশা করিয়াছিল ? কিন্তু [illegible]শ্চর্য্য মেয়ে কমলা। সে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইল, রমেন বা নরেশ দেখিতে না পায়। অশ্রু গোপন করিতে চাহিল কি ? কিন্তু নিজ জীবনকে নরেশের তেমন বেদনাময় মনে হয় না। ছেলে বেলায় বাপ-মা হারাইয়া তাঁদের অভাব তেমন ভাবে আর অনুভব করে না। ইতিপূর্ব্বে একদিন অন্য সকলের বাপ-মা ও ভাইবোনেদের দেখিয়া সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াছে, কিন্তু ত্রিশ বৎসর বয়সে এই দীর্ঘনিঃশ্বাসের প্রয়োজন নাই। বাঁচিয়া

থাকিবার জন্য তাকে বহু সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আসিতে হইয়াছে। ননীর পুতুল হইবার সুযোগ সে পায় নাই। তার হাড় শক্ত হাড়। সম্পত্তি রক্ষা ও বৃদ্ধি করিতে গিয়া তার পরিশ্রম করিবার শক্তি এবং বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বাড়িয়াছে। সুতরাং কমলার নারী-প্রাণ যদি ক্ষণেকের জন্য ব্যথা পাইয়া থাকে, পাক। ভবিষ্যতে সে বুঝিতে পারিবে, তার কল্পিত দুঃখ ও বেদনার কথা মনে করিয়া কোমলা কমলার দয়ার্দ্র হইবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

কিছুক্ষণ পরে কমলা ফিরিয়া দুইজনের দিকে তাকাইয়া হাসিল। মনে হইল, ছিন্ন মেঘের ফাঁক দিয়া চাঁদের উদয় হইয়াছে। কমলা বলিল, 'আশ্চর্য্য এই, ভোগ করবার কেউ নাই, অথচ টাকা জমান।'

রমেন বলিল, 'না, আশ্চর্য্য এই, ভবিষ্যতের কথা ভেবে মানুষ টাকা জমায়, কমলা বুঝ্‌তে পারে না।'

নরেশ হাসিল। এই হাসি তার নিজের কাছেই ভাল লাগিল। বলিল, সে একজনের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে, যা[illegible]স্বর্ণ-পাতে তার জীবন আলোকময় হইয়া উঠিবে। কেহ জানিতে চাহিল না, কে।

৪

নরেশের মত রমেনের আর কিছু অফুরন্ত সময় নাই। একবারে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাকে কাজ করিতে হয় না বটে, কিন্তু যতক্ষণ করি[illegible] হয় ততক্ষণ সে গভীর পরিশ্রম করে। এই পরিশ্রমে তার সমস্ত দেহ-[illegible] অবসন্ন হইয়া থাকে। তার আর কিছু করিতে ভাল লাগে না। ভাল লাগে না বলিলে কি হয়? বাড়ীতে তার জন্য নিত্য নানা ফরমায়েস্ জমা হইয়া আছে। সংসার তাকেই দেখিতে হয়। সুতরাং তাকে নিজের আরাম ত্যাগ করিয়া অন্যদের স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা আগে করিতে দেখা যায়। ইহাই নিয়ম। সে দশজনের জন্য খাটে এবং অর্থ উপার্জ্জন করে। সেই অর্থে তার যত

অধিকার, অন্য সকলের তার চেয়ে অনেক বেশী অধিকার। সে ছয় মাসে তার জুতা বা জামা বদ্‌লাইতে পারে না। কিন্তু অন্য কেহ একটু অভাবও সহ্য করিতে প্রস্তুত নয়। অথবা, নিজে কষ্ট ভোগ করিয়াও সে অন্য সকলকে যথাসাধ্য স্বাচ্ছন্দ্যে রাখিতে চেষ্টা করে। আশ্চয্য এই, তার নিকট হইতে সেবা পাওয়া সকলের পক্ষে এত স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে যে, তা লইয়া কেহ মাথা ঘামায় না। কেহ বলে না, 'আহা! রমেন বড়ই পরিশ্রম করিতেছে।' সে যে কাহারও নিকট করুণা বা কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশী, তা নয়। এই প্রকার ব্যবস্থা কবে হইতে সে মানিয়া লইয়াছে, এখন তার মনেও নাই। কিন্তু সে মানিয়া লইয়াছে। ইহার জন্য তার দুঃখ নয়। তার দুঃখের কারণ অন্য। এত করিয়াও সে পরিবারের অধিকাংশ লোকের মন পায় না। অন্তত সে মনে করে, পায় না। আর মনে না করিবার কোন হেতু নাই। পরিবারস্থ লোকদিগকে হৃদয়হীন ভাবিতে তার নিজের মনেই ক্লেশ উপস্থিত হয়। সে যতদূর সম্ভব নিজের কাছেও তাদের দোষক্রটি চাপিয়া রাখে। নিজের পরিশ্রম সম্বন্ধে মরিয়া গেলেও সে কাহারও সহিত আলোচনা করিতে পারিবে না, উহার দোষক্রটি উদ্‌ঘাটন করা ত দূরের কথা। এরূপ অবস্থায় সে নিজের সম্বন্ধে একটু সুবিচার, একটু সুবিবেচনা, আশা করিলে সেটা কি বড় বেশী দোষের হয়? প্রশ্রয় সে কারও কাছে পায় না, চায়ও না। দরদও না হয় কেহ না দেখাইল! সকল লোকের বিমুখতা সে নীরবে সহ্য করিতে প্রস্তুত আছে, যদি তাকে একা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। দুঃখ এই, কেহ তাকে ছাড়িয়া কথা বলে না। অন্যের ভুলক্রটি সম্বন্ধে সে উদাসীন, তা লইয়া কোন অনুযোগ করে না। কিন্তু অন্যেরা তার ভুলক্রটিকে সহজে ক্ষমা করে না। কঠোর সমালোচনা করে। এই সমালোচনা যদি শুধু তার সাম্‌নে হইত, অপর কেহ না জানিত, তা হইলে এত বাজিত না। কিন্তু তার ক্রটির উল্লেখ ও সমালোচনা বাহিরের দশজনের কাছে করিতেও কেহ কিছুমাত্র ইতস্তত করে না। মানুষ এমন নিষ্ঠুর কি করিয়া হয়? অথচ এই নিষ্ঠুরতার সে প্রতিবাদ

করে না, নীরবে সহ্য করে। তার এই সহনশীলতা ও ক্ষমার মূল্য বুঝিবার লোক পরিবারে নাই। এমনই অন্ধ ও মূঢ় ইহারা। ইহাদেরই জন্য সে প্রাণপাত করিতেছে। এক এক সময়ে তার নিজের প্রতি গভীর অনুকম্পা হয়। মনে হয়, তার জীবনের কোন মূল্য নাই। সে বৃথা খাটিয়া মরিতেছে। তার নিজের উন্নতি চিন্তা না করিয়া কেবলই খাটিতেছে। হয়ত না খাটিলে ভাল হইত। নিজের জন্য চিন্তা ও সঞ্চয় করিলে ফল নিতান্ত মন্দ হইত না। কতকাল তাকে ভূতের বেগার খাটিতে হইবে, কে জানে। হয়ত চিরকাল। সে যখন পৃথিবীতে আসিয়াছিল, তখন কি দাসখৎ লিখিয়া দিয়াছিল? এই দাসত্ব-মোচনের কোন উপায় তার হাতে নাই। সে একদিন মরিয়া ছাই হইয়া যাইবে, কিন্তু সেইদিন পর্য্যন্ত তাকে চিন্তা করিতে হইবে, কোন্‌খানে কার বিন্দুমাত্র সুখের ব্যাঘাত ঘটিল। এমন কোন কি ঘটনা ঘটিতে পারে না জীবনে, যা মুহূর্ত্তে দাসত্বের এই শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া দিবে? সে ইচ্ছা করিলেই অন্য সকলের দিক্ হইতে নিজের দিকে মুখ ফিরাইয়া লইতে পারে। ভীরু সে, দুর্ব্বল সে! তাই ঐরূপ ইচ্ছা করিবার, ভাবিবার, পর্য্যন্ত তার সাহস নাই। জীবনের বর্ত্তমান বিড়ম্বিত অবস্থাকে সে সর্ব্বদা অভিসম্পাত দিতেছে, তবু সে ইহাকে অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। ইহাই ভবিতব্য। ইহাই তার বিধাতা পুরুষ তার ললাটে লিখিয়া দিয়াছেন। তার বিদ্যা-বুদ্ধি তার কোন সহায়তা করিতে পারিতেছে না। যা পারিত তা টাকা। তা তার নাই। অতএব তাকে মুখ বুজিয়া সমস্ত সহ্য করিতে হইবে। এ পৃথিবীতে সুবিচার প্রার্থনা করা মিথ্যা। অন্যায়ের প্রতিকার প্রার্থনা করা মিথ্যা। কে সুবিচার করিবে? যাদের সুবিচার করার কথা, তারা তা করিতে গেলে নিজেদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে। কেহ নিজের স্বার্থ বিন্দুমাত্র ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নয়। কিন্তু রমেন যদি কখন ভ্রমেও একটু স্বার্থত্যাগ করিতে না চায়, তা হইলে তুমুল কাণ্ড। তার জন্য বহু বর্ষ ধরিয়া বহু অর্থ ব্যয় করা হয় নাই? আজ সে নিজ কর্ত্তব্য করিবে না, এমন

স্পর্দ্ধা তার কি করিয়া জন্মে ? সে যে পরিবারের সকলকে যথেষ্ট সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখিতে পারে না, ইহাই ত তার পক্ষে অপরাধ। সে অপরাধ সে বাড়াইবে না, আশা করা যাক। রমেন ঠিক দম-দেওয়া ঘড়ির মত নিজ কর্ত্তব্য করিয়া যায়, কোন শৈথিল্য বা অবহেলা দেখা যায় না, কিন্তু তাতে তার মন ছিল না। কর্ত্তব্যকে সে সরস করিয়া লইতে পারে নাই। কর্ত্তব্য তার কাছে শুষ্ক কর্ত্তব্য মাত্র রহিয়া গিয়াছে, আত্মপ্রসাদ ও আনুষঙ্গিক আনন্দ-বোধ নাই। তার পরিবারে লোক-সংখ্যা অনেক। নরেশের মত একা সে নয়। তথাপি সে বড় একা। পরিবারের লোকেরা মনে করে, বিদ্যা-বুদ্ধির অহংকারবশত সে নিজের চারিদিকে এক প্রাচীর গড়িয়া রাখিয়াছে, কারও সহিত মন খুলিয়া মিশিতে পারে না, এমন কি, অনেক সময় কথাও বলে না। না ; পরিবারের লোকেরা লক্ষ্য করিয়াছে, তার অল্প পরিচয় পরিবারস্থ লোকদের সহিত, অন্যদের সহিত নহে। উদাহরণ হাতের কাছেই রহিয়াছে। এই দেখ না, ওদের বাড়ীর কমলা। তার সহিত কেমন ঘনিষ্ঠ ভাবেই না মিশিতেছে, স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে কত কথাই না বলিতেছে! অথচ পরিবারের লোকদের সহিত সে দিনে কয়টা কথা বলে ? এমন বহু দিন গিয়াছে, সে একটিও বলে নাই। যাদের মধ্যে থাকিয়া সে মানুষ হইল, এত বড় হইল, এত বিদ্যা আয়ত্ত করিল, তারাই হইল পর, আর আপন হইল পরেরা! ইহাতে কার না গা জ্বালা করে ? এরূপ অবস্থায় রমেন যদি বৃহৎ পরিবারের মধ্যে থাকিয়াও একান্ত একাকী বোধ করে ত তবে দোষ কার ? নরেশের সহিত তুলনা করিয়া রমেন নিজেকে হতভাগ্য মনে করে। নরেশ তার চারিদিকে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। সকলের সহিত তার সম্বন্ধ প্রীতির সম্বন্ধ। সে সকলের সঙ্গে যে সহজ সম্পর্ক স্বীকার করিয়াছে, তার মধ্যে বাধ্য-বাধকতা নাই। তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবে, এমন সাহস কারও নাই। দূরত্ব বজায় রাখিয়া সকলে সমীহ করিয়া চলে। সে ধনী, এই চেতনা প্রত্যেককে

তার নিকট হইতে দূরে রাখিয়াছে। কিন্তু সে একাকী নয়। অন্যেরা সম্ভ্রমে দূরে থাকিলেও সে দূরে থাকে না। সে সকলের মধ্যে সকলের একজন হইয়া নিজেকে প্রকাশিত করে। তার নিজের বলিতে কেহ নাই বলিয়া সে পরকে নিজের বলিয়া অন্তরে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। কিন্তু রমেনের বেলা তা ঘটে নাই। একে রমেনের প্রকৃতি চাপা, সে স্বভাবত নিজেকে লোকচক্ষুর অগোচরে রাখে, নিজেকে গোপন করিতে চায়, তার উপর পরিবারে সে যূথভ্রষ্ট হরিণের মত বিচরণ করিতেছে। কাছের জন, ভালবাসার জন যারা, তাদের মধ্যে তার স্থান নাই। অপরিচিতের মত ইহাদের মধ্যে বাস করে। যেন সে প্রবাসে বিদেশীদের মধ্যে কাল কাটাইতেছে। যেন কাল প্রভাতে উঠিয়া ইহারা একদিকে যাত্রা করিবে, সে অন্য দিকে যাইবে। সৃষ্টিকর্ত্তা তাকে সমস্ত জগতে পথিক করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। পরিবারের হৃদয়হীন ক্ষেত্রে সে পথ হারাইয়াছে। সুতরাং ঘরে ও বাইরে কোথাও তার আশ্রয় নাই। সে শূন্য আকাশে দোল খাইতেছে। ফানুসের মত ঊর্দ্ধ আকাশে উঠিয়াছে বটে, কিন্তু এখনই জলিয়া ছাই হইয়া যাবে।

সমস্ত দিনের মধ্যে কমলার কথা তার অনেক বার মনে হইয়াছে, কিন্তু এলোমেলোভাবে। দুদণ্ড সুস্থির হইয়া কোন কথা কি ভাবিবার অবকাশ আছে? কাজ, কাজ, কাজ। সম্মুখে কাজ, পিছনে কাজ। কোন একটা চিন্তা আরম্ভ করিয়া শেষ করা যায় না। কোন একটা বিষয় আরামে উপভোগ করা যায় না। এমন কি, আজিকার সকালের ঘটনাগুলি পর পর সাজাইয়া চোখের সাম্‌নে ধরিবার পর্য্যন্ত তার অবকাশ হয় নাই। যতবার চেষ্টা করিয়াছে, ততবার বিফল হইয়াছে। প্রথম হইতে কতবার যে ভাবিতে আরম্ভ করিল, আর কতবার খেই হারাইয়া ফেলিল, তার ইয়ত্তা নাই। কেন এমন হয়? কেন সব জট পাকাইয়া যায়? কত ক্ষণের বা ঘটনা! অথচ কেন সে মনের মধ্যে এই ক্ষণগুলি কিছুতেই সাজাইয়া লইতে পারে না? কোন্ কথা ছাড়িয়া কোন্ কথা ভাবিবে, ঠিক পায় না। সে যেন

কথার জঙ্গলের মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। কোন কথা স্মরণ করিয়া যে ভাবের আবেগে তার চিত্ত উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে, তা নয়। সে একটুও উত্তেজিত না হইয়া সব কথা মনে করিতে পারে। বার বার সে পূর্ব্বক্ষণ-গুলিতে ফিরিয়া বাঁচিতে পারে। যা পারে না, তা শুধু সময়ের পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষা করা। ফলে, একই কথা তাকে বারে বারে ভাবিতে হয়। অধিকাংশ ভাবনাই গতানুগতিক। কিন্তু হঠাৎ কখনও নূতন অর্থ, নূতন জগৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলে। কখন অনুকূল, কখন প্রতিকূল চিন্তাধারা প্রধাবিত হয়। প্রতিকূল চিন্তাকে সে প্রশ্রয় দেয়, কিন্তু অনুকূল চিন্তাকে নয়। তার কাজের সমস্ত সময় ধরিয়া সকালের ছবিগুলি আনাগোনা করিতে লাগিল। আগেরটা পরে এবং পরেরটা আগে আসিল। সম্পর্কহীন কত কথা জড়িত হইয়া গেল। তা অনুসরণ করিতে গিয়া আবার কত নূতন কথা আসিয়া পড়িল। এমনই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে। তখন রমেনের চৈতন্য হয়। তখন সে আবার আসল কথায় ফিরিয়া আসে। ঠিক পূর্ব্ব জায়গায় ফিরিয়া আসিতে সব সময়ে কৃতকার্য্য [illegible] না। সে যে নরেশের মত চুপ করিয়া বসিয়া চিন্তা-সাগরে ডুবিয়া [illegible]ছে, তা নয়। সে হয়ত অবিশ্রান্ত লিখিতেছে। লেখার দিকে মন রাখিয়াছে, লেখা ঠিকমত হয়, তার জন্য চেষ্টা করিতেছে, চিন্তাও চলিতেছে। কলমের বিরাম নাই, চিন্তারও বিরাম নাই। সে হয়ত পাঁচজনের সঙ্গে খুব দরকারী কথা কহিতেছে, তখনও ফল্গুধারার মত তার অন্তর [illegible]য়া চিন্তারাশি চলিয়াছে। যখন সে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া [illegible] মনোযোগের সহিত কোন বিষয় বুঝাইতেছে, অথবা কোন বিষয় বুঝিয়া লইতেছে, তখনও তার মনে চিন্তা থামিয়া যায় নাই। কখনও এক, কখনও দুই, কখনও বা তার চেয়ে বেশী দিকে তার মন সজাগ হইয়া রহিয়াছে। একাধিক বিষয়কে সে তুল্যরূপ মর্য্যাদা দান করিয়া নিজের মধ্যে পরিপাক করিয়া লইতেছে। কিন্তু অন্য সব চিন্তা তুচ্ছ হইয়া যায়, কমলার বিষয় চিন্তা করিলে। তার মন আসলে পড়িয়া রহিয়াছে সেইখানে।

তাই সকল কাজের মধ্যে, সকল মনস্কতার মধ্যে, তার পরম প্রিয় কমলার চিন্তা ধ্রুবতারার মত জ্বলজ্বল্ করিতেছে। সকল চিন্তা আসিয়া ঐখানে ঠেকিতেছে। তাকে হাজার কাজ দাও, তার মনটাকে হাজার দিকে টানিয়া লইয়া যাও, সে লক্ষ্যচ্যুত হইবে না। আত্মবিস্মৃত হইতে পারে, ঘটনারাশি তার মনকে এমন আচ্ছন্ন করিতে পারে যে, সে তার পরম চিন্তাকেও আর চোখে দেখিবে না, কিন্তু সে কতক্ষণ? চেতনা ফিরিয়া আসে, এবং কমলার মুখ হৃদয়ের পটে ভাসিয়া উঠে। সেই মুখ, এ পৃথিবীতে যার তুলনা নাই।

আজ কমলার জন্মদিন! জন্মদিন! আঠার বৎসর আগে এই দিনে পৃথিবী আলো করিয়া এবং করিবার জন্য সে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইহার চেয়ে বড় ও সুন্দর ঘটনা আর কি ঘটিতে পারে? বারে বারে নিজের মনে কমলার জন্মদিনের কথা আবৃত্তি করিয়াও রমেনের তৃপ্তি হইতেছিল না। প্রিয় ছবিগুলি মানুষ সযত্নে বাঁধাইয়া দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখে। রমেন যেন চাহিতেছিল, সেও এই কথা তার অন্তরের মধ্যে এমন স্থানে বাঁধাইয়া রাখে যেন সকল সময়ে চোখে পড়ে। রমেনের মন অন্ধ নয় যে ভাবিবে, কমলার মত মেয়ে পৃথিবীতে আর জন্মগ্রহণ করে নাই। কমলার চেয়ে সকল দিকে শ্রেষ্ঠ অনেক মেয়ে পৃথিবীতে নিশ্চয় জন্মিয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় কমলা কোথাও জন্মায় নাই, ইহা ধ্রুব সত্য। এবং ঠিক জন্মদিনে নরেশকে লইয়া কমলার সহিত সাক্ষাৎ করান, এত বড় ঘটনাও ক্বচিৎ ঘটে। কমলা যদি—। সমস্ত ব্যাপারটি আগাগোড়া মনের মধ্যে ভাবিয়া দেখা দরকার। অথচ মুস্কিল এই, এক একটা বিষয়েই লক্ষ কথা মনে হয়, মনকে বারণ করিয়া রাখা যায় না। কিন্তু মন স্থির করা দরকার। রমেনকে অনেক বিষয় ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

কমলার সহিত নরেশের সাক্ষাতের দিন ও সময় ঠিক করিয়াছে রমেন। সুতরাং একথা বলিবার উপায় নাই, কমলা ইচ্ছা করিয়া ঐ দিন চাহিয়াছে।

কিন্তু কমলা তাকে নিজ জন্মদিন জানায নাই। কেন জানায় নাই? কমলার সহিত তার পরিচয হওয়া অবধি ইহার পূর্ব্বে আরও দুটি জন্মদিন গিয়াছে। ৫ই চৈত্র দুবার আসিয়া চলিযা গিযাছে। সে টেরও পায নাই। আজও পাইত না, যদি না হঠাৎ নরেশ আসিত, এবং কমলা হঠাৎ বলিয়া বসিত, আজ আমার জন্মদিন। ইহার অর্থ উপলব্ধি করিতে সে স্তব্ধ হইয়া থাকে। কমলা তার বয়সটা হঠাৎ জানাইযা দেয় নাই। নরেশ ও রমেনের বযস সম্বন্ধে তার কৌতূহল নিরর্থক প্রগল্‌ভতা মনে হইয়াছিল। কিন্তু এখন বুঝা যাইতেছে, উদ্দেশ্য ছিল নিজ বযস জ্ঞাপন করা, নরেশকে, এবং রমেনকেও জন্মদিনের প্রণাম করা। তথাপি রমেনের মনে একটা অভিমান মাঝে মাঝে জাগিযা উঠিতে চাহিতেছিল। কমলা এত বড কথাটা তাকে আগে জানায নাই কেন? আগে জানাইতে পারিত না কি? কালও ত হাজার কথা বলিযাছে। বিশেষ করিযা জন্মদিনের কথা চাপিয়া যাইবার কারণ কি ছিল? কিন্তু রমেন কেন আশা করিতেছে, কমলা তাকে আলাদা করিয়া এ কথা জানাইবে? কমলার সম্বন্ধে রমেনের কোন অধিকার নাই। সে যা ভাল মনে করিযাছে তাই করিয়াছে। তাকে সমালোচনা করিবার কি আছে? কিন্তু হাঁ, এখন মনে পডিতেছে, কমলা তাকে কি একটা বিশেষ কথা যেন বলিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তার অস্থিরতার জন্য বলিতে পারে নাই। হাঁ, সে বলিযাছিল, 'কাল ৫ই চৈত্র।'

'তাতে কি?'

একটু ইতস্তত করিযা, 'আপনার বন্ধু কাল না এসে অন্য দিন এলে হয না?'

রমেন রাগ করিয়াছে, 'কেন, কাল কি দোষ করল?'

'দোষ নয়'

'তবে?'

'ঠিক হয়ে গেছে?'

'হাঁ।'

কমলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কি ভাবিয়াছিল। দুজনেই ঘর গুছাইতেছিল। পরে সে দৃঢ়স্বরে বলিযাছিল, 'দেখুন, এখন থাক, আপনার বন্ধু না হয় আর একদিন আসুন।'

রমেন হাস্য করিল। লঘু হাস্য। 'তুমি যদি নরেশের কাছে আমায় অপদস্থ করতে চাও, তা হলে থাক।'

মনে হইল যেন কমলার গাল লাল হইয়া গেল। তাই নরেশের সহিত সাক্ষাৎকারের পর রমেনকে তিনবার অপ্রস্তুত করিয়া কি শোধ তুলিয়াছিল ?

কমলা বলিল, 'রাগ করলেন ?'

'রাগ নয়, কমলা, দুঃখ।'

'দুঃখ কেন ?'

'তা বলব না। কিন্তু নরেশের সঙ্গে আমি দিন ঠিক করে ফেলেছি—'

'আমি ত তা জানি না।' কমলা বলিল না, তাকে না জানাইয়া দিন ঠিক করিবার কি প্রয়োজন ছিল ? সে নিজেই যেন দোষী এইরূপ ভাবে বলিল। তথাপি মনে হইল, কমলা যেন মৃদু ভর্ৎসনা করিতেছে।

তখন রমেন কমলার চোখের দিকে, সেই আশ্চর্য্য চোখের দিকে, স্থির দৃষ্টি রাখিয়া বলিয়াছে, মনে মনে সেই চোখের প্রশংসা করিতে করিতে বলিয়াছে, 'কাল নরেশ আসবে, মা কিছু আয়োজন করেছেন, না এলে সেগুলি মাটি হয়ে যাবে। মার বড় লাগবে। জান ত আমাদের মত অবস্থার লোকের—'

আবার সেই কথা ! কমলা আর প্রতিবাদ মাত্র করে নাই।

সুতরাং জন্মদিনে তার সহিত নরেশের দেখা করাইবার দায় রমেনের, —কমলার নয়। কমলাকে দোষ দেওয়া চলে কি ? চলে না বলিয়াই রমেনের অভিমান বেশী। আচ্ছা, কমলা কি বলিতে পারিত না, 'কাল নয়, অন্য কোনদিন ঠিক করুন, কাল আমার জন্মদিন ?' তা হইলে, কি সুন্দর না হইত ! সে দিন বদলাইত কি না, তা পরের কথা। কিন্তু তার প্রতি

এইটুকু নির্ভরতা সে কমলার নিকট হইতে আশা করিয়াছিল। সে যে আগে এই খবরটুকু জানিতে পারে নাই, তার প্রতি পক্ষপাতিতা দেখান হয় নাই, তাতেই এখন তার মনে প্রশ্ন জাগিতেছে।

আজ অনন্ত কালের বক্ষে এক আশ্চয্য আবিষ্কার ঘটিয়াছে। এই চৈত্র তার জীবনে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এমন রমণীয়, এমন সুন্দর দিন জীবনে কম আসে। প্রকৃতি রক্তিম-সজ্জায় সজ্জিতা হইয়াছে। দিকে দিকে কাব যেন নিমন্ত্রণ-লিপি গিয়াছে। আকাশে বাতাসে কানাকানি। কমলাকে দেখিয়া সে আন্দাজ করিতে পারিত না, তার জন্ম এই চৈত্র। কিন্তু এখন তার মনে হইতেছে, কমলা, তার হৃদয়-লক্ষ্মী কমলা, জন্মিয়া দিনটিকে সুন্দর করিয়াছে। বৎসরের যে কোনদিন এইরূপ সুন্দর হইতে পারিত, সেই দিনের শোভা বাড়িত, তথাপি এই চৈত্র সর্ব্বাপেক্ষা শোভন দিন, সন্দেহ নাই।

কমলা কম খেয়ালী নহে। রমেনকে তিন তিনবার অপ্রস্তুত করার কি প্রয়োজন ছিল? ইহাকে অপ্রস্তুত করা ছাড়া আর কি বলা যায়? প্রতি বার সে নিজেও অনুভব করিয়াছে তার কান লাল হইয়া উঠিয়াছে। শেষের দিক্ হইতেই ঘটনাগুলি সন্ধান যাক না। কমলা বলিয়াছিল, রমেন তার বয়স জানে। কি করিয়া সে এই কথা বলিল? রমেন কি কমলাকে জন্মিতে দেখিয়াছে, না, কোন দিন তার বয়স লইয়া তার সঙ্গে আলোচনা করিয়াছে? অথচ সে স্বচ্ছন্দে বলিল, রমেন জানে! সে অবশ্য তৎক্ষণাৎ অস্বীকার করিয়াছে ও কটু কথা শুনাইতেও ছাড়ে নাই। কিন্তু কমলা ঐ কথা কেন বলিল, কি সে বুঝাইতে চাহিয়াছিল? কিছু বুঝাইতে চাহিয়াছিল কি? একজন তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। কমলা কি জানে না, তাব কথায় সেই ব্যক্তির মনে ছায়াপাত হইবে? রমেনের সঙ্গে তার হৃদ্যতার কথা এমন চটুল ভাবে না হয় নাই জানাইত। তাতে কোন পক্ষের ক্ষতি হইত না। অথবা, লুকান ইঙ্গিত কি রমেনের প্রতি করিয়াছিল? কমলার সম্বন্ধে রমেনের কৌতূহল এত যে, সে প্রতিবেশী হইয়াও কমলার বয়স জানে

না। প্রতিবেশী হইলেই কি সব কথা জানা যায়? আর কমলার প্রতি না কি তার গভীর অনুরাগ, তাই ত সে সামান্য বিষয়ে পর্য্যন্ত নিজেকে সংযত ও উদাসীন করিয়া রাখে। কমলাকে সে লক্ষ কথা বলিয়াছে, কমলাও তাকে লক্ষ কথা বলিয়াছে, শুধু রমেন নিজে কমলা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করে নাই।

তারপর রমেন ও নরেশের বয়স লইয়া কমলার আলোচনা! ছেলেমানুষি তাতে নিশ্চয় ছিল, তবু রমেনকে দুবার অপ্রস্তুত হইতে হইয়াছে। মুখ লইয়া এত আলোচনা করিবার কি প্রয়োজন ছিল? তার দিকে কমলার সেই দৃষ্টি মনে পড়ে। অমন ভাবে কমলা কেন তাকাইয়া ছিল? বারে বারে সেই দৃষ্টি ফিরিয়া আসিয়া তাকে আঘাত করিতেছে, চঞ্চল করিতেছে। কি যেন লুকান ছিল সে দৃষ্টিতে। কিছু কি ছিল? চোখের সে ভাষা বুঝা যেন কঠিন নয়, অথচ রমেন বুঝিতে পারিতেছে না। অনেক সময়, কঠিন অঙ্ক সহজে হইয়া যায়, কিন্তু সহজ অঙ্কে বেগ পাইতে হয়। এও যেন তাই। কমলার দৃষ্টির কথা ভাবিতে গিয়া রমেন বার বাব আপনাকে হারাইয়া ফেলে। তবু তার অর্থ পরিষ্কার হয় না। রমেন [illegible]নে তার অন্তরে ঐ দৃষ্টি-সুধা সঞ্চিত করিয়া রাখিবে। সে অধিকার তার শাশ্বত [illegible]ধিকার।

কি মূর্ত্তিতে কমলা প্রথম নরেশের সম্মুখে দেখা দি[illegible]! অপরূপ। এরূপ স্বল্প অথচ রুচিসম্মত সজ্জায় কোন মেয়ে অপরিচিত পু[illegible] মানুষের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারে, রমেন ধারণা করিতে পারে না। [illegible]বেশা সালঙ্কারা কমলাকে নরেশের সাম্‌নে আনিয়া উপস্থিত করিবে, ইহাই [illegible]মেনেব ইচ্ছা ছিল। কয়েক দিন ধরিয়া সে কমলাকে এ বিষয়ে পরাম[illegible] দিয়াছিল। তার পরামর্শ মত কাজ করিতে কমলা বাধ্য নয়। কিন্তু কমল[illegible] যে এ বেশে দেখা দিবে, তা রমেনকে পূর্ব্বাহ্নে একটুও জানায় নাই। কমলার এই নিরাড়ম্বরতা ও সজ্জাল্পতা রমেনকে লজ্জা দিয়াছিল, ইহা অ[illegible]কার করিবার উপায় নাই, যদিও শালীনতার দিক্ হইতে কমলার কো[illegible] ত্রুটি হয় নাই। বোধ হয়, প্রত্যেক সভ্য মানুষের মনে নারীর সজ্জা সম্বন্ধে [illegible]শেষ মোহ আছে।

দরিদ্র রমেনও উর্দ্ধে উঠিতে পারে না। কমলাকে সে সর্ব্বদা দেখে, অনেক সময় সে ফর্সা কাপড় পরিয়া আসে না, এমন কি, কখনও কখনও শুধু সেমিজ গায়ে আসিয়াছে। কিন্তু রমেনের কথা আলাদা। সে পর হইয়াও পর নহে। এতদিনকার পরিচয়ে তাদের দুজনের মধ্যে ব্যবধান কমিয়া গিয়াছে। নরেশের সম্বন্ধে ত সে কথা বলা চলে না। নরেশের কাছে কমলা রমণীয় বেশে উপস্থিত হইবে, রমেন কামনা করিয়াছিল। কমলা তার কল্পনা এক নিমেষে ধূলিসাৎ করিয়া দিল। কমলার চরিত্রে একগুঁয়েমি আছে। নরেশ কি ভাবিয়াছে যে, কমলা তার পরামর্শে এই রূপ করিয়াছে? যদি ভাবিয়া থাকে, তা হইলে তার সে ভুল ভাঙ্গিবার কোন উপায় নাই। এ সম্বন্ধে কোন আলোচনাও চলে না। রমেনের একথা বলিবার সুযোগ নাই, এ বিষয়ে তার হাত ছিল না। তারপর যার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল যে, গয়না, গাড়ী, বাড়ী আর শাড়ী হইল প্রত্যেক স্ত্রীলোকের পরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু, সে কমলার এই দৈন্য কি চোখে দেখিবে, তা অনুমান করা চলে। সে কখনই মনে করিবে না, কমলা ইচ্ছা করিয়া [illegible] সজ্জায় তার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, যদিও সাদাসিধা বেশে কমলাকে দেখিতে হইয়াছিল চমৎকার। কমলা প্রসাধন করিতে জানে। কমলাদের বাড়ীতে কমলার টেবিলের উপর প্রসাধনের বস্তু কম নয়। এসগুলির সদ্ব্যবহারের প্রমাণ যথেষ্ট। সাজসজ্জায় তার কোনদিন অরুচি নাই। কমলার বাবা প্রতি মাসে মেয়েকে নূতন শাড়ী কিনিয়া আনিয়া উপহার দেন। কমলা তাঁর বড় আদরের। বোধ হয়, সকলের চেয়ে আদরের, সে ইচ্ছা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তা পূরণ হইয়া যায়। তার দামী গহনা, একখানা নয়, অনেক। ইচ্ছা করিলে কমলা রাজকন্যার মত সাজিয়া উজ্জ্বল রূপে দেখা দিতে পারিত। কেন দেখা দিল না, সে জানে। দেখা দিল, গরীব গৃহস্থ ঘরের কন্যার বেশে। মাথায় যদি সিন্দুর থাকিত, তা হইলে বলা চলিত বধূর বেশে। নব বধূ নহে। কারণ, বিবাহের রাত্রিতে কমলা উজ্জ্বল বেশে, উজ্জ্বল রূপে, ত্রিভুবন আলোকিত করিবে। হয়ত সে

দিনের বেশী দেরী নাই। তবু—। তবু মনে হয়, কমলার মোহিনী-শক্তি তার সাধারণ সজ্জায় অসাধারণ ভাবে ফুটিয়াছিল। হাঁ, এই কথা প্রকাশের সে ভাষা পাইতেছিল না।

কমলা কি আশ্চর্য্য সুন্দর ভঙ্গীতে নমস্কার করিল! নরেশকে। লীলায়িত ভঙ্গী। তরঙ্গায়িত। কিন্তু তার আগে ছোট একটা কাণ্ড হইয়া গেল। ছোট, অর্থাৎ অল্প সময়ব্যাপী। এত অল্প সময়ব্যাপী যে বলা যায় চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতে। তার বেশী নয়, সে কি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে? না, পারে না। এমন হইতে পারে, সে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছিল, এবং বুঝিতে পারে নাই সময় কোথা দিয়া বহিয়া গিয়াছে। এমন হইতে পারে, চোখের পলক ফেলিতে যত সময় লাগে তার চেয়ে ঢের বেশী সময় ব্যাপিয়া কাণ্ডটি ঘটিয়াছিল। নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। জীবনে কোন কিছুর নিশ্চয়তা নাই। নিশ্চয় করিয়া যা বলা যায়, তা এই: নরেশ ও রমেন যখন ঘরে ঢুকিল, তখন কমলা ফিরিয়া দুজনকেই দেখিতে পাইল। কিন্তু কি আশ্চয্য! কমলা অপরিচিত নবাগতকে প্রথমে নমস্কার না করিয়া তার পূর্ণ দৃষ্টি রমেনের উপর রাখিল। তার ভাষাময় সেই প্রথম দৃষ্টি। সে ভাষা সমস্ত জীবন ধরিয়া চেষ্টা করিলেও পড়িয়া শেষ করা যায় না। সে দৃষ্টি অতল, কারণ তার গভীরতায় রমেন ডুবিয়া গিয়াছিল। কমলার পূর্ণ দৃষ্টি, রমেনের উপর পূর্ণ দৃষ্টি,—এই প্রথম নয়। কিন্তু এই দৃষ্টিতে, এই মধু দৃষ্টিতে, কমলা যা ভরিয়া দিয়াছিল, আগে তা কোন দিন দেয় নাই। আর কোন দিন তার দৃষ্টি অপরিচিত অথচ অদ্ভুত সুন্দর ভাষায় কথা কয় নাই। যে কমলা তাকে নিজমুখে বলিয়াছে, সাবধান করিয়া দিয়াছে, আমাকে পাইবার চেষ্টা করিও না, নিরাশ হইবে, তার চোখে, দুই চোখে, যে দুই চোখের জন্য মানুষ মরিতে পারে পর্য্যন্ত, এ কোন্ অকথিত বাণী? কেন এই বাণী? কোন একটি মুহূর্ত্ত কি এত দীর্ঘ হইতে পারে? এক মুহূর্ত্ত পরেই কমলার দৃষ্টি ও হাত নরেশের প্রতি ভব্যতার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতেছিল। মানব-জীবন

অসংখ্য, অনন্ত বলাও চলে, মুহূর্ত্তের সমষ্টি। সেখানে ছোট একটি মুহূর্ত্তের স্থান কতটুকু? জীবনের শত শত মুহূর্ত্তই বা কে লক্ষ্য করে? কিন্তু না, আছে, আছে, ইহারই মধ্যে এক একটি মুহূর্ত্ত আছে, এক একটি মুহূর্ত্ত আসে, অনন্ত কাল যার নাগাল পায় না, বিশাল পৃথিবী যাকে বেষ্টন করিতে পারে না। সেই একটি মুহূর্ত্ত, বা মুহূর্ত্তের অংশ, কালাতীত, বিশ্বাতীত। ৫ই চৈত্র, সুন্দর ৫ই চৈত্র! ধন্য ৫ই চৈত্র, ধন্য ৫ই চৈত্রের সেই অপূর্ব্ব অনন্ত মুহূর্ত্ত! ধন্য কে? ধন্য কেন? কেহ যদি ধন্য হয়, তা হইলে সে রমেন। ধন্য সে যে এই মুহূর্ত্তের জন্য বাঁচিয়া ছিল। একটি মুহূর্ত্ত যে মানুষকে এমন অপরিসীম আনন্দ দেয়, জীবনকে সার্থকতায় ভরিয়া তোলে, এর আগে কল্পনাও করিতে পারিত না।

অপরাধ হইয়া গেছে। মুহূর্ত্ত লইয়া কি বাড়াবাড়ি হইয়া গেল। সকল মুহূর্ত্ত, সকল মনোযোগ এখন নরেশের প্রাপ্য। নরেশ হয়ত লক্ষ্য করিয়াছে, হয়ত করে নাই। এ অপরাধের স্খালন হওয়া উচিত। যদি নরেশ লক্ষ্য করিয়া থাকে, তা হইলে কমলার উচিত তাকে ভুলান, যেমন করিয়া হোক ভুলান।

কিন্তু অপরাধ না করিবার, বা না বাড়াইবার, মেয়ে কি কমলা? প্রথম দৃষ্টি আসিয়াছিল বিদ্যুতের মত। চকিত। অপসারিত হইয়াছিল বিদ্যুৎ গতিতে। যদি কেহ লক্ষ্য করে, তা হইলেও মনে হইবার সম্ভাবনা, 'হয়ত ভুল দেখিয়াছি', কিংবা 'কি দেখিতে কি দেখিয়াছি।' কিন্তু যে দৃষ্টি বিদ্যুতের মত ঝলসিয়া নিবিয়া না যায়! তখন অপরাধের স্খালন কিরূপে হইবে? হাঁ, মনে পড়ে। রমেনের ভুল হইয়াছে। কমলা রমেনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'আপনার বয়স কত হবে?' তখন তার উচিত হয় নাই বলা, 'তুমি আন্দাজ কর'। কেন বলিয়াছিল, সে নিজেও জানে না। কিন্তু তা হইতে যত বিপত্তির সৃষ্টি হইয়াছে। সে কেমন করিয়া বুঝিবে, এই কথা শুনিয়া কমলা তার মুখের দিকে ঐভাবে চাহিয়া থাকিবে? কমলা রমেনকে নূতন দেখিতেছে, তা ত নয়। তিন বৎসরের চেনা মুখ। নূতন করিয়া পড়িবার দরকার কেন হয়? নূতন যে মুখ দেখিয়াছে, তা

নরেশের। কমলা তার চোখের আলো নরেশের মুখের উপর ফেলিলে তার অর্থ বুঝা যাইত। এখন কমলার দৃষ্টির ব্যক্ত উদ্দেশ্য বুঝা সহজ, কিন্তু উহার পিছনে একটা অব্যক্ত কিছু ছিল। তা নিশ্চয় নরেশের চোখ এড়ায় নাই। ছিঃ, তার দৃষ্টি দিয়া কমলার উচিত হয় নাই রমেনকে বার বার জব্দ করা। কমলা তার বয়স সম্বন্ধে অম্লানবদনে বলিয়াছিল 'আমার বয়স রমেন বাবু জানেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন।' এ ছেলেমানুষি না দুষ্টামি? কোনটাই সমর্থনযোগ্য নয়। রমেনের মন বিহ্বল হইয়া যায়। নিজেকে প্রশ্ন করে, কেন কমলা এমন করিয়া তাকায়?

তবু কমলাকে তিরস্কার করিবার মত কিছু নাই। তার ব্যবহার সহজ ও সরল। নরেশকে সহজভাবে গ্রহণ করিয়াছে, পরিচিত বন্ধুর মত কথা বলিয়াছে। এর চেয়ে বেশী আর কি করিতে পারিত? রমেন নিজেও আশা করিতে পারে নাই, কমলা এত সহজ হইবে। ইহাতে তার কমলার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। সে আনন্দিতও বটে। সে বার বার অপ্রস্তুত হইয়াছে। তার জন্য কমলাকে [illegible]ভাবে দায়ী করা যায় কি? হয়ত যায় না। কমলা নিজের বা পরের কথার স্রোতকে কোথাও বাধা দেয় নাই। রমেনের অপরাধী মন। তাই তার বিচার-প্রণালী স্বাভাবিক নয়,—অত্যন্ত স্বাভাবিক হইতে গিয়া স্বাভাবিক হইতে পারে নাই। তার অন্তরের কামনা এই ছিল, নরেশ কমলাকে স্ব রূপে, অন্যের প্রভাব-মুক্ত রূপে, দেখুক। অন্য বলিতে সে প্রধানত নিজেকেই ধরিয়াছিল। নরেশের মনের আয়নায় কমলার ঠিক কি ছবি ধরা পড়িয়াছে, তা সে জানে না। সে কমলাকে ভালবাসে, তাতে কি? তার ভালবাসা গোপন ভালবাসা। সে নিরন্তর কমলার মঙ্গল কামনা করে। কমলা সুখী হোক, সুখী হোক। তার চেয়ে কাম্য আর কি হইতে পারে? রমেনের ভালবাসা, অসীম ভালবাসা, মনের মধ্যে মরিয়া যাক, কিন্তু কমলা সুখী হোক। নরেশের সহিত বিবাহিত হইয়া সুখী হোক।

কমলার সেই দৃষ্টি! তা কি ভুলিতে পারা যায়? কেমন করিয়া ভুলা যায়? রমেন নিজেকে শতবার, সহস্রবার জিজ্ঞাসা করিল, এ দৃষ্টি লইয়া আমি কি করিব? নিজেকে ধিক্কারও দিল। তার বিড়ম্বিত, অভিশপ্ত জীবন সে কি শুধু এই দৃষ্টি সম্বল করিয়াই কাটাইয়া দিবে? না, না, না,—তার মন কাঁদিয়া উঠে। কিন্তু তার মনের কান্না কে শুনিবে? চোখের সামনে রূঢ় বাস্তব জাগিয়া উঠে। কঠোর বাস্তব। জীবন-সংগ্রামে পরাজিত রমেন নিজেকে শাসন করে। জগতে সুখী হইবার অধিকার তার নাই। তাই বলিয়া অন্যের পথ কেন রোধ করিবে? অন্যকে সুখের অধিকার হইতে কেন বঞ্চিত করিবে? যেন সে কাহাকেও, পৃথিবীর সামান্যতম মানুষকেও, সুখ হইতে বঞ্চিত করিতে পারে? হায় দুরাশা! হায় আত্মাভিমান! রমেনকে এই সকল চিন্তা হইতে রক্ষা কর ভগবান্। তার শক্তি সামান্য। সেই সামান্য শক্তিতে যতটুকু কুলায় তাই দিয়া সে তার পরম ভালবাসার ধন কমলাকে সাহায্য করিবে। কিন্তু কমলার অথবা নরেশের সুখের কথা ভাবিতে গিয়া তার চোখ জলে ভরিয়া যায় কেন? দুর্দ্দৈব!

কেন কমলার খেয়াল হইয়াছিল রমেনের বাড়ীতে নরেশের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, সেই জানে। অথবা সেও জানে না। কিন্তু রমেনকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। বাপ কিছু বলেন নাই। মা অসন্তুষ্ট চিত্তে রাজী হইয়াছিলেন। তাঁর নিজের ঘরে অনূঢ়া কন্যারা রহিয়াছে। কই, সে দিকে ত ভাইয়ের খেয়াল নাই। বড় ভাই! নরেশের মত যোগ্য পাত্র যদি একজনের জন্য ধরিয়া আনিতে পারে, তা হইলে তার চেয়ে সুখের কথা আর কি হইতে পারে? কিন্তু তা না করিয়া সে নরেশ-কমলার সাক্ষাৎকার ঘটাইতেছে। নির্ব্বোধ আর কাহাকে বলে? কমলা তাদের কে যে কমলার জন্য রমেনের এত মাথাব্যথা? তাঁর একবার ইচ্ছা হইয়াছিল, পরিষ্কার বলিয়া দেন, বাপু, ওসব হাঙ্গামে কাজ নাই। হাজার

হোক, তিনি ছেলের মা, ছেলের মন ও মান রাখিবার জন্য তিনি শেষ পর্যান্ত রমেনকে বাধা দেন নাই, উপরন্তু তাদের জন্য জলখাবার করিযাছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে নরেশের সাম্‌নে বাহির হন নাই। রমেনের অনেক অনুরোধেও না। তিনি জানিতেন, নরেশ রমেনের বন্ধু। তাঁর আরও ধারণা হইয়াছিল, রমেন কমলার কতকটা অনুরাগী। তাঁরা সেকেলে লোক, নিজ প্রিয় জিনিষকে কি করিয়া অন্যের সাম্‌নে তুলিয়া দেওয়া যায়, তা তাঁরা বুঝেন না। বোনেরা ত ত্রিসীমানার ধার দিয়া আসে নাই। তারা পোড়ারমুখী কমলার এই সব নাট্‌কেপণার জন্য নিজ বাড়ী অপবিত্র করিতে ঘোর বিরোধিতা করিয়াছিল। সেইক্ষণ হইতে তাদের মধ্যে কমলার পোড়ারমুখী নাম সুপ্রচলিত হইয়া গেল। তাদের বিরোধিতা যখন টিকিল না, তখন তারা পূরাপূরি অসহযোগ করিল। মাকে একা সমস্ত তদ্বির করিতে হইল। এই সংবাদ যেদিন হইতে রণেন পাইয়াছে, সেদিন হইতে কমলার সঙ্গে সে ভাল করিয়া কথা বলে না। দাদাকে সে কিছু বলে না, কিন্তু তার ভাবটা অত্যন্ত [illegible]ষ্ট। সে সুখী নয়। আর আজ ত সকাল হইতে তাকে দেখা যায় নাই, সে বাড়ী ছিল না। বেচারা রণেন! দাদার সম্বন্ধে ও নিজের অনাগত বৌদির সম্বন্ধে কত কি হয়ত ভাবিয়া রাখিয়াছে। তার মনে আঘাত লাগা স্বাভাবিক।

এ বাড়ীর এইত অবস্থা, ও বাড়ীর কথা রমেন জানে না। হয়ত কমলা কাহাকেও কিছু জানায় নাই। হয়ত প্রথমে কাহাকেও [illegible] জানাইতে চায় না বলিয়া রমেনের বাড়ীতে নরেশের সহিত সাক্ষাৎ[illegible]রের বন্দোবস্ত করিয়াছে। কমলা জানে না, নরেশের আগমন রমেনের বাড়ীতে কি বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছে।

কত পরিশ্রম করিয়া রমেন ঘর সাজাইয়াছে। কমলাও সাহায্য করিয়াছে। হাঁ, সেইজন্য তার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। কিন্তু ধনীর দুলাল নরেশ তার মর্য্যাদা কি কিছুমাত্র বুঝিয়াছে? হয়ত তার মোটর

চালকের ঘরও এর চেয়ে ভাল। ভাগ্যে কমলা ঘরের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল। দারিদ্র্য অপরাধ না হইলেও যে অপরাধ, সে কথা রমেনের চেয়ে বেশী কে জানে? নিজেদের দীন-গৃহে ধনি-পুত্র নরেশকে আনিতে রমেনের দ্বিধা ও সঙ্কোচের অন্ত ছিল না। সে নিজের মনে শততম বার বলিল, 'আমার বাড়ীতে নরেশের সঙ্গে দেখা করবার জন্য কমলার জেদ কেন?' কিন্তু সেও নরেশের বিহ্বল ভাব লক্ষ্য করিল; এবং ভাবিল, নরেশ তার গরীব-খানায় ঢুকিতে ইতস্তত করিতেছে। অথচ সে ও কমলা কত পরিপাটি করিয়াই না ঘর সাজাইয়াছে! তার জন্যই সাজাইয়াছে। রমেন একটু রূঢ় ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি?' অর্থাৎ, তুমি কেন ইতস্তত করিতেছ? উত্তরে নরেশ এক অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য কথা বলিল। রমেনদের বাড়ীটাকে তার দানব বলিয়া ভ্রম হইতেছিল, যেন গিলিয়া খাইবে। শোন কথা! বাড়ী কখনও দানব হয়? তাদের বাড়ী কুশ্রী, তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কোন্ ভাড়াটে বাড়ীই বা ভাল? এর চেয়েও কুশ্রী ঢের বাড়ী শহরে আছে। কিন্তু তা[illegible]লিয়া কোন বাড়ী সম্বন্ধে ঐরূপ আজগুবি কল্পনা কেহ করে না। হয়ত [illegible]শ্রী প্রকাণ্ড অট্টালিকায় বাস করিতে অভ্যস্ত নরেশ এই বাড়ীতে ঢুকিতে লজ্জা বোধ করিতেছিল। কিংবা আর কিছু। বলা বাহুল্য, এ উত্তরে রমেন খুসী হয় নাই। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া একবার ভাবিয়া লইল, কি করিবে, কি বলিবে। নরেশ অতিথি। মান্য অতিথি। তার প্রতি কোন প্রকার ইঙ্গিত করা রমেনের পক্ষে শোভন হইবে না। ভালই হইয়াছে যে, এ ঘটনা বাহিরে ঘটিয়াছে। নরেশের সাবধান হওয়া উচিত। কমলার কাছে সে নরেশের যে পরিচয় দিয়াছে, তা উজ্জ্বল। নরেশ তার দারিদ্র্যের প্রতি কটাক্ষ করিল, ইহাতে তার অভিমানে ঘা লাগিল। বাধ্য হইয়া তাকে তা সহ্য করিতে হইল। কিন্তু তাতে কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরিয়া উঠিল না। নরেশ সহাস্য মুখে দোতলায় রমেনের ঘরে উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু রমেনের ভ্রূ কুঞ্চিতই রহিল। রমেনের ঘরে আসিয়া কমলাকে

অপরূপ ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া নরেশ যত আশ্চর্য হইল রমেন তদপেক্ষা বেশী আশ্চর্য হইল। রমেনের কুঞ্চিত ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হইল। বিরক্তি ও বিস্ময়ে। কমলা জেদ করিয়া বলিয়াছিল, রমেনের ঘরে ছাড়া সে নরেশের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিবে না। কিন্তু কথা ছিল, সংবাদ দিলে পর কমলা আসিবে। কমলা ত সংবাদের জন্য অপেক্ষা করিল না। নরেশের আগমন-সংবাদ সে জানিল কিরূপে? সে সর্ব্বক্ষণ সকল কাজের মধ্যে রাস্তার দিকে কান পাতিয়া ছিল কি? তার এই আগ্রহের কারণ কি? সে নিজমুখে বলিয়াছিল, নরেশ সম্বন্ধে তার আগ্রহ নাই। এমন কি, নরেশের সহিত দেখা করিতে পর্য্যন্ত সে অস্বীকৃত ছিল। সে সব কি সত্য নয়? তার পর, নরেশের সামনে এ কোন বেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে কমলা! নরেশের মত ধনী তারা নয়, কিন্তু কমলারা গরীবও ত নয়। তার শাড়ী বা গয়নার অভাব নাই। কিন্তু তাকে দেখিয়া আজ কে বলিবে, সে গরীবের মেয়ে নয়?

চিন্তার ধারা আবার পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিল। বার বার এমন হইতে লাগিল। আজ সকালে এক ঘণ্টা মাত্র। এক দিনও নয়। মনে হয়, উহার বিশেষ একটি মুহূর্ত্ত যত দীর্ঘ বলিয়া মনে হোক না, উহা নিমেষে অতিবাহিত হইয়াছে। কিন্তু বলিলে কি হয়? অনন্ত কালে, এই একটি ঘণ্টা অক্ষয় ও অমর হইয়া রহিয়াছে। ইহার পূর্ণ ফল এখনও ফলে নাই। হয়ত ইহার জন্য তার আরও অভিশাপ বাকী আছে। কিংবা হয়ত ইহার গহ্বরে বিরাট সম্ভাবনা লুকাইয়া রহিয়াছে। আর এই ঘণ্টাটিও কাটিয়াছে সুখে দুঃখে, শুধু সুখে নয়। বেদনা পাইবার কারণ একাধিক বার হইয়াছে। বুকের মধ্যে কাঁটা বিঁধিয়াছে। তথাপি, ইহাও সত্য, সে অনেক দাম দিয়া এই ঘণ্টা কিনিয়াছে; তার পরিবর্ত্তে যা পাইবে তা খুব বড় কিছু বলিয়া মনে করে। হাঁ, অনেক দাম দিয়াছে বৈ কি। দিতেও অনেক বাকী আছে হয়ত। শুধু কমলার জন্য। পৃথিবীতে আর কারও জন্য সে এই দীনতা ও গ্লানি সহ্য

করিত না। কমলার জন্য কতখানি সে সহ্য করিয়াছে, কমলা কি তা কোন দিন বুঝিবে না?

সেই একটি ঘণ্টা! তার জন্য দাম দিতে আরও যে বাকী ছিল, তা অফিস্ হইতে ফিরিয়া বাড়ীতে পদার্পণ করা মাত্র বুঝিল। বাড়ী যে তোলপাড় হইয়া গিয়াছে তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ পাইল। রমেন কারও অধিকার একটু সঙ্কুচিত করে না, করিতে চায় না, যে যা খুসী করে; বরং নিজেকে বঞ্চিত করিয়াও সে পরকে খুসী করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু অন্যেরা নিজ নিজ অধিকার ত ছাড়েই না, উপরন্তু বিনা প্রয়োজনে তার অধিকার খর্ব্ব করে, তার সম্বন্ধে অনধিকার চর্চ্চা করে। এ বিষয়ে পূর্ব্বে যে সে কখনও প্রতিবাদ করে নাই, তা নয়। কিন্তু প্রতিবাদ নিষ্ফল হইয়াছে। তাই এখন তা মানিয়া লইয়াছে।

রমেন বাড়ী আসিয়া কাপড় ছাড়িতে না ছাড়িতে দুই বোন্ ঘরে ঢুকিল। বড় বোন্ বেলা বলিল, 'আচ্ছা, আমাদের এমন করে অপমান করবার কি দরকার ছিল?'

রমেন চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কে অপমান করল?'

'কেন, তুমি।'

'আমি!'

রণেন তখন-ঘরে ছিল। তার গায়ে বড় জ্বালা। কমলার আজিকার আচরণে সে জ্বলিতেছে। আবার বোনেদের আচরণ সে সহ্য করিতে পারে না। সে বলিয়া বসিল, 'কেউ তোমাদের অপমান করতে পারে?'

বেলা ধমক দিয়া বলিল, 'তুই থাম্।'

শীলা নালিশ করিল, 'দাদা, তোমার লক্ষ্মণ ভাইকে থামাও।'

রণেন দাঁত বাহির করিয়া বলিল, 'ফের্ তুই লক্ষ্মণ বলিস্ আমাকে?'

'বল্‌বই ত। কি করবে তুমি? মারবে? মার না!'

'দরকার হলে মারবই ত। কিন্তু খবরদার—'

রমেন বিরক্ত হইয়া ধমক দিল, 'কি তোরা করছিস্ ? রণেন, থাম্। কি তুই বল্‌তে চাস্, বেলা ?'

রণেন বলিল, 'আমি বলি, তাহলে বুঝ্‌বে, কে কাকে অপমান করেছে।' এই বলিয়া ঘটনা বর্ণনা করিল।

কিছুক্ষণ আগে, বোধ হয় আধ ঘণ্টা হয় নাই, কমলা এ বাড়ীতে গল্প করিতে আসিয়াছিল। এ বাড়ীর কেহই তার উপর প্রসন্ন নয়। তবু যে কমলা কেন আসে, তা সেই জানে। রণেন দু একটা চোখা চোখা শব্দ কমলার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়া হৃদয়ের জ্বালা কথঞ্চিৎ নিবাইল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে জাগিয়া উঠিল কমলার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ও করুণা। আহা বেচারী! আজই ত রণেন জানিতে পারিয়াছে, তার কোন দোষ নাই, তার দাদা রমেনের জেদেই কাণ্ডটি ঘটিয়াছে। মানুষের সম্বন্ধে ভুল করা কত সহজ। কমলার মত মানুষের সম্বন্ধেও।

কমলা যখন এ বাড়ী আসে, তখন বড় একটা কেহ তার সঙ্গে কথা কহিতে অগ্রসর হয় নাই। অগত্যা সে রমেনের ঘরে আসিল। সে ঘরে তখন রণেন একা বসিয়া আছে। তাকে দেখিয়া কমলা হাসিয়া ফেলিল। 'এই যে রণেন বাবু—।' কমলা তাকে চিরকাল রণেন বাবু বলিয়া ডাকে। আজ সকালে তাকে দেখিতে পায় নাই বলিয়া অনুযোগ করিল। রণেনের মনে পড়িয়া গেল, আর কাহারও অনুপস্থিতি সম্বন্ধে সে অনুযোগ করিল না। তার না থাকাটাই যেন অপ্রত্যাশিত। আর সকলের না থাকাটা নয়। রণেন মনে মনে ভাবিল, তার না থাকাটা যে ইচ্ছাকৃত এবং তার কারণ আছে, কমলা কি তা বুঝিতে পারে নাই? কমলা দিব্য হাসিয়া অন্যের সহিত গল্প করিবে, আর তা তার দাদার ঘরে, ইহা রণেনের পক্ষে অসহ্য। দাদার পক্ষপাতিত্ব করে বলিয়া বোনেরা তাকে ঠাট্টা করিয়া বলে, লক্ষ্মণ ভাই। বলুক, তাতে তার কিছু যায় আসে না। এ কথা সে একশবার বলিবে, সকল লোকের সামনে চেঁচাইয়া বলিবে, তার দাদার মনের মত অত বড় মন খুব কম

লোকের দেখা যায়। বোনেরা যদি দাদার মত হইত, সংসার সোনার সংসার হইত।

রণেনের সহিত গল্প জমাইয়া তুলিতে কমলার কতক্ষণ লাগে? ততক্ষণে রণেনের মন হইতে রাগ ও অভিমান দূর হইয়া গিয়াছে। তারা সহজভাবে হাসিয়া হাসিয়া গল্প করিতেছে। এমন কি, রণেন কমলাকে এ কথা পর্যান্ত জিজ্ঞাসা করিতে পারিয়াছে, 'দাদার বন্ধুকে কেমন লাগ্‌ল?'

'কে? নরেশ বাবু?'

'হাঁ।'

'যদি বলি খুব ভাল—।' তারপরই অদ্ভুত হাসি।

রণেন এই হাসিতে বিস্মিত হয়। বুঝিতে পারে না, কমলা কেন হাসে। এ হাসি তার পরিচিত হাসি নয়। তবু বলে, 'বিশ্বাস করব।'

'কেন?'

'কারণ, তাঁকে ভাল লাগাই স্বাভাবিক। ভাল লাগার মত অনেক জিনিষ তাঁর মধ্যে আছে।'

'বটে?'

'নিশ্চয়।'

'হতে পারে। কিন্তু এই আমার প্রথম পরিচয়। তাঁর গুণের কথা কিছু জানি না।'

'শোন নি?'

'কার কাছে?'

'আবার কার কাছে? বন্ধুর গুণগানে যিনি মুখর।' রণেন হাসিল।

'তোমার দাদার কাছে?'

'হাঁ।'

'সে ত অনেক শুনেছি। শুনে কান ঝালাপালা হয়েছে। কিন্তু শোনা কথা সব সময়ে বিশ্বাস করা যায় কি?'

'দাদাকে তা হলে বিশ্বাস কর না ?'

রহস্যচ্ছলে কথাবার্ত্তা হইতেছে। দোষের কিছু ছিল না। তথাপি কমলা গম্ভীর হইয়া গেল। একটু চুপ করিয়া থাকিবার পর বলিল, 'করি গো, খুব করি। বোধ হয়, এত বিশ্বাস নিজেকেও করি না।'

রণেন চমৎকৃত। সে স্বপ্নেও ভাবে নাই, কমলা এভাবে মনের কথা বলিবে। তার ভারী ভাল লাগিল, ভারী। অন্তত পরের বাড়ীর এই মেয়েটি তার দাদাকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করে, ইহাতে সে আরাম ও কৃতজ্ঞতা বোধ করিল। হয়ত কমলা না ভাবিয়া কথাটা বলিয়াছে। তবু ভাল লাগে। কমলা বানাইয়া বলে নাই, তা তার চোখের দিকে তাকাইলে বুঝা যায়। কমলা রমেনকে এত ভাল করিয়া জানিয়া ফেলিয়াছে! কি করিয়া জানিল ?

রণেন কমলার দিকে তাকাইল, 'তাহলে ?' অর্থাৎ, নিজের কথায় নিজেই তুমি জব্দ। দাদাকে তুমি বিশ্বাস কর বলিলে। অথচ, একটু আগে দাদার কথা বিশ্বাস করিলে না। এই বিরোধিতার সদর্থ কর।

কমলা বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিল, 'তাহলে কি ?'

'আঃ, কিছুই যেন বুঝ্‌তে পার না। একবার বলছ, বিশ্বাস কর, আবার বলছ, না। দুরকম কথা। কোন্‌টা সত্য ?'

'আমি কখনও দুরকম কথা বলি না।'

'বাঃ, এই ত বল্লে।'

'না।'

'না কি ? বলনি, দাদাকে খুব বিশ্বাস কর ?'

'বলেছি। আরও অনেক বার বল্‌তে পারি।'

'দরকার নাই। একবারই যথেষ্ট। আর আগে বলনি, তাঁকে বিশ্বাস কর না ?'

'হবে।'

'হবে কি রকম ?'

কমলা হাসিমুখে রণেনকে শাসন করিল, 'আজকালকার ছেলেরা লেখাপড়া শিখে আকাট মুখ্খু হচ্ছে। তুমি বি. এ. পাশ করেছ, না, কর নি ?'

রণেনের মুখ লাল হইয়া গেল। কৌতুকও অনুভব করিল। জবাব দিল, 'তুমি জান।'

'মনে কর, আমি জানি না। তুমি নিজে বলতে পার না ?'

'না।'

'কেন ?

'নিজের গুণের কথা নিজ মুখে কি করে বলি ?'

'ওঃ। আমি মাথা খুঁড়ে মরব ভাব্ছ না কি ?'

'তা কেন ?'

'তবে বল্তে আপত্তি কি ?'

'কিছু না।

'তবে বল।'

'লোকে বলে বি. এ. পাশ করেছি।'

'লোকে বলে! কেন, নিজে জান না ?'

'নিজের জানাটা ঠিক নাও হতে পারে।'

'লোকের বলাটাও ঠিক না হতে পারে।'

'তা পারে। তবু নিজের চাইতে লোককে বিশ্বাস করা ভাল।'

'এ কথা যেন চিরদিন মনে থাকে।'

'থাক্‌বে।

'কিন্তু তুমি কি করে যে পাশ করলে বুঝ্তে পারি না। আমি তোমার পরীক্ষক থাক্‌লে তুমি কত নম্বর পেতে জান ?'

'কত ?'

'গোল্লা।'

'তারপর রসগোল্লা ত ?'

'ঈস্।'

'আমার ভাগ্য ভাল, তুমি পরীক্ষক ছিলে না—'

'এবং কোন দিন হব না—'

'এবং আমি বরাবর পাশ করেছি—'

'এবং করবে। তা কর। মনের সুখে কর। আমার তাতে আপত্তি নাই।'

'আমার বি. এ. পাশের সঙ্গে আমার সামান্য একটা কথার কি. সম্পর্ক, তা ত বুঝ্তে পারি না।'

'মাথায় যাদের গোবর ভরা তারা ত পারবেই না।'

'মাথায় যাদের ঘি ছাড়া আর কিছু নাই, তারাই না হয় বুঝিয়ে দিক।'

'তাই ত দেবে।'

'তাহলে দেবী প্রসীদ। বাপ্‌রে বাপ্, একটা ছোট কথার জন্য কত ঘোরাচ্ছ।'

'কথা বল্‌তে আমার ভাল লাগে।'

'আমারও—'

'তোমার কি?'

'শুন্‌তে ভাল লাগে।'

'কিন্তু সকলকে শোনাতে আমার ভাল না-ও লাগ্‌তে পারে।'

'আশা করি, সে সকলের মধ্যে আমি নাই।'

'ঈস্, অহংকার দেখ না।'

'অহংকারের কি হল? সত্য কথাটা কি, শুনি।'

'তাহলে অহংকার আরও বাড়্‌বে।'

'বাড়ুক। তবু শুন্‌ব।'

'তবে শোন। তোমার সঙ্গে কথা বল্‌তে আমার খু-ব ভাল লাগে।'

'খুসী হলাম। কৃতার্থ হলাম। কিন্তু আর কাউকে শোনাতে কি ভাল লাগে না?'

'এই বিপুল পৃথিবীতে এত পরিচিত লোক আছে যে, গণে শেষ করা যায় না। চট্ করে না ভেবে চিন্তে কি করে বলি, কাকে কাকে আমার নিজের কথা শোনাতে ভাল লাগে?'

'আচ্ছা, ভেবে বল।'

'আমাকে তাহলে দু তিন দিন সময় দাও। আসমুদ্র হিমাচল সকলকে মনে করি। মনে মনে সাম্‌নে দাঁড় করিয়ে রেখে কথা বলে দেখি। তারপর তোমায় বল্‌ব। সে অনেক ধৈর্য্য ও পরিশ্রমের কাজ।'

'উঃ, কি মেয়ে! না, তোমার সঙ্গে কথা বলে সুখ নাই।'

'এই যে একটু আগে স্বীকার কর্‌লে—'

'না, করি নি। বলেছি, তোমার কথা শুন্‌তে ভাল লাগে।'

'ও। কথা বলে সুখ নাই?'

'হাঁ।'

'কারণ তোমার মনের কথাটা আমি ঠিক ধরেছি।'

'কি কথা?'

'তুমি জান।'

'তোমার মুখে শুনি একবার।'

'আমি কেন বল্‌তে যাব?'

'আচ্ছা, আমি বলি,—দাদাকে, আমার দাদাকে, তোমার কথা শোনাতে ভাল লাগে, নয়?'

'মশায়ের মনে যে এই বাণী এসেছে, আমি তা আগে টের পেয়েছি।'

'মহাশয়া অন্তর্য্যামিনী। সেজন্য তাকে ধন্যবাদ। এখন অনুগ্রহ করে সত্য জবাব দেওয়া হোক।'

'আমার কাছ থেকে কেউ কখনও মিথ্যা জবাব পেয়েছে কি না, তা আমি মশায়ের কাছ থেকে জান্‌তে চাই।'

'মহাশয়ার কাছে আমি ক্ষমা ভিক্ষা কর্‌ছি। এও স্বীকার কর্‌ছি, মহাশয়াকে আমার ঐ রকম কথা বলা উচিত হয় নি।'

'মশায়কে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করা যাচ্ছে এবং সাবধান করে দেওয়া যাচ্ছে যে ভবিষ্যতে এ রকম ভুলত্রুটি না হলে মশায়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বন্ধ থাক্‌বে।'

'শাস্তির ভয়ে মশায় সর্ব্বদা অপরাধ কর্‌তে প্রস্তুত রইল।'

কমলা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। রণেন বিষম অনভিজ্ঞের অভিনয় করিয়া বলিল, 'কি হল? অ্যা, কি হল?'

কমলার হাসি তখনও থামে নাই, 'দেখ, আমি যে দেশে রাণী, সেখানে সব উল্টা। অন্য জায়গায় তোমরা অপরাধ কর্‌লে শাস্তি পাও, আর আমার রাজ্যে শাস্তির ভয়ে অপরাধ কর্‌বে বলে স্বীকার কর্‌লে।'

'তুমি যে কোন দেশের রাণী তা ত জান্‌তাম না। সে কোন্ দেশ?'

কমলা নিজের হৃদয়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

'তা ঘৃত-মস্তিষ্কার দেশে এমন হয়েই থাকে। কিন্তু আমার কথা আমি ভুলি নি।'

'আমিও না।'

'তাহলে জবাব দাও।'

'জবাব দিলে, সত্য বল্‌ব। কিন্তু জবাব কি চা-ই?'

'বাঃ, এতক্ষণ আমি জবাবের প্রত্যাশায় মুখের দিয়ে চেয়ে বসে রইলাম—'

'অত মুখের দিকে চেয়ে বসে থেক না।'

'কেন?'

'দেখ্‌লে কেউ হয়ত রাগ কর্‌বে?'

'কেন?'

'ছেলেমানুষের মত সবেতেই কেন, কেন? মেয়েদের দিকে চেয়ে থাক্‌লে লোকে রাগ কর্‌তে পারে না? আচ্ছা জ্বালা ত।'

রণেন একটুখানি লাল হইয়া গেল, 'আমি কি তোমার দিকে তেমনভাবে চেয়ে থাকি ?'

'তুমি কি ভাবে চাও, তুমি জান। তোমার মন ত কেউ দেখ্ছে না, তোমায় দেখ্ছে। দেখে রাগ করতে পারে, সন্দেহ করতে পারে। তুমি কি করবে ?'

রণেন আঘাত পাইল। অপ্রত্যাশিত। কমলা সত্য সত্য মনের কথা বলিতেছে না ঠাট্টা করিতেছে, বুঝিতে পারিল না। সে জানে, তার মন অত্যন্ত পরিষ্কার। কমলাও কি জানে না? যাকে দাদার স্ত্রীরূপে অন্য সকলের চেয়ে বহু ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছে, যার সম্মান-রক্ষার জন্য সে ঘরের লোকেদের কাছে লাঞ্ছনা পর্যন্ত ভোগ করে, সে কি সত্যই তাকে এত ছোট করিয়া দেখে? অথচ, কমলার যদি তার সম্বন্ধে এই প্রকার ধারণা হয়, তা হইলে সে বয়সে ছোট হইয়াও রণেনের প্রতি ছোট ভাইয়ের মত সস্নেহ ব্যবহার করে কেন? ইহা রণেনের বুদ্ধির অগম্য। তার ইচ্ছা করিল, সে কমলার হাতখানি জড়াইয়া ধরিয়া মিনতিমাখা স্বরে বলে, কমলা যেন তাকে ভুল না করে। অন্যেরা ভুল করুক, সহিতে পারিবে। কিন্তু কমলা ভুল করিলে, তার সান্ত্বনার স্থান থাকিবে না। কিন্তু কমলাকে কিছু বলিতে পারিল না, পাছে কমলা ঠাট্টা করিয়া থাকে, এই ভয়ে। তার মনে ক্ষীণ আশা ছিল, কমলা তাকে ঠাট্টা করিতেছে। সুতরাং তা না বুঝিয়া কিছু করিতে গেলে সে নাকালের একশেষ হইবে।

সেইজন্য সে কথার জের টানিল, 'কি সন্দেহ ?'

'যে তুমি আমায় ভালবাস।'

'কে করবে সন্দেহ ?'

'কেন, লোকের কি অভাব আছে ?'

'তবু, নাম শুনি।'

'নাম শুনে তার সঙ্গে লড়াই করতে চলে যাবে না কি ?'

'দরকার হলে যাব।'

'ধর যেন তার নাম শ্যামাকান্ত তরফ্‌দার।' নিজেকে চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া কমলা হাসিয়া ফেলিল। এতক্ষণে রণেন আরামের নিঃশ্বাস ফেলিল। আঃ!

রণেন বলিল, তখনও তার মুখের মেঘ কাটে নাই, 'তুমি কি ভয়ানক দুষ্টু! অথচ তোমাকে শান্ত শিষ্ট লক্ষ্মী মেয়ে বলে জান্‌তাম।'

'এখন বুঝ্‌লে, বাইরে থেকে দেখে কাউকে চেনা যায় না।' এই বাক্যটি রমেনদের বাড়ীতে প্রায়ই তার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়। কমলা কি সে-কথা জানে? 'তোমার দাদাকে আজকের গল্প বলে সাবধান করে দিও।'

'তুমি দিও।'

'আমার দায় পড়েছে! তোমার ভাই, তুমি সাবধান করে দেবে। না দিলে কার কি? নিজেরাই ভুগ্‌বে।'

'কিই বা ভুগ্‌ব। দাদার সঙ্গে তোমার কিই বা সম্বন্ধ। আর কতটুকু সম্বন্ধ?' রণেনকে জব্দ করিয়াছ, আর এখন বুঝি তার প্রতিশোধ না লইয়া ছাড়িবে মনে করিয়াছ? রণেন বোকা ছেলে নয়। এইবার কমলা নিজের জালে নিজেই পড়িবে।

কিন্তু সুন্দরী কমলা, পুষ্পকোমলা কমলা, কমলার লজ্জা নাই। সে মুখ একটুও আরক্ত না করিয়া বলিল, 'কিন্তু পাকাপাকি সম্বন্ধ একদিন ত হয়েও যেতে পারে। কে জানে। তুমিই না একদিন তোমার দাদার সঙ্গে আমার বিয়ের ঘটকালি করছিলে? তোমার যখন এত পছন্দ, তখন তোমার দাদারও না হবে কি?'

রণেন একদিন জোর ঘটকালি করিতে গিয়া বেকুব হইয়াছিল। সেদিনের কথা তার মনে জাগিয়া উঠিল। সত্যই ত। কমলা সে কথা ভুলিয়া যায় নাই। ভুলিবে কেন? মেয়েরা কি সহজে কোন কথা ভুলে? সেদিন তার দুর্গতির সীমা ছিল না। সে সব দুর্গতির ইতিহাস কোন সূত্রে

কমলার কানে আসিয়াছে কি না, রণেন তা জানে না। কিন্তু এ মেয়েকে জব্দ করা সহজ নহে। সেদিন কমলা জানাইয়াছিল, বিবাহে তার নিজের কোন হাত নাই, বাপ-মা যা করিবেন, তাই হইবে। সে আজ এই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা বলে কেন?

রণেন বলিল, 'ঘট্‌কালি ত করেছিলাম, আজও করি, যদি ভরসা পাই।'

'ভরসা দিবে কে?'

'তুমি।'

'তাই বটে। আর লোক পেলে না। আমার কর্ত্তা আমি নই।'

'যদি তুমি নিজের কর্ত্তা হতে, ভরসা দিতে?'

'দিতাম বৈ কি।'

'কি ভরসা দিতে?'

'যে, তোমার দাদা ভিন্ন এ ভূভারতে আর কাউকে বিয়ে করব না।'

কমলা দিব্য সপ্রতিভভাবে হাসিতে লাগিল। রণেন ক্ষুণ্ণ মনে বলিল, 'তোমার সবেতেই ঠাট্টা।'

'কে বল্ল ঠাট্টা? যখন ঠাট্টা করি, মনে কর সত্য, আর যখন সত্য বলি, তখন মনে কর ঠাট্টা। হা আমার পোড়াকপাল!'

মনে হয় যেন কথার মধ্যে আন্তরিকতা রহিয়াছে। যেন বহুদিনের অকথিত বাণী আজ অত্যন্ত অসময়ে একটা ভাঙ্গাচোরা ঘরে প্রকাশ লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। আহা, কমলা দাদাকে কামনা করিতেছে, পৃথিবীতে এর চেয়ে আকাঙ্ক্ষার কোন্ জিনিষ রণেনের পক্ষে আছে? সেদিন আসুক। সেদিন আসুক। কিন্তু আজিকার দিনে সাবধানে পা ফেলা দরকার। কমলার কথাগুলি এখন রহস্য বলিয়াই ধরা যাক।

'সন্দেহের কথা কি বল্‌ছিলে?' রণেন ফিরিয়া প্রশ্ন করিল।

কমলা একটুখানি চুপ করিয়া রহিল। যেন অন্য কোন কথা সে রণেনের

নিকট হইতে শুনিবে বলিয়া প্রত্যাশা করিয়াছিল। যেন সে নিরাশ হইয়া গেল। তারপর স্বপ্নোত্থিতের মত প্রশ্ন করিল, 'কি বল্‌ছ ?'

'কার সন্দেহের কথা বল্‌ছিলে ?'

'এত কথার মধ্যে ঐটেই মনে করে রেখেছ! নিজের কথা আছে কি না, তাই।'

'কি যে বল।'

'সত্য কথা স্বীকার করেই ফেল না।'

'আহা! আমি যেন মিথ্যা বল্‌ছি!'

'এমন হতে পারে, তোমাদের নরেশ বাবু সন্দেহ করবেন।'

নরেশের প্রতি বিদ্বেষ রণেনের কোন কালে ছিল না। কিন্তু এখন তার নাম কেহ উচ্চারণ করিলেও তার চিত্ত জ্বলিয়া যায়। অকারণে। আর কমলা, একান্ত ভাবে তার দাদার জন্য তৈরী কমলা,'সে কেমন করিয়া নরেশকে সহ্য করে ? তার উচিত নয় তাকে দেখিবামাত্র প্রত্যাখ্যান করা ? নরেশ বাবু সন্দেহ করিবেন! নরেশ কাহাকে, যে তিনি সন্দেহ করিবেন ? কমলার সহিত তার কি সম্পর্ক ? তার সন্দেহ করিবার বা কিছু মনে করিবার কি অধিকার আছে ? মানুষের এ কথা শিখিয়া রাখা উচিত, সংসারে একমাত্র ধনের জোরে সর্ব্বত্র জেতা যায় না। আশা করা যায় যে, কমলা বুঝে, নরেশ রমেনের পায়ের যোগ্যও নয়। সোনা ফেলিয়া কেহ আর কিছু কাচের আদর করে না। কমলাও করিবে না। সংসারের লোকেরা ভুল করুক, পরিবার পরিজনেরা অবজ্ঞা করুক, রণেন মনে স্থির জানে, তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া গিয়াছে, রমেনের যথার্থ মর্য্যাদা কমলা মনে মনে তাকে দেয়। সুতরাং নরেশ হইতে কোন ভয় নাই। তবু সে নরেশকে সহ্য করিতে পারিবে না। কমলা যে নরেশের সাম্‌নে বাহির হইয়াছে, তাই ত তার রাগ। অথবা অভিমান। কিন্তু কার উপর রাগ বা অভিমান করিবে, তা সে নিজেই বুঝিতে পারে না।

মানুষ কোন অপ্রিয় জিনিষকে যেমন ভাবে হাত দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলে, তেমন ভঙ্গী করিয়া রণেন বলিল, 'বাজে কথা।'

কমলা হাসিয়া উঠিল, 'কি বাজে কথা ?'

'নরেশ বাবু সন্দেহ করবেন।'

'কিন্তু কিছু কাল পরে যখন নরেশ বাবুর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হবে, ... তাঁর ঘর করতে চলে যেতে হবে, তখন আর বাজে কথা বাজে থাকবে না। কমলা একবার একজনের স্ত্রী হলে আর অন্যজনের ঘর করতে পারবে না।'

কথার শেষে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ছিল কি ? অত লক্ষ্য করিবার সময় রণেনের নাই। সে ততক্ষণে উত্তেজনায় উঠিযা দাঁড়াইয়াছে। 'কোথা যাও,' কমলার এই প্রশ্নের উত্তরে 'কোথাও না' এই কথা বলিয়া সে আবার বসিয়া পড়িল। ভাব তখনও উত্তেজিত। ও, এই সব ষড়যন্ত্র হইতেছে বুঝি! কমলার সহিত নরেশের বিবাহ দিবার চেষ্টা! মূঢ় সে। আগে বুঝিতে পারে নাই। আর এই ষড়যন্ত্রের মূলে রহিয়াছে দাদা স্বয়ং। না, সে প্রাণ থাকিতে এরূপ ঘটনা ঘটিতে দিবে না। দরকার হইলে সে নরেশকে খুন করিয়া মনের জালা মিটাইবে। কিন্তু হায়! খুন করা ত সহজ নয়। নরেশ এমন কিছু করে নাই, করিবে না, যে জন্য তাকে সামান্য কটু কথা পর্যন্ত বলা চলে। খুন করা ত অনেক পরের কথা। বর্তমান সভ্য জগতে কি অসহায় রণেন! তার চোখের সামনে নরেশ যদি কমলাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়,—ইহা হরণ ছাড়া কি,—তা হইলেও তাকে নিরুত্তর থাকিতে হইবে, একটি অঙ্গুলিও তুলিতে পারিবে না। নরেশ কমলাকে চাহিবে এবং নিশ্চয় পাইবে। এ চিন্তাও যে সহ্য করা যায় না। রণেন নিজের মনে বার বার প্রশ্ন করে, কি করা যায়, কি করা যায়, কিন্তু কোন উপায় খুঁজিয়া পায় না। কমলা ত আর তার বা তার দাদার সম্পত্তি নয় যে, সে তাকে লুকাইয়া রাখিবে। কোথা হইতে আসিয়া নরেশ উদয় হইল তাদের

জীবনের মাঝখানে? রাহুর মত। ধূমকেতুর মত। তারপর স্থায়ী হইয়া বসিতে চায়!

তখন কমলা উঠিয়া আসিয়া সস্নেহে রণেনের পিঠে হাত রাখিয়াছে। তার ভাষাময় চোখে যে কথা ফুটিয়া উঠিল, তা রণেনের পক্ষেও জলের মত স্বচ্ছ হইয়া গেল। দুই চোখে ভরা ছিল মিনতি আর ভিক্ষা। ঠিক সেই মুহূর্তে, সেই অপরূপ ভঙ্গীতে, অলোকসামান্যা কমলা রণেনকে কি কথা বলিতে চাহিয়াছিল, কি স্বীকার উক্তি গভীর স্বরে করিতে যাইতেছিল, কে বলিবে? এ জগতে অনুকূল তিথি, অনুকূল স্থান বলিয়া কিছু নাই। কখন যে বাতাসে কাঁপন লাগে, কেহ জানে না। স্থান পাত্র কালের জ্ঞান থাকে না। মানুষ আপনাকে নিঃশেষে প্রকাশ করিযা, ধরা দিয়া বাঁচে। কমলার সেই পরম ক্ষণ। রেখায় রেখায় প্রতিফলিত হইয়া কি অবর্ণনীয় হইয়া উঠিয়াছে তার কুসুম-কোমল মুখখানি। মরি মরি! রণেন কি বসিয়া থাকিতে পারে? সে সম্ভ্রমে, গৌরবে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। যেন তার মন বুঝিয়াছে, কমলা পরম বিশ্বাসে, পরম নির্ভরতায়, তার নিকট নিজের মন খুলিতেছে।

এমন সময় বেলা ও শীলা সেই ঘরে প্রবেশ করিল। হায়, পরম ক্ষণ! হায়, দুর্লভ মুহূর্ত! কে যেন কুসুম-পেলব, শরচ্ছিন্ন কুসুম-পেলব মুহূর্ত, বাতাসে উড়াইয়া দিল। ঐ তার মৃদু, অতি মৃদু অথচ মধুর গন্ধ বাতাসের উপর কাঁপিতেছে। একটি মহৎ মুহূর্তের মৃত্যু হইল। জীবনের অসংখ্য মুহূর্ত মরিয়া যাইতেছে। মরিতে দাও, তারা মরিবার জন্য। কে তাদের জন্য কাঁদে? কে তাদের জন্য শোক করিতে বসে? কিন্তু একটি মহা মুহূর্ত! কচিৎ তার জন্ম হয়। তার যখন অপমৃত্যু ঘটে, গলা টিপিয়া যখন তাকে হত্যা করা হয়, তখন জগতে তার চেয়ে শোকাবহ ঘটনা আর কিছুই নাই। কেহ যেন লিখিত মহাকাব্যকে চিরকালের জন্য বিনষ্ট করিল। একটি মহাদেশ যেন চিরকালের জন্য সমুদ্রের অতল তলে তলাইয়া গেল। মহাকাব্য ও

মহাদেশের উদ্ধারের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু যে মুহূর্তকে হত্যা করা হইয়াছে, সে আর কোন দিন জন্মিবে না। হাজার চেষ্টা করিয়াও কমলা সেই তিথি, সেই পৃথিবী, ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না, ঠিক সেই কথাগুলি বলিতে পারিবে না। কথাগুলি হারায় নাই। মানুষের বাণী, মানুষের ভাব-রাশি মৃত্যু-হীন। প্রকাশিত না হইলেও অনন্ত কালের জন্য তারা অদৃশ্য লোকে সঞ্চিত হইয়া থাকে, ঢেউ তোলে। কিন্তু স্থান ও মুহূর্ত্ত চ্যুত সে বাণী, তার সত্তার আর সে মূল্য থাকে না। কমলার হৃদয়ের গভীর কথা হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বিলীন হইয়া গেল। মনে হইল যেন কমলার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তার মুখ, উজ্জ্বল রক্তাভ মুখ, সাদা হইয়া গেল। একটু ইতস্তত করিয়া সে নিজের জায়গায় আসিয়া বসিল।

রণেন রমেনকে যে ঘটনা বলিল, তার ভূমিকা হইল এতখানি। পট-পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে রঙ্গমঞ্চে যা অভিনীত হইয়া গিয়াছে, রমেন যার দর্শক ছিল না, রমেনকে ঘটনা বলিতে গিয়া তা রণেনের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। সেই অবস্থায় ঘরে ঢুকিয়া বেলা ও শীলা যা করিল, তা অকথ্য। রণেন নিজে বিশ্বাস করিতে পারিত না, তার বোনেরা এত নীচ হইতে পারে। তার পরম স্নেহের বোনদের সম্বন্ধে অন্য কেহ এরূপ ইঙ্গিত করিলেও সে তাকে ঘুসি মারিয়া শিক্ষা দিত।

বোনেরা জবাব দিল, তার গায়ে জোর আছে, সে যাকে খুসী ঘুসি মারিতে পারে, এমন কি অকারণে। কিন্তু বোনেরা পরম স্নেহের বলিয়া যে তারা অন্ধ হইবে, অথবা সত্য কথা বলিতে ভয় পাইবে, এমন নাও হইতে পারে। বোনেরা অন্ধ হইলে রণেনের পক্ষে, কমলার পক্ষেও বটে, সুখকর হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু রণেনের দুর্ভাগ্যবশত এবং বোনেদের সৌভাগ্যবশত তারা এখন পর্য্যন্ত অন্ধ হয় নাই। ইহার পর রণেন ও কমলার শাপে তারা হইবে কি না বলিতে পারে না। স্বীকার করিয়া লওয়া গেল যে, বোনেরা অত্যন্ত নীচ, এরূপ নীচ জীব পৃথিবীতে জন্মায় না, কিন্তু রণেনের মত উচ্চ

জীবের এ কি আচরণ ? সে একা ঘরে, তার দাদার ঘরে, কমলার সঙ্গে প্রেম করিতেছিল। অথবা হয়ত কমলাই প্রেম করিতেছিল। কারণ শীলা বলে, কমলা যে রণেনকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তা সে দেখিয়াছে। শীলাই আগে ছিল। দেখিতে পারে। বেলা অত দেখিতে পায় নাই। তবে কমলার মুখটা যে হঠাৎ ফ্যাকাসে হইয়া গেল, তা সে লক্ষ্য করিয়াছে। অপরাধ করিয়া ধরাই যদি না পড়িয়া থাকে, তা হইলে ঐরূপ বৈগুণ্যের কারণ কি ? অতি উচ্চাঙ্গ জীব রণেন ও কমলার এই সব আচরণকে সভ্য সমাজে কি নামে অভিহিত করিয়া থাকে ? কি, শীলা মিথ্যা কথা বলিতেছে ? কিসের লোভে এবং কাহার ভয়ে সে মিথ্যা বলিবে ? তার বয়স অল্প, দৃষ্টি সতেজ ও তীক্ষ্ণ, ভুল হইবার সম্ভাবনা তার সর্ব্বাপেক্ষা কম। তবে কেহ যদি মনে করে অন্যকে দোষ বা গালি দিয়া নিজের দোষ চাপা যায়, তা হইলে সে স্বচ্ছন্দে চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু নিজের অপরাধকে যত অপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করা যায়, তা ততই প্রমাণিত হইয়া যায়। আর এ সংবাদ নিংশ্বাসের আগে সর্ব্বত্র রটিত হইবে। রণেন আর কিছু তাদের পর নয়। আপন মায়ের পেটের ভাই। সে যাই মনে করুক, তাকে তারা ভালবাসে। তারই ভালর জন্য তারা তাকে সাবধান করিতেছে, সে যেন কমলীর মোহিনী মায়ায় আত্ম-বিস্মৃত না হয়। রণেন তাদের বড় ভরসার স্থল,—তার দ্বারা বংশের গৌরব রক্ষিত হইবে, এই তারা আশা করিতেছে। কমলার চেয়ে ভাল মেয়ে বাংলা দেশে ঢের আছে, সুতরাং কমলার জন্য তাদের বংশে যেন কালি না পড়ে, এই প্রার্থনা। আজ বোনেদের কথা যতই তিক্ত লাগুক, একদিন বুঝিবে তারা তার মঙ্গল ছাড়া অন্য কিছু প্রার্থনা করে নাই। সেদিন নিশ্চয়ই সে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করিবে।

বোনেদের ভ্রাতৃস্নেহের জন্য রণেন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে। কিন্তু তাকে তার বক্তব্য বিষয় বলিতে বাধা দিলেই সে সত্য প্রকাশিত হইবে,

তা মনে হয় না। ইতর যাদের অন্তঃকরণ তারাই শুধু কল্পনা করিতে পারে, বলা ত দূরে থাকুক, রণেন ও কমলা প্রেম করিতেছিল। ইহা সর্ব্বপ্রকারে অসম্ভব ব্যাপার। কেন অসম্ভব, প্রয়োজন হইলে দাদাকে তা খুলিয়া বলিবে, বোনদের নয়, বোনদের সম্মুখেও নয়—

তা শুনিবার আগ্রহে বোনেরা মরিয়া যাইতেছে না।

সত্যানন্দারও আকাঙ্ক্ষা থাকিলে মরিয়া যাইত। কিন্তু শুনিতে চাহিলেও সে বোনদের বলিবে না। কারণ, তা যথাযথ ভাবে বুঝিবার হৃদয় বোনেদের নাই। একথা শুনিয়া বোনেরা হাস্য করিতে পারে, কিন্তু সে সত্য কথা বলিতেছে। মুস্কিল এই, পূর্ব্বে যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়া গিয়াছে, সেগুলিও সে বোনেদের কাছে উপস্থিত করিতে পারিবে না। কারণ—

কারণ সেগুলি উপস্থিত করিলে তার ও কমলার অপরাধ আরও বেশী করিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

যা খুসী কারণ, রুচি অনুসারে ভাবিয়া লইবার অধিকার বোনেদের আছে। সে অধিকারে সে হস্তক্ষেপ করিতে যাইতেছে না। প্রকৃত কারণ এই যে, রণেনকে কেন্দ্র করিয়া এমন কোন গভীর বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে, যার অংশ সে আর কারও সহিত ভোগ করিতে প্রস্তুত নয়। ইচ্ছা করিলে সে এই প্রকৃত কারণ নাও ব্যক্ত করিতে পারিত—

এবং না করিলেই হয়ত ভাল ছিল। কারণ শুনিয়া বোনেদের মনে হইয়াছিল, অন্তত একবার মনে হইয়াছিল, হয়ত কোন গুরুতর কারণ আছে। এখন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, উহা কারণই নয়। রণেনের বয়স অল্প। কিন্তু প্রয়োজনের সময় সে চমৎকার অজুহাত সৃষ্টি করিতে শিখিয়াছে।

নিজ নিজ রুচি অনুসারে যে যা খুসী ভাবিতে পারে। কতকগুলি কথা বলিবার পর কমলা সস্নেহে রণেনের কাঁধে হাত রাখিয়াছিল, আরও কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় বলা ও শীলা প্রবেশ করায় তার মুখ বন্ধ হইয়া গেল।

সে আর কিছু বলিতে পারিল না। বোনেরা অবিশ্বাসের হাসি হাসিতে পারে, কিন্তু ইহাই প্রকৃত ঘটনা।

বোনেরা ঘরে ঢুকিবামাত্র কমলার মুখে কথা বন্ধ হইয়া যায় কেন? সে কথা যদি এমন শ্রাব্য এবং এমন মধুর, তা হইলে বোনেরা এমন কি অপরাধ করিল যার জন্য তারা সেই অমৃত ধারা হইতে বঞ্চিত হইল? এমন কি কথা কমলা একা ঘরে, রণেনের দাদার ঘরে, রণেনের সহিত [illegible]তেছে, যা আর দশজনের সম্মুখে বলা যায় না? অমন ভঙ্গী করিয়া সে কথা বলিবারই বা কি দরকার ছিল? কমলার মত সরলা, অপরাধহীনা বালিকা না কি পৃথিবীতে জন্মায় নাই! সেই কমলার চোখমুখের ভাব এবং দাঁড়াইবার ভঙ্গী অবিকৃত থাকে না কেন? বেলা ও শীলা সাপও নয়, বাঘও নয়। তা হইলে কমলার এত ভয় পাইবার কি কারণ ঘটিল?

কমলা ভয় পায় নাই—

রণেন কমলার সম্বন্ধে যতই [illegible] করুক, তাদের ধারণা বদলাইবে না। বেলা ও শীলা ভাল করিয়াই চিনিয়াছি। কমলা কেমন মেয়ে। তাদের বাবা মাও। রমেন ও রণেনকে সে চোখে ধূলা দিয়া ঠকাইতে পারে, কিন্তু তাদের ঠকাইতে হইলে তাকে আবার জন্মিতে হইবে। কমলার মত অসৎ ও লজ্জাহীনা মেয়ে আর একটিও নাই, একথা স্পষ্টভাবে তারা দুই ভাইকেই জানাইয়া যাইতেছে। কমলার সঙ্গ ত্যাগ না করিলে, তারা অনেক দুঃখ পাইবে। ইহাই সমগ্র পরিবারের মত। তারা দুজনে অন্য রকম ভাবিতে পারে। কিন্তু ফল ভুগিবার বেলা সকলে ভুগিবে, একথা যেন মনে থাকে। কমলার মত মেয়েকে পিঠের কাপড় তুলিয়া চাবকান উচিত। যে মেয়ের লজ্জা নাই, চরিত্র বালাই নাই, তার কি আছে? আজ রমেনের সঙ্গে, কাল রণেনের সঙ্গে, পরশু রণেনের সঙ্গে, পরদিন আরেক জনের সঙ্গে, যা খুসী করিয়া বেড়াইতেছে। রমেন ও রণেন বোকার মত উহার কথায় নাচিতেছে এবং উহার ইচ্ছা পূরণ করিতেছে। পুরুষ মানুষ বলিয়া রমেন

ও রণেন না হয় ক্ষমার্হ। কিন্তু কমলা ক্ষমাহ কিসে? আর কমলার বাপ-মাকে ধন্যবাদ। এমন মেয়েকে শাসনে না রাখিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু দুই ভাই, হাঁ, বড় ও ছোট, রমেন ও রণেন, জানিয়া রাখুক, বেলা ও শীলা সমস্ত পরিবারের মুখপাত্ররূপে বলিতেছে, কমলার এরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা তাদের পরিবার সহ্য করিবে না। ভাইয়েরা পুরুষ মানুষ হইয়াও যদি ... করে, উদাসীন থাকে, তা হইলে অগত্যা বোনেদের সেই গুরুভার স্কন্ধে তুলিয়া লইতে হইবে এবং রমেন ও রণেনের সহিত কমলার মেলামেশা যাতে বন্ধ হয়, তাও দেখিতে হইবে। পারিবারিক শুদ্ধতা ও মঙ্গলামঙ্গল নিশ্চয় কমলার চেয়ে অনেক বড়।

রমেন ও রণেনের সম্বন্ধে তাদের যদি নালিশ থাকে ত তারা একশ বার শুনিতে প্রস্তুত আছে। এমন কি, গালাগালিও। কমলার বাঁ পায়ের কড়ে আঙ্গুলের যা যোগ্যতা, তা বেলারও নাই, শীলারও নাই। তার মত উচ্চ অন্তঃকরণ যেদিন বোনেরা লাভ করিবে, রণেন সেদিন তাদের পূজা করিবে। হাঁ, রীতিমত পূজা করিবে। আসল কথা, কমলাকে দেখা অবধি তারা হিংসায় জ্বলিয়া মরিতেছে। তারা রূপে গুণে কোন দিক্ দিয়াই ত আর কমলার নাগাল পায় না। কাজেই তার নামে বদনাম রটনা করা তাদের নিত্যকার কাজ হইয়াছে। কিন্তু সেই রটনায় যে তারা এরূপ জঘন্য হইবে, তা রণেন কল্পনাও করিতে পারে নাই। কমলার ন্যায় সম্ভ্রান্ত, চরিত্র-মাধুরীতে পূর্ণ,—বোনেরা ব্যঙ্গ করিয়া 'আহা' বলিলেই আর কিছু কমলা ছোট হইয়া যাইবে না,—এমন একটি মেয়ের সম্বন্ধে যারা জঘন্য উক্তি করিতে পারে, মনে মনে একটু বিশ্বাস না করিয়াও পারে, হাঁ সে জোর করিয়া বলিবে তারা বিশ্বাস করে না, বুকে হাত দিয়া বলুক দেখি—বিশ্বাস করে, বুকে যখন হাত দিয়া বলিতেছে, তখন তার আর কিছু বলিবার প্রবৃত্তি নাই, তারা যে কি, তা তারা নিজেরাও জানে না, এই দুঃখ। তাদের, রণেনের ও রমেনের, দুঃখ এই যে, তারা রমেনের মত ভাইয়ের বোন

হইয়া, হাঁ রণেন একশ বার বলিবে সে কথা, একশ বার, কারণ পৃথিবীতে দেবতা যদি কেহ থাকে, তা হইলে সে তার দাদা—রমেন, বোনেরা হাস্য করুক, সে জানে, কমলা জানে, শত শত লোক জানে, সেই দেবতার বোন হইয়া একটি অসহায় মেয়েকে এমন অশ্লীল ভাবে অভিযুক্ত করিতে পারে। অসহায় বই কি? সে ত আর নিজের সম্মান নিজে রক্ষা করিতে পারিতেছে না। বেলা ও শীলার এই আচরণে রণেন লজ্জা রাখিবার ঠাঁই পাইতেছে না, তার মাথা কাটা যাইতেছে—

নিজের অপরাধের জন্য যাদের লজ্জায় মাথা কাটা যায় না, তারাই পরের ছিদ্র খুঁজিয়া বেড়ায়।

ছিদ্র নয়, ছিদ্র নয়। বোনেদের এই স্বভাবের জন্য রণেনের প্রাণে যে কি যাতনা, সে বুঝাইয়া বলিতে পারিবে না। অন্য যে কোন পরিবারে কমলার মত মেয়েকে কত যত্নে আদরে দুদিনে আপনার করিয়া লইত। আর তারা প্রথম হইতে কি আচরণ করিতেছে তার সঙ্গে! অথচ কমলা তাদের কেউ নয়। তার সঙ্গে এরূপ ভাবে খারাপ ব্যবহার করিবার তাদের কোন অধিকার নাই। তার অপরাধ সে সুন্দর, তার অপরাধ সে সকলের সহিত সরলভাবে মেশে, তার অপরাধ সে রমেনদের চেয়ে ধনী ঘরের মেয়ে হইয়াও বিনয়ে, সৌজন্যে, সমান ব্যবহারে, সকলের মন হরণ করিয়া লইতে চায়—

তাকে কেহ মাথার দিব্য দেয় নাই—

এই রকম তার অসংখ্য অপরাধ। সর্ব্বোপরি তার অপরাধ রমেনের ও রণেনের তাকে ভাল লাগে, রণেনের সঙ্গে সে গল্প করে এবং রণেন তার সঙ্গে গল্প করিয়া, ঠিক বন্ধুর সঙ্গে গল্প করিয়া যে সুখ পায়, সেই সুখ পায়, বোনেরা মুখ টিপিয়া হাসিলেও সে এ কথা বলিবে এবং এ কথা সত্য। এরূপ অপরাধীকে কি করিয়া ক্ষমা করা যায়? বেলা ও শীলা তাকে ক্ষমা করিবে না। তারা পণ করিয়াছে, তাকে কঠিন শাস্তি দিবে। এমন শাস্তি

যেন কমলা আর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে না পারে। সুতরাং তার নির্ম্মল চরিত্রে দোষারোপ কর। পরিতাপের বিষয় ত ইহাই। বেলা ও শীলার এমন রুচি কিরূপে হইল? তারা নিজেরা মেয়ে হইয়া অনায়াসে একটি মেয়ের চরিত্রে কলঙ্ক-কালিমা লেপিয়া দিল। ইহার চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার পৃথিবীতে আর কিছুই সংঘটিত হয় নাই। নিরপরাধা কমলা, [illegible] শুভ্র-হৃদয়া কমলা, এই কলঙ্ক তার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করিতে পারিবে না, তার অকলঙ্ক মহিমা ম্লান হইবে না, কিন্তু বেলা ও শীলা কি ভাবিয়া দেখিয়াছে, তাদের এই মনোবৃত্তি কিরূপ হেয়, কিরূপ লজ্জাজনক? নিশ্চয় ভাবিয়া দেখে নাই। তারা জানিয়া রাখুক, তার ও কমলার মধ্যে সম্পর্ক নির্দ্দোষ সম্পর্ক। অতি মধুর, অতি পবিত্র। এমন কথাতেও বোনেরা হাসিতে পারে? তারা যে কি ধাতুতে গঠিত, তা ঈশ্বর জানেন। দিদি তার স্নেহের ছোট ভাইকে যে চোখে দেখে, কমলা রণেনকে সে চোখে দেখে। ইহা শুনিতে আশ্চর্য্য হইতে পারে, কারণ বয়সে সে বড়। তবু তার নিজেরও মনে হয়, কখনও কখনও মনে হয়, সে যেন কমলার ছোট ভাই। এই সম্পর্ককে যারা কলুষিত করিতে চেষ্টা করে, সে তাদের ক্ষমা করিবে না। কিছুতেই না। নিজের বোন হইলেও না। রণেন বোনেদের সাবধান করিয়া দিতেছে, তারা যেন তাকে উত্যক্ত না করে। তার স্বভাব তার দাদার মত শান্ত ও সর্ব্বংসহা নয়। তাকে আঘাত করিলে প্রত্যাঘাত পাইতেই হইবে। সে সহ্য করিবে না, কমলার সম্বন্ধে কোন মিথ্যা কথা সে সহ্য করিবে না। পরিবারের মুখপাত্র হইয়া কথা বলিবার অধিকার বোনেদের কে দিয়াছে? সে অধিকার একমাত্র বাবার ও দাদার আছে। আর কারও শাসন সে মানিবে না। সম্প্রতি রমেনের ও রণেনের মঙ্গল-চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া বোনেরা নিজেদের মঙ্গল চিন্তা করুক। অল্প বয়সে তারা নিজেদের যে পরিচয় দিতেছে, তাতে তারাই ভাবনার বিষয় হইয়া উঠিতেছে। বিবাহ করিয়া যে সংসারে যাইবে সুখী করিতে পারিবে না। না, ইহা অভিশাপ নয়, আশঙ্কা। পারিবারিক

শুদ্ধতা ও পবিত্রতা রক্ষা। পরিবার দারোয়ানি তাদের কেহ দেয নাই, সুতরাং তারা নিজ নিজ চরকায় তেল দিলেই মঙ্গল। কমলার কথা তাদের না ভাবিলেও চলিবে, কারণ তার কথা ভাবিবার লোকের অভাব নাই। ভবিষ্যতে তার সম্বন্ধে কোন প্রকার অপমানসূচক কথা তারা যেন না বলে। রমেন সব সহ্য করিয়া আসিয়াছে, এখনও করিবে, কিন্তু রণেন রমেন নয়। রণেন নিজ হস্তে প্রতিবিধান করিবে।

ঝড়ের মত কথা কাটাকাটি চলিতেছিল। কেহ থামিতে চায় না। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে রমেন ক্লান্ত। তার উপর এই সব। ভাল কি লাগে? ইহাদের কথাবার্ত্তার রকম দেখিয়া প্রথমে সে স্তম্ভিত হইয়াছিল। তারই সামনে কমলাকে নিয়া এমন ইতর আলোচনা হইতে পারে, সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। বোনেরা তাকে মান দেয় না। নাই দিল। কিন্তু এইটুকু প্রত্যাশা তার ছিল, কমলাকে তারা যত খারাপ চোখে দেখুক, তার প্রতি সহজ ভদ্রতা ও সৌজন্য বজায় রাখিবে। কিন্তু একবার যখন পারিবারিক বিশুদ্ধতা-রক্ষার কাজে নামিযাছে, তখন কোথায থামিবে ভগবান জানে। ইহার পর কমলাকেই যা তা বলিয়া বসিবে না, তার নিশ্চযতা কি? সুতরাং সাবধান হইতে হইবে এবং একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে। ব্যবস্থাটা ভাবিয়া দেখা দরকার। ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা আগে পাকে এবং বেশী পাকে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। বেলা ও শীলা সম্বন্ধে সে বরাবর লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে এবং সহ্যও করিয়াছে, তারা তার উপর অযথা অভিভাবকগিরি ফলায়। তারা যে তাকে ভালবাসে না, তা নয়, খুব গভীর ভাবে ভালবাসে। তথাপি তাকে যন্ত্রণা দিতে ও নির্যাতন করিতে তারা বরাবর ওস্তাদ। কে বলিবে, তাদের বয়স ষোল ও আঠার মাত্র! আজ রণেনের যে চিত্র তার সামনে প্রকাশিত হইল, তা একেবারে নূতন। উত্তেজিত রণেন মনের কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে, সাধারণত যা সে করে না। রমেনের প্রতি তার অকৃত্রিম অনুরাগের কথা রমেন জানে এবং সেজন্য কৃতজ্ঞ।

কিন্তু রণেনের হৃদয়ে রমেন যে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত, তা এই প্রথম শুনিল। সঙ্গে সঙ্গে বোনেদের প্রতি তার অতিশয় ঔদ্ধত্য দেখিয়া মনে করুণার সঞ্চার হইল। কিন্তু রণেনের যাত্রা-পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে সম্প্রতি বি. এ. পাশ করিয়াছে। নিজ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক স্বপ্ন দেখে, যেমন একদিন রমেনও দেখিয়াছিল। ত্রিশ উত্তীর্ণ রমেন আর বিশের নীচে রণেন—দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে বাস করিতেছে। রণেন সত্যবাদী, স্পষ্টবক্তা, ভীরুতার নামগন্ধও তার মধ্যে নাই। সে সর্ব্বপ্রকার ভয় হইতে মুক্ত এবং সাহসের কাজের জন্য সর্ব্বদা উন্মুখ। যেন শক্তিমান্ অশ্ব। আপন তেজে ও বেগে আপনি অস্থির। বেলা ও শীলা তার কাছে একটুও প্রশ্রয় পাইবে না, ইহা নিশ্চিত। প্রত্যেক মানুষের ছাঁচ আলাদা। সুতরাং রণেনের মধ্যে রমেন নিজের প্রতিচ্ছবির আশা করিতে পারে না। করেও না। রমেনও একদিন যৌবনের স্বপ্নে রাঙ্গা ছিল। সেদিন আর এ দিন! কিন্তু সেদিনও সে শান্ত ও সংযত ছিল। রণেন অধীর ও অশান্ত। জীবনকে জয় করিবার রোখ্ তার দুরন্ত। এই নূতন জীবনকে সর্ব্বদা সস্নেহে উৎসাহ দিতে হইবে বৈ কি।

রমেন জোর করিয়া দুই পক্ষকে থামাইয়া দিল। বলিল, 'বুঝ্‌লাম, কমলার মত খারাপ মেয়ে হয় নাই। কিন্তু বেলা, আমি তোমাদের অপমানটা কর্‌লাম কখন, কি করে?'

'বুঝ্‌তে পার্‌ছ না?'

'না!'

'হায়! তা যদি বুঝ্‌বে, যদি কাণ্ডজ্ঞান থাক্‌বে, তা হলে কমলা এ বাড়ী আসবার সাহস পাবে কেন? তার মত মেয়ের আমাদের বাড়ী আসাই যে আমাদের পক্ষে অপমানজনক।'

'ও! বুঝেছি। কিন্তু কি কর্‌তে বল?'

'তার আসা বারণ করে দাও।'

'তা, কোন ভদ্রলোকের মেয়েকে কি বলা যায়, তুমি এস না ?'

'তুমি যদি বল, তা হলে আমরা বলে দিতে পারি।'

'তোমাদের বলাটা বড় খারাপ দেখাবে।'

'দেখাক খারাপ। তার জন্য আমরা ভয় করি না।'

'ভয়ের জন্য নয়। দেখি ভেবে কি করা যায়।'

তখনকার মত সকলে নিরস্ত হইল। কিন্তু সেইদিন হইতে পরিবারের মধ্যে কমলাকে লইয়া ভীষণ কলহ ও অশান্তি অহরহ হইতে লাগিল। রণেন তার মূল। রমেন অস্থির হইয়া উঠিল। রণেন কমলা সম্বন্ধে আর কারও কথা শুনিবে না। রমেন শাসন করিতে পারে, না রণেনকে, না অন্য কাহাকে।

রমেন মনে মনে জানিত, বোনেরা কমলা সম্বন্ধে যা বলিয়াছে, তা সত্য নয়। তারা কমলাকে হেয় করিবার জন্য অথবা কমলার উপর হইতে রমেনের মন উঠাইয়া লইবার জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা বলিয়াছে কি না জানিবার উপায় নাই। সত্য বটে, ইহার পূর্ব্বে বেলা একাকী রমেনকে এ বিষয়ে অনেক বুঝাইয়াছে। কমলা যে সৎ ও আকাঙ্ক্ষার নয়, ইহা সে আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করে। সেই বিশ্বাসে রঞ্জিত তার মন কমলা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ বিচার কবিতে পারে, ইহা ধরিয়া লওয়া রমেনের পক্ষে সহজ নহে। বেলার আন্তরিকতা সত্য, কিন্তু কমলার সম্বন্ধে ধারণা ভিত্তিহীন। রমেন একদিন তাকে জানাইয়া দিয়াছে, কমলাকে সে বিবাহ করিবে না, ভগবান্‌কে ধন্যবাদ যে, সে বলে নাই কমলাকে ভালবাসিবে না, কিন্তু রণেন সম্বন্ধে তারা হয়ত নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না। তাদের মতে কমলা সেই জাতের মেয়ে যারা অনবরত পুরুষ মানুষ শিকার করিয়া বেড়ায়। রমেনকে পাওয়া যাইবে না, রণেন ত আছে। রণেনের কাছে এই প্রসঙ্গ পাড়িবার পর্য্যন্ত উপায় নাই। সে রুখিয়া উঠে। বলে, কমলাব নাম মুখে আনিবার তোমরা যোগ্য নও। ছেলেটা দুদিনেই যেন কি

হইয়া গিয়াছে। কমলা তাকে কি দিয়া যে এত বশ করিল, তা সেই জানে। কিন্তু রমেন নিশ্চয় ছেলেমানুষ নয়, সে বুঝিবে। পরিবারের সুনাম রক্ষা করা নিশ্চয় তার কর্ত্তব্য। বেলা বা শীলার সম্বন্ধে রমেন, শান্ত বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন রমেন, যেন এ কথা মনে না করে যে, তারা বিনা কারণে তার সহিত শত্রুতা করিতেছে। তারা যা করিতেছে, তা কর্ত্তব্য-বুদ্ধির প্ররোচনায় করিতেছে। ইহাতে তাদের নিজেদের কিছুমাত্র স্বার্থ নাই।

মাসের মধ্যে বহু বার কমলাকে নিয়া কলহ হইত। আর বেলা ও শীলা রমেনকে এইরূপে জপাইত। রমেন বোনদেরকে ও রণেনকে নিবারণ করে না ; কমলা পূর্ব্বে যেমন হাসিমুখে আসিত তেমনই আসিতে থাকে, রমেন ভ্রমেও বলে না, আসিও না। রণেন ত জোর করিয়া বেশী মিশে। রমেনের অণুতে অণুতে না কি আলস্য-ভরা। তাই সে দেখিয়াও দেখে না। সহসা কোন কাজে প্রবৃত্ত হয় না। অন্য লোকে যে কাজ এক দিনে করে, তাকে দিয়া তা ছয় মাসে করান যায় না। সামান্য একটা মুখের কথা মাত্র কমলাকে বলিতে হইবে। সে বলিল না। হয়ত কোন দিন বলিবে না। এরূপ লোককে কখন কখন ক্ষমা করা গেলেও সর্ব্বদা ক্ষমা করিয়া চলা যায় না। যে আলস্য ক্ষতি করে, তাকে প্রশ্রয় না হয় নাই দিল! এই আলস্যের জন্য সে জীবনে কিছু করিতে পারিল না। তবু তার চৈতন্য হয় না। সেই আলস্যের চর্চ্চা আবার করিতেছে। ইহার একটা উপায় বাহির করিতে হইবে।

আশ্চর্য্য মানুষের মন! বিচিত্র তার গতি! কমলার বিরুদ্ধে অভিযোগের একটি বর্ণও রমেন বিশ্বাস করে নাই। জীবনের পূর্ণ ভালবাসা কমলাকে দিয়া সে সুখী। পাছে কমলা তাকে ভালবাসিয়া ফেলে, সেইজন্য সে সাবধানী। এক এক সময়ে সে নিজে মনে মনে হাসে। তার কোন্ শক্তি বা গুণ আছে, যাতে সে কমলাকে এমন জোরে নিজের দিকে আকর্ষণ করিবে যে সে হইয়া উঠিবে কমলার প্রিয়, প্রিয়তম। সে নিজেকে তন্ন তন্ন

করিয়া বিশ্লেষণ করে, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দেখে, কিন্তু কোথাও এমন আশ্রয়-ভূমি পায় না, যেখানে আসিয়া কমলা নিশ্চয় নির্ভরতায় পা ফেলিবে। মুহূর্তে মুহূর্তে সে জ্বলিয়া উঠে। তখন মনে হয়, এ জগতে তার একটা বিশেষ দাম আছে। কিন্তু সে ত মোহ। ক্ষণিকের মোহ ক্ষণ পরে টুটিয়া যায়। নিজের সর্ব্বপ্রকার দীনতার কথা ভাবিয়া রমেন নিজের জন্য অসীম লজ্জা ও অনুকম্পা ভোগ করে। নিজের কাছে বার বার এই ... স্বীকার করে, কমলার তাকে ভালবাসা উচিত নহে এবং কমলা ভাল না বাসিলেই সে সুখী হইবে। তথাপি ইহা সত্য যে, বোনেদের মুখে কমলার নামে অভিযোগ শুনিয়া প্রথমে সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যায়। সব কথা সে অবিশ্বাস করিয়াছে। তবু তার মন খারাপ হইয়া গিয়াছিল। আশ্চর্য্য এই, এখনও সে কথা স্মরণ করিলে তার মন খারাপ হয়। মানুষের মনে ব্যথার শক্তি এমন অসীম যে, তা রোধ করা যায় না। মিথ্যা কথাও মানুষকে কম বিচলিত করে না।

ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত দেখ। রমেন যতই মনে করে, সে কমলাকে দূরে রাখিবে, তত যেন জড়াইয়া পড়ে। নরেশকে আনিয়া দিয়া কোথায় সে মুক্ত হইবে, না, তার আগমনের প্রথম দিন হইতেই এ বাড়ীতে কমলার ব্যক্তিত্ব আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। বোনেরা নরেশকে লইয়া ইঙ্গিত করিয়াছে, রণেনকে লইয়া করিয়াছে, তাকেও বাদ দেয় নাই। কিন্তু দোষ তার বা রণেনের বা নরেশের নহে। দোষ কমলার। এই যুক্তিতেই সে বিস্ময় মানে। রণেন বোনেদের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছে। কমলার নামে যা-তা বলিয়াছে বলিয়া সে তাদের কিছুতেই ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নয়। কিন্তু রমেন মনে মনে যত গভীর দুঃখ পাক, রাগ করে নাই, রাগ করিতে পারে নাই। বেলা ও শীলার অন্তরকে সে ক্ষমা-সুন্দর চোখে গ্রহণ করিয়াছে। তারা তাকে ভালবাসে। তারা ভুল করিতে পারে, তার অতিশয় কষ্টের কারণ হইতে পারে, সেটা তার দুর্ভাগ্য অদৃষ্ট, কিন্তু তার পিছনে তাদের যে

অজস্র শুভ ইচ্ছা ও ভালবাসা রহিয়াছে, তা সে কেমন করিয়া ভুলিয়া যাইবে? না, সে ভুলিতে পারে না। জীবনের এতগুলি দিন কাটিয়া গিয়াছে। বাঁকে বাঁকে তার পরিবারের প্রতিজনের যে স্নেহ-সুধা সে ভোগ করিয়াছে, তা স্মরণ করিলে তার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া যায় এবং বোনেদের প্রতি বিন্দুমাত্র বিরূপতা তার মনে স্থান পায় না।

৫

কোন কোন নদীর জল ভারী স্বচ্ছ। এত স্বচ্ছ যে, তার ভিতর দিয়া নীচের বালুকারাশি পর্য্যন্ত দেখা যায়। চৌদ্দ বৎসর বয়স অবধি কমলার মন এমনি স্বচ্ছ ছিল। দু'একটা ঘটনা হয়ত ঘটিয়াছে, তাই কি যেদিন রমেন 'আমি জানি কমলা তুমি নিষ্পাপ' বলিয়া হাত বাড়াইয়াছিল, সেদিন সে শিহরিয়া উঠে? তার জীবনে ছোট বা বড় যে ঘটনা ঘটুক, সে বহুদিন তা অতিক্রম করিয়াছে, তার দাগ মিলাইয়া গিয়াছে। হাঁসের পাখায় যেমন জল থাকে না, ঝরিয়া পড়িয়া যায়। গঙ্গাজলে যা কর না কেন, তা যেমন সর্ব্বদা পবিত্র থাকে। তেমনই কমলা। সুখ-দুঃখ আলো-আঁধার তার জীবন-কাব্য রচনায় ব্যাপৃত ছিল, কিন্তু মন তার বন্য হরিণীর মত মুক্ত। লঘুপক্ষ বিহঙ্গমের মত সে যেন নীল আকাশ-সাগরে সাঁতার কাটিতেছে। জীবনের এই পরম কাম্য দিনগুলি! যখন বাবা ও মায়ের স্নেহ, দাদার আদর তার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তার কাছে বসিলে প্রাণ জুড়াইয়া যাইত। চৌদ্দ বছরেও সে সরলা বালিকা বই কিছু ছিল না।

কমলা পনের বৎসরে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে পট-পরিবর্ত্তন হইল। বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। কমলা তার বাপের বড় আদরের ধন। মা তাঁকে আগলিয়া রাখেন। অবস্থা ভাল। সুতরাং বাপ-মা যে ভাল পাত্রের জন্য প্রাণপণ করিবেন, তা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। কমলার দাদা কমলার চেয়ে বছর দশেকের বড়। দূর দেশে কি চাকরী করে। চিঠিপত্রের মধ্য

দিয়া তারও পরামর্শ লওয়া হয়। কিন্তু পরামর্শের আর শেষ হয় না। মনের মত পাত্র আর হইয়া উঠে না। একজন যাকে পছন্দ করেন, অন্যেরা তার নানা খুঁত বাহির করেন, এবং সে পরিত্যক্ত হয়। এমন করিয়া তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু সকলের মনের মত পাত্রটি আজও দেখা দেয় নাই। কমলার বাপ-মার পণ ছিল না যে, তাঁরা চৌদ্দ বা পনের বৎসরে মেয়ের বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন। বরঞ্চ সত্য কথা বলিতে গেলে, [illegible] তাঁর বিবাহ না দিয়াই তাঁরা বেশী নিশ্চিন্ত ছিলেন। তবে এ জ্ঞান তাঁদের সর্ব্বদা বর্ত্তমান ছিল যে, কমলার জন্য একটি ভাল ছেলে বিশেষ প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক পাত্র লইয়া আলোচনা কমলার সম্মুখেই হইত। এই আলোচনায় তার নিকট এক নূতন জগৎ খুলিয়া গেল। বর বা স্বামী নামে একটি পদার্থ সম্বন্ধে সে চেতনা লাভ করিতে লাগিল। অস্পষ্ট চেতনা। সেজন্য কল্পনার আর অন্ত নাই। নিজ বাপ-মাযের সুখী বিবাহিত জীবন দেখিয়া সে কল্পনা করিতে শিখিতেছিল যে সে সুখ ও আরামপূর্ণ উজ্জ্বল এক সুন্দর নীড় রচনা করিবে। নিজের জন্য ও স্বামীর জন্য করিবে। অথচ পূর্ব্ব স্নেহভক্তিও বজায় থাকিবে।

পাত্র সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কমলার সম্মুখে হইলেও, কেহ কোন দিন কমলার মতামত জিজ্ঞাসা করে নাই, জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন মনে করে নাই। আর এ বিষয়ে কমলার নিজের চিন্তা করিবার কিছু আছে, বা সে নিজ মত প্রকাশ করিবে, কমলা এরূপ কোন দিন ভাবে নাই। বরং তাকে কোন কথা কখনও জিজ্ঞাসা করিলে সে নিতান্ত বিব্রত বোধ করিত। পাত্র সম্বন্ধে সে আবার কি কথা বলিবে? কিই বা জানে সে? ঐরূপ চিন্তাতে পর্য্যন্ত লজ্জা বোধ করিত। বাবা মা দাদা রহিয়াছেন, তার জন্য ভাবিতেছেন, অহরহ তার মঙ্গল চিন্তা করিতেছেন, তার এ বিষয়ে মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি? তাঁরা যে ব্যবস্থা করিবেন, তাই সে নতমস্তকে মানিয়া লইবে। সে জানে, তাতেই সে সুখী হইবে। এইজন্য সে একদিন রমনকে এবং রণেনকেও

বলিয়াছিল যে, তার বিবাহ সম্বন্ধে তার সহিত আলোচনা না করিয়া তার বাবার সঙ্গে আলোচনা করিতে হইবে। অথচ আসল কথা এই যে, যখন একথা সে বলিয়াছিল, তখন একজনের ছবি তার মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। আগে সে যে রাজপুত্রের স্বপ্ন দেখিয়াছে, সেই রাজপুত্রই একদিন রমেনের মূর্ত্তিতে পাশের বাড়ীতে আসিয়া দেখা দিল।

রমেন সেই রাজপুত্র। কমলা নিজের মনের কাছে হাজার বার সে কথা স্বীকার করে। কমলার তখন পনের বৎসর। সেই সময় পট-পরিবর্ত্তন হয়। পাশের বাড়ীতে রমেনরা আসে। এত বড় পৃথিবীতে এটা একটা খুব বড ঘটনা নয়, কিন্তু কমলার জীবনে এমন আশ্চয্য ঘটনা আর ঘটে নাই। রমেনের মত একটি লোককে এত কাছে হইতে দেখিবার স্নযোগ সে আর কোন দিন পায় নাই। প্রথম কবে রমেন তার চোখে পড়িল, তার মনে আছে কি? সেই বিশেষ দিনটি! না, মনে নাই। অন্য হাজার দিনের মধ্যে সে দিন হারাইয়া গিয়াছে। নিজের মনের মধ্যে সে বার বার, অসংখ্য বার, সেই দিনটি যাপন ও উপভোগ করিতে পারে, যেন সেই দিনটির জন্য তার জীবন সার্থক ও মধুময় হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সে যে কোন্ তারিখ তা কিছুতেই স্মরণ করিতে পারে না। কি অদ্ভুত, অতি অদ্ভুত, সেই দিন! তার মধ্যে আকস্মিক সেই মুহূর্ত্ত যখন তার দুই চোখ রমেনের স্নন্দর আয়ত দুই চোখের উপর পড়িল এবং সমস্ত দিনটি, সমগ্র জীবন, আলোকিত ভাস্বর হইয়া উঠিল। কমলা একটুও প্রস্তুত হইবার অবসর পায় নাই, ভাবিতে পারে নাই, জীবন-পথে এই পথিকের পা পড়িবে, তার পদধ্বনির রেশ তার সমস্ত অন্তর জুড়িয়া বাজিতে থাকিবে। কমলা কোন দিন স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে নাই, পৃথিবীতে এমন কোন লোক থাকিতে পারে, যার আকর্ষণ তার পক্ষে প্রচণ্ড। (বস্তুত, চুম্বক যেমন বেগে লৌহকে আকর্ষণ করে, প্রথম সাক্ষাৎ অবধি রমেনের অস্তিত্ব কমলাকে নিরন্তর সেই ভাবে আকর্ষণ করিতে থাকিল।) প্রথম পরিচয় সে-ই করিয়াছিল, প্রথম কথা সে-ই বলিয়াছিল, কত

তুচ্ছ বিষয় লইয়া। ভাগ্যে তার সেমিজটা রমেনদের ছাদে উড়িয়া গিয়াছিল, তাই ত তাকে সে ডাকিতে পারিল। তার রাজ্য হারাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও সে অন্য কোন অপরিচিত লোককে এমনভাবে ডাকিয়া বলিতে পারিত না, আমার সেমিজটা দাও। কিন্তু রমেনের মধ্যে কি যে ছিল, সে নিজেই বলিতে পারে না, যেজন্য তাকে একটুও লজ্জা করিল না, নিতান্ত আপনার জনের মত অনুরোধ করিতে পারিল এবং তাতেই অপার আনন্দ অনুভব করিল। সেদিনের কথাগুলি, সেই তুচ্ছ কথাগুলি, বার বার মনে পড়ে। আরও কত কথা মনে পড়ে। আজ তিন বৎসর রমেনদের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছে। রমেনকে যত দেখে তত তার ভাল লাগে। এই মেলামেশার মধ্য দিয়া রমেন যে কত ভাবে নিজেকে প্রকাশিত করিয়াছে, তা ভাবিতে ভাল লাগে। অবশ্য নিজের অজ্ঞাতসারে। কারণ, আর সকলের মত কমলাও এত দিনে বুঝিয়াছে যে, নিজেকে জাহির করিবার মত ব্যক্তি রমেন নয়। আশ্চয্য চরিত্র এই লোকটির। বিরাট সম্ভাবনা রহিযাছে উহার মধ্যে। চাপা আগ্নেয়গিরি যেন। কিন্তু আজও নিজেকে আবিষ্কার করিতে পারে নাই। পথ খুঁজিয়া পায় নাই। তাই পদে পদে আত্ম-অবিশ্বাস। কমলার ইচ্ছা করে, রমেনকে তার স্বভূমিতে, আত্মমর্য্যাদার ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়। ইচ্ছা করে, রমেন অনায়াসে জীবন-পথে জয়যুক্ত হোক। কারণ, যারা জয়ের তিলক ললাটে পরে, তারা যে কোন দিক্ দিয়া রমেনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়, তা সে তার অল্প বয়সের অভিজ্ঞতা হইতেও বুঝিতে পারে। আহা, রমেন যদি আরও অর্থবান্ হইত অথবা নিজে প্রচুর উপার্জ্জন করিতে পারিত! কমলা নিজে সেই ধাতের মানুষ যে অর্থকে সকলের উপরে স্থান দেয় না। সেইজন্য দরিদ্র রমেন তার হৃদয় জুড়িয়া বসিতে পারিয়াছে। কিন্তু অর্থের প্রয়োজন সম্বন্ধে সে উদাসীন নহে। দারিদ্র্য যে মানুষকে সুখী করিতে পারে না, প্রতি দিনের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে যথেষ্ট অর্থ না থাকিলে যে জীবন রম্য হয় না, একথা কমলা ভাল করিযা জানে এবং বিশ্বাস করে। সেইজন্য সে কামনা

করে, রমেনের অর্থ হোক। কোন দিন যদি হঠা[illegible] রমেন বিত্তবান্ হইয়া দাঁড়ায় অথবা তার অনেক উপার্জ্জন করিবার ক্ষম[illegible] জন্মে, তা হইলে বোধ হয় তার চেয়ে সুখী কেহ হইবে না। রমেনের দারি[illegible]্য যেন তার অভিমানের বস্তু। ইহা লইয়া রমেনকে কোন প্রকার অনুযোগ ক[illegible]। তার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু সে ঈশ্বরের কাছে নিভৃতে, নিজের অন্তর হ[illegible]তে, এই প্রার্থনা জানায়, যেন [illegible] এ বিষয়ে সফলতা লাভ করে। স[illegible]প্রতি অর্থের কথাটা নূতন করিয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। নরেশ যে এ [illegible]রিবারে কি জন্য যাতায়াত করিতেছে, তা সকলের নিকট স্পষ্ট এবং তার পিতা[illegible]তার অনুমোদিত। বস্তুত, নরেশ তাদের জামাতা হইলে তাঁরা অপার আনন্দ পাইবেন। এই সম্বন্ধ লইয়া পরিবারের লোকদের মতভেদ হয় নাই। স[illegible]কলে শুধু নরেশের মুখের কথার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সকলে জানে, নরেশের সম্মতির জন্যও বেশী দিন অপেক্ষা করিতে হইবে না।

কিন্তু কমলা নরেশকে একেবারে স[illegible]তে পারে না। তাকে দেখিবা মাত্র তার গা জলিয়া যায়। অথচ অ[illegible] উপহাস এই যে, তাকে নিজের জালা চাপিয়া রাখিয়া হাসিমুখে কথা বলিতে হয়। নরেশের এই আকস্মিক ও তার নিকট তিক্ত আবির্ভাবের জন্য সে রমেনকে সম্পূর্ণ দায়ী করে। কি প্রয়োজন ছিল তার এমনভাবে অনাহূত এই ব্যক্তিকে ডাকিয়া আনিবার? কিন্তু পরক্ষণেই রমেনের আশ্চর্য্য সংযম ও উদারতায় সে মুগ্ধ হইয়া যায়। শ্রদ্ধায় তার মাথা নত হইয়া পড়ে। সে অনেক চেষ্টা করিয়াছে, এমন কি রণেনের কাছে পরিষ্কারভাবে স্বীকার করিয়াছে যে, ভালবাসিতে হইলে সে রমেনের মত লোককেই ভালবাসিবে, কিন্তু রমেন তার অন্তরে কমলাকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছে, তা কমলা বুঝিতে পারে না। রণেনের দৃঢ় বিশ্বাস, দাদা কমলাকে গভীরভাবে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। তার কোন প্রমাণ সে দিতে পারে কি? না, পারে না। সব জিনিষ কি প্রমাণ করা যায়? তবু সে বলিবে, তার ভুল হইবার সম্ভাবনা কম। দাদা অত্যন্ত চাপা। যে লোক

পরিবারের শত পীড়ন ও অত্যাচার নীরবে সহ্য করে, সে নিজের হৃদয়াবেগ কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। তথাপি রণেন নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে, কমলার প্রতি রমেনের প্রেম গভীর প্রেম। কিন্তু রমেনের সংযম ও উদারতা লইয়া কমলা কি করিবে? নরেশের হাত হইতে সে রক্ষা পাইতে চায়। হাঁ, সময় আসিয়াছে। সে নিজের চিত্তকে ভাল করিয়া বুঝিয়াছে। সময় আসিয়াছে, [illegible] নরেশের দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া বলিতে হইবে, না, সে তাকে বিবাহ করিবে না। কিন্তু মাগো, তা কেমন করিয়া সম্ভব হয়? সে মাত্র হাবেভাবে এই কথা জানাইয়া দিতে পারে, তার মন অন্যত্র আবদ্ধ, তাকে জোর করিয়া নরেশের সহিত বিবাহ দিও না, সে সুখী হইবে না। কিন্তু বাপ-মাকে অসন্তুষ্ট করা, তাঁদের মর্ম্মে আঘাত দেওয়ার কথা, সে যে ভাবিতেও পারে না। তাঁরা তার সুখের জন্য অবিরত চেষ্টিত। কোন মেয়েকে তার পিতা মাতা ভ্রাতা পরিজনেরা এত ভালবাসে, কমলা কল্পনাও করিতে পারে না। সে নরেশ সম্বন্ধে এতটুকু আপত্তি করিলেও তাঁরা আঘাত পাইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু যাকে ভালবাসিয়া যার চরণে সে নিজেকে বিক্রয় করিয়াছে, তার কাছে অবিশ্বাসী সে হইবে কেমন করিয়া? রমেন বুঝুক বা না বুঝুক, তাকে স্বীকার করুক বা না করুক, কমলা মনে মনে রমেনকেই স্বামী রূপে বরণ করিয়াছে, সেখানে অন্য কাহাকেও বিবাহ করার অর্থ ব্যভিচার ভিন্ন আর কিছু নহে। সংসার-অনভিজ্ঞা সরলা বালিকা কমলা! ব্যভিচারের কথা মনে হইবামাত্র তার নির্ম্মল অন্তঃকরণ সঙ্কুচিত হইয়া যায়। হৃদয় ধিক্কারে পূর্ণ হয়। সে যে কি করিবে, বুঝিতে পারে না।

কমলা একা ঘরে বসিয়া মনোদুঃখে কাঁদিতেছিল। সম্প্রতি কাঁদিবার বিশেষ কারণও ঘটিয়াছিল। রমেনদের বাড়ীতে তার দুই বোনের নিকট সে বিশেষ অপমানিত হইয়া আসিয়াছে। রণেনের কাঁধে হাত রাখিয়া সে কি মোহে যে রমেনের প্রতি তার গভীর প্রেমের কথা ব্যক্ত করিতে যাইতে-

ছিল, সে জানে না। ইহার পূর্ব্বে অনেক দিন নানা ভাবে সে রমেনের প্রতি তার নিজের ভালবাসার কথা জানাইয়াছে। কিন্তু আজকের মত অন্তরের কবাট একেবারে উন্মুক্ত করিয়া দিবার অধীর আগ্রহ তার আর কোনদিন হয় নাই। আর একটু দেরী হইলে হয়ত সবই বলা হইয়া যাইত এবং সে লজ্জায় মরিয়া যাইত। বলিতে কতটুকু সময়ই বা লাগে! জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় [illegible] কথাও নিমেষে বলা হইয়া যায়। বেলা ও শীলার প্রবেশে সে সেই লজ্জার হাত হইতে ত্রাণ পাইল বটে, কিন্তু বোধ হয় রণেনের কাছে চিরকালের জন্য লজ্জিত থাকাও এর চেয়ে শতগুণে ভাল ছিল। কারণ, রণেন যে তার অনুরক্ত, তা সে জানে। রণেন কোনদিন তার বিন্দুমাত্র অপমান বা লজ্জার কারণ হইবে না। কিন্তু বেলা বা শীলা রণেন নয়। তাদের নখদন্ত সর্ব্বদাই তার প্রতি উদগ্র হইয়া আছে। কেন যে আছে তা সে জানে না। সে সাধ্যমত তাদের এড়াইয়া চলে। যখন এড়াইতে পারে না, তখন যথোচিত সম্ভ্রমের সহিত ব্যবহার করে। কিন্তু তারা যেন তাকে মানুষ বলিয়াই জ্ঞান করে না, এবং অকারণে আঘাত করে। এতদিন সে সকল সে গায়ে মাখে নাই। তার যুক্তি এই ছিল যে, রমেনদের বাড়ীতে সে রমেন ও রণেনের জন্য যায়, আর কারও জন্য ত যায় না। সুতরাং অন্যদের কথা বা আচরণ গায়ে না মাখিলেই হইল। কিন্তু রমণী যে রমণীকে কিরূপ গুরু আঘাত দিতে পারে, কমলা আজ তার পরিচয় পাইয়াছে। এমন নীচ কথা যে কেহ ভাবিতে পারে, তা কমলা কল্পনা করিতে পারে নাই। সে না কি রণেনের কাছে প্রেম নিবেদন করিতেছিল! শোন কথা। রণেন, ছেলেমানুষ রণেন, তা হইলই বা তার চেয়ে বয়সে বড়, বয়সে কি আসে যায়, রণেন ছেলেমানুষ বই কিছু নয়, সেই রণেনকে প্রেম জানাইবে কমলা! কমলা বুক চিরিয়া দেখাইতে পারে, কোন্ দেবতার নাম তার অন্তরের মধ্যে রহিয়াছে। অন্তরের নিভৃত বেদীতে যে একবার রমেনের পূজা করিয়াছে, সে কি আর কারও কথা মনে রাখিতে পারে? বাস্তবিক, রমেন যখন কমলার কাছে থাকে,

তখন সমস্ত বিশ্বজগৎ তার কাছে শূন্য হইয়া যায়, সে রমেন ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিতে পায় না। রমেনকে দেখিবার জন্য, রমেনের কথা শুনিবার জন্য, তার সমগ্র আত্মা, দেহের অণুপরমাণু, অধীর আগ্রহ অনুভব করে। রমেন যখন তার বিশাল আয়ত দুই চক্ষু তুলিয়া কমলার দিকে তাকায়, তখন তার আর কোথাও নড়িবার সামর্থ্য থাকে না, তার মনে হয় ঐ চরণতলে পড়িয়া মরিতে পারিলে, তার জীবন সার্থক হইবে। সেই কমলাকে কি না ... দোষারোপ! রমেনকে চিরকাল সে পরম স্নেহের চোখে নিজ ছোট ভাইয়ের মত দেখিয়াছে। অথচ বেলাও শীলার ঐরূপ কুৎসিৎ ইঙ্গিত করিতে একটুও বাধিল না!

কমলা টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতেছিল। নিঃশব্দে, যেন তার এই অপমান ও তজ্জন্য মনোবেদনার কাহিনী আর কেহ না জানিতে পারে। এমন সময়ে সে ঘরে নিঃশব্দে একজন কেহ প্রবেশ করিল। যে প্রবেশ করিল সে ধীরে তার নিকটে গিয়া মাথার উপর হাত রাখিল।' কমলা শিহরিয়া অশ্রুপ্লাবিত চোখে মাথা তুলিয়া দেখিল কে আ? হায়, যাকে আজ দেখিবে বলিয়া আশা করিয়াছিল, এবং যার বক্ষে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে পারিলে সে একটু সান্ত্বনা লাভ করিত, সে ত নয়। রমেন আসে নাই, আসিয়াছে নরেশ। কমলার মনে হইল, চোরের মত। সে ত্রস্ত উঠিয়া দাঁড়াইল ও হাসিয়া অভ্যর্থনা করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তখন বড দেরী হইয়া গিয়াছে। তার চোখের জল ধরা পড়িয়া গিয়াছে। নরেশ কতক্ষণ আসিয়া দাঁডাইয়া থাকিয়া তাকে তদবস্থ দেখিয়াছে তাই বা কে জানে?

নরেশ কমলার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ। তার রূপ-সুধা দুচোখ ভরিয়া পান করিয়াও তার আশা মেটে না। প্রথম যখন এ পরিবারে কমলার জন্য সে আসে, তখন তার এই ধারণা ছিল, তার রূপ, গুণ ও ঐশ্বর্য্য কমলাকে অভিভূত করিয়া ফেলিবে। রমণীর যা কাম্য, শাড়ী, গাডী, বাড়ী, অলঙ্কার, প্রচুর পরিমাণে পাইবার আশায় কমলার চিত্ত যে তার দিকে একান্তভাবে ঝুঁকিয়া পড়িবে,

এ বিষয়ে তার মনে কিছুমাত্র সংশয় ছিল না। যে বিষয়ে তার মনে সংশয় ছিল, তা এই যে, শেষ পর্য্যন্ত সে কমলাকে গ্রহণ করিবে কি না। এত দিনে মনে মনে সে প্রশ্নেরও মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। সে যদি কমলাকে বিবাহ করে, তা হইলে বোধ হয় নেহাৎ ঠকিয়া যাইবে না। সত্য বটে, কমলা অসামান্যা সুন্দরী নয়, কিন্তু আগেও এমন ধরণের সৌন্দর্য্য নরেশের চোখে আর কোনদিন পড়ে নাই। হাঁ, এই সুন্দরী নারীর অধিকারী গর্ব্ব করিতে পারে বটে। পাঁচ জনের কাছে বলিতে পারে, চাহিয়া দেখ, পৃথিবীতে এমন জিনিষ পাইয়াছি, যার তুলনা নাই। কমলাকে স্ত্রীরূপে পাইলে সে যে বহু-লোকের ঈর্ষ্যার পাত্র হইবে, তা বুঝিতে পারে। সকলের প্রশংসমান চোখের সাম্‌নে দিয়া যে নিজ স্ত্রী লইয়া চলাফেরা করিতে পারে, তার মত ভাগ্যবান্ কে? সে ভাগ্যবান্ নরেশই বা হইবে না কেন? ভগবান্ নরেশকে অজস্র দানে ভরিয়া দিয়াছেন, এই পরম দান হইতেও নিশ্চয় বঞ্চিত করিবেন না। সুতরাং নরেশ মনঃস্থির করিয়াছে, সে কমলাকে বিবাহ করিবে। পথে কোন বাধা নাই। কমলাদের পরিবারের প্রত্যেকের সস্নেহ অথচ সম্ভ্রমপূর্ণ আচরণ বলিয়া দেয়, নরেশ সকলের কত কাম্য। সে কমলার মনের কথা জানিবার চেষ্টা করিয়াছে। যদিও তার মনে সন্দেহমাত্র নাই যে, তার প্রতি কমলার অনুরাগ জন্মিয়াছে, তথাপি সে নানারূপে তার মন জানিতে চাহিয়াছে। কিন্তু কমলা বড় চাপা। হোক চাপা, তার ব্যবহার ত অনুকূল। সত্যই কমলার মনে যদি তার স্থান না থাকিত, তা হইলে কমলা নিশ্চয় তাকে সহ্য করিতে পারিত না। নরেশ আর দেরী করিতে পারিতেছে না। কমলাকে গৃহলক্ষ্মী করিবার জন্য তার আগ্রহ যেন দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে। তার দেরী করার মূলে অবশ্য সে নিজে। তাকে কেহ বাধা দেয় নাই। কেহ বলে নাই, কমলার বিবাহ অমুক সময়ের পূর্ব্বে হইবে না। বরং সকলে এই ভাবই দেখাইয়াছে যে, তারা কমলার বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইয়াই আছে। যোগ্য পাত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেই হয়। অর্থাৎ

নরেশের ইচ্ছা প্রকাশ হইবামাত্র তার পূরণে দেরী হইবে না। দেরী করার জন্য দায়ী নরেশ নিজে। কমলাকে বিবাহ করিবে কি না ইহা ঠিক করিতে তার সময় লাগিয়াছিল। নরেশ ভাবিয়াছিল, অন্য কোন কোন মেয়ের মত কমলার সহিতও বিবাহের পূর্ব্বে, এমন কি, বিবাহ না করিয়াও, ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারিবে। কমলা তাকে ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর হইবার স্থযোগ দিবে। এ পর্য্যন্ত ইহাই হইয়াছে নরেশের অভিজ্ঞতা। এক্ষেত্রেও তা[illegible] আশ্চর্য্য হইত না, বরং স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিত। এমন কি, সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, কমলার আত্মীয়গণ এ বিষয়ে অপূর্ব্ব উদারতা দেখাইয়াছেন। যখনই নরেশ কমলার নিকট আসে, তখনই তাঁরা উভয়কে একত্র থাকিবার যথেষ্ট স্থযোগ দেন। কিন্তু স্থন্দরী ও বুদ্ধিমতী কমলা এ কি অস্বাভাবিক আচরণ করিতেছে! নরেশ কমলার সংস্পর্শে আসিয়াছে, কত না সময় অতিবাহিত করিয়াছে, তথাপি ঘনিষ্ঠ হইবার স্থযোগ পায় নাই। তাই ত নরেশের রোখ চাপিয়া গিয়াছে। একথা অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য এবং নরেশের পক্ষে লজ্জাজনক হইলেও সত্য যে, আজই কমলার মাথায় সে প্রথম হাত রাখিল। তাও কমলা অসংবৃত ছিল বলিয়া, এবং মুহূর্ত্তের জন্য। তারপর কমলা নিজেকে ছিন্ন করিয়া লইয়াছে। আশ্চয্য! কমলার ব্যবহার নরেশকে আরও বেশী আকর্ষণ করিয়াছে। জীবনে যে সকল মেয়েকে সে সহজে জয় করিয়াছিল, তাদের কাহারও প্রতি কোন দিন সে এমন আকর্ষণ অনুভব করে নাই। কমলা নরেশের সহিত মোটেই অনাত্মীয়ের মত ব্যবহার করে না, তা স্বীকার করি, কিন্তু সে ত আত্মীয়ের মত ব্যবহার চায় না, পরমাত্মীয়ের মত ব্যবহার চায়। কমলার এই অপূর্ব্ব সংযম,—হাঁ, নরেশ ইহার আর কোন নাম দিতে পারে না, কারণ নারীর পক্ষে নরেশের মত প্রচণ্ড আকর্ষণের বস্তু সম্মুখে থাকিতে যে স্থির রহে, তার সেই গুণকে সংযম ছাড়া আর কি নাম দেওয়া যাইতে পারে?—কমলার এই অপূর্ব্ব সংযম তাকে এক দুর্লভ শ্রী দান করিয়াছে। সেজন্য কমলার সম্বন্ধে নরেশের দৃষ্টি অনেক বদলাইয়া গিয়াছে। কমলার শরীরের প্রতি ভাঁজ, প্রতি

রেখা, জানাইয়া দেয়, সে কত সুকোমল। তার সমগ্র শরীর যেন দেবতার জন্য উৎসর্গীকৃত এক মুঠা ফুল। সেদিকে তাকাইলে আর চোখ ফিরাইয়া লওয়া যায় না। ইচ্ছা করে বুকের মধ্যে চাপিয়া উহার কোমলতা মর্ম্মে মর্ম্মে উপভোগ করি। কিন্তু হায়! সেই ফুলের মধ্যে এমন বজ্রকাঠিন্য ছিল কে জানিত? কমলা নিজেকে রক্ষা করিবার কৌশল ভাল করিয়া আয়ত্ত করিয়াছে। সে সেই জাতের [illegible] যে নিজে ধরা না দিলে, সাধ্য নাই কেহ তার কেশ স্পর্শ করে। অথচ সে নিজেকে কাহারও নিকট হইতে দুর্লভ করিয়া লুকাইয়া রাখে না। দিব্য সহজভাবে সকলের সঙ্গে মিশিতে পারে। কমলা বোধ হয় সেই জাতের মেয়ে যে বিবাহের পূর্ব্বে কোন পুরুষ মানুষকে এতটুকু সুবিধা দিতেও রাজী নহে। কমলা যেন সম্রাজ্ঞীর মহিমাময় আসনে স্বগর্ব্বে প্রতিষ্ঠিতা। নরেশকে নিজের কাছে স্বীকার করিতে হইল যে, অন্তত কমলা তার মনকে এমনভাবে নাড়া দিয়াছে যে, সে নারীর সম্বন্ধে এতদিন যা বুঝিয়াছে, তা নূতন করিয়া ভাবিবার সময় আসিয়াছে। হয়ত সব স্ত্রীলোককে এক শ্রেণীতে ফেলা যায় না।

কমলাতে তার প্রতি কোন প্রকার বিরূপতা লক্ষ্য না করুক, নরেশ ইহা লক্ষ্য করিয়াছে, সে কমলাকে যত নিকটতর করিতে চায়, কমলা যেন তত দূরে সরিয়া যায়। রমেনের কথা নরেশের কখনও মনে হয় না, এমন বলিতে পারি না। কিন্তু কমলার চরিত্রের উপর তার কেমন একটা ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছে। এ মেয়ে সহজলভ্যা নহে। ইহার নিকট সম্ভবত রমেন বা নরেশ বা আর কারও কোন পার্থক্য নাই। কমলা বোধ হয়, সেই ধরণের নারী যে নিজ স্বামীর নিকট ছাড়া আর কাহারও নিকট ধরা দিবে না, নিজ স্বামীকে ছাড়া আর কাহাকেও ভালবাসিবে না। আগে এই কথা মনে হইলে নরেশের কৌতুক বোধ হইত। এমন কি, নারীর সাধুতা সম্বন্ধে সে পূর্ব্বে অনেক কটূক্তি করিয়াছে। বলিয়াছে, উহা ভাঙ্গাই আমার পণ। কিন্তু কমলার ধরণ ধারণ ভিন্ন। নরেশের ঐশ্বর্য্যে সে মুগ্ধ হইতে পারে, কিন্তু চেতনা কখনও হারায় না। এত বড় ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন সে কেমন হেলায় জয় করিয়া রাখিয়াছে! সেইজন্য নরেশ ভাবে, এই ঐশ্বর্য্য

তাকেই মানাইবে ভাল। রমেনের সহিত কমলার ব্যবহার হৃদ্য। মনে হয় যেন নরেশের চেয়ে রমেনের উপর তার পক্ষপাতিতা আছে। হয়ত আছে। রমেন যদি নরেশের ন্যায় অথবা কিছু কম অর্থবান্ হইত, তা হইলে কমলা সম্বন্ধে নরেশের কোন ভরসা থাকিত না। ভগবান্‌কে ধন্যবাদ, রমেন দরিদ্র ও কমলাকে পাইবার আশা রাখে না। রমেনের হৃদয়ের কথা নরেশ আর ভাবে না। এখন এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, আর ভাবিবার সময় নাই। যদি রমেনের প্রতি কমলার কোন পক্ষপাতিতা থাকে, থাকুক। তা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। কারণ কমলাকে সে যতটুকু চিনিয়াছে, তাতে ইহা জানে বিবাহের পর কমলার হৃদয়ে রমেনের কোন ছাপ থাকিবে না। এখনও নাই। উহাদের যে মনোরম বন্ধুতা দেখা যায়, তার মধ্যে দোষের কিছু নাই। তার কারণ বোধ হয় এই যে, নরেশের ঢের আগে রমেনের সহিত কমলার পরিচয় হইয়াছে।

কিন্তু আজ কমলা কাঁদিতেছে কেন? এই সুন্দর গ্রীষ্ম সন্ধ্যায়, যখন মৃদু মৃদু বাতাস বহিয়া মন শীতল করিতেছে, শরীর জুড়াইতেছে, যখন নরেশের পক্ষে ঘরে বসিয়া থাকা অসম্ভব হইল, যখন বাহিরে বেড়াইয়াও স্বস্তি পাইল না বলিয়া কমলাদের বাড়ীর দিকে পা বাড়াইল, তখন নরেশ কমলার কোন্ মূর্ত্তি দেখিবে কল্পনা করিয়াছিল? নিশ্চয়ই সে মনে করে নাই, কমলাকে ক্রন্দনরতা দেখিবে। তার মাথায় হাত রাখামাত্র কমলা মুখ তুলিয়া চাহিল, তখনও তার সুদীর্ঘ পক্ষ্ম বাহিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতেছে। যেন মুক্তাবিন্দু গড়াইয়া পড়িতেছে। আ মরি, মরি! এই শোভা যে না দেখিয়াছে, সে বুঝিতে পারিবে না। যে দেখিয়াছে সেই মজিয়াছে। নিত্য হাস্যময়ী কমলা। আকাঙ্ক্ষিত কিন্তু পরিচিত সেই রূপ। ক্রন্দনময়ী কমলা যেন অন্য এক রূপসী। এ রূপও কত লোভনীয়, নরেশ তা জানিত না। আর এই মূক ক্রন্দন, ইহার জন্য কমলাকে যেন আরও সুন্দরী ও লাবণ্যময়ী মনে হইতেছে। কোন কোন মানুষকে দুঃখ অপরূপ মহিমা দান করে।

কমলার অশ্রু কমলার লাবণ্য বাড়াইয়াছে। নরে[illegible]র পক্ষে কমলা মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইল। নরেশের ইচ্ছা করিল, চুম্বনে চু[illegible] উহার অশ্রুবিন্দু মুছাইয়া দেয়। ইচ্ছা করিল, উহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া [illegible]রিয়া সান্ত্বনা দেয়। তার দুঃখের ইতিহাস নাই জানা থাকিল, তবু সে সান্ত্বনা দিতে পারে। তার প্রশস্ত বুকে নিশ্চয় কমলার স্থান আছে। কিন্তু হায়, নারী[illegible]সম্বন্ধে চিরকাল বীর নরেশ [illegible] স্পর্শ করিতে সাহস করিল না। মাথায় [illegible]াত দিয়াছিল, কমলা মাথা সরাইয়া লইয়াছে। অত্যন্ত স্নেহে, ব্যগ্রকণ্ঠে, জি[illegible]সা করিল, 'কমলা, কাঁদ্‌ছ!' কমলাকে আপনি সম্বোধন করিতে আর ভাল লা[illegible] না। সুতরাং তা পরিত্যাগ করিয়াছে।

কমলা ইচ্ছা করিলে কান্নার কথা চাপা [illegible]তে পারিত। কারণ, সে বিষয়ে কমলা কিছু বলিতে না চাহিলে, নরেশে[illegible]পক্ষে কিছু জানা সম্ভবপর হইত না। কিন্তু কমলা ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিল, [illegible]া, সে কাঁদিতেছে।

নরেশ পূর্ব্ববৎ স্নেহমাখা স্বরে জা[illegible]তে চাহিল, 'কেন?'

দেখ, স্পর্দ্ধা দেখ। প্রথমত[illegible]লোকটি চোরের মত কমলার এই অতি পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে। কমলা প্রস্তুত হইবার ও নিজেকে সাম্‌লাইবার অবসর পায় নাই। কমলা কাঁদিতেছে, কমলার খুসী। তার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার নরেশ কে? আচ্ছা, ধরিয়া লইলাম, দুদিন পরে নরেশের সঙ্গে বিবাহ হইবে। কিন্তু তার আগের জীবনও কি সে নিজের জন্য রাখিতে পারিবে না? নরেশ কোন্ অধিকারের বলে তার এই কান্নার কারণ জানিতে চায়? কিন্তু বেচারা নরেশেরই বা দোষ কি? নরেশকে আজ এই স্থানে উপনীত করিয়াছে তারই বাপ-মা। তাঁদেরও সে বেশী দোষ দিতে পারে না। তাঁরা ত তার মনের কথা জানেন না। মনের কথা জানিয়া কিছু করিতেন কি না, তা ভাবিয়া লাভ নাই। ইহা সত্য কথা, সে তার মনের গোপন ভালবাসা, রমেনের প্রতি তীব্র ভালবাসা, তাঁদের জানায় নাই। নরেশও জানে না। নরেশ কোন অভদ্র আচরণ করে নাই, অভদ্র সুযোগ গ্রহণ করে নাই। নরেশের সংযম

প্রশংসনীয়। সুতরাং কমলা তার প্রতি সৌজন্য ও ভদ্রতাপূর্ণ ব্যবহার ছাড়া অন্য ব্যবহার করিতে পারে না।

সুতরাং কমলা নরেশকে সাদরে বসাইয়া নিজে মুখচোখ ধুইয়া আসিল। ততক্ষণে ম্লান ঔজ্জ্বল্যে কমলার চেহারার আবার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সে ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই বেশভূষারও একটু সংশোধন করিয়া আসিয়াছে। আসিয়াই প্রথমে সে নরেশের নিকট ত্রুটির জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা চাহিল, ~~তারপর~~ জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন কাঁদ্‌ছিলাম, শুনবেন?' দিব্য সপ্রতিভ ভাব।

নরেশ জিজ্ঞাসু নেত্রে তার দিকে তাকাইল।

'মনে বড় দুঃখ পেয়েছিলাম।'

নরেশ হাসিল, অর্থাৎ তুমি ত সবটা বলিলে না। মুখে বলিল, 'বিনা দুঃখে কেউ কাঁদে না, জানি। কিন্তু সে দুঃখ, গভীর দুঃখ,—'

'গভীর নাও হতে পারে।'

'আচ্ছা দুঃখ—'

'আমার কাছে যা দুঃখ, অন্যের কাছে, আপনার কাছে, তা হাসিব জিনিষ মাত্র হতে পারে।'

'শুন্‌লে বুঝা যাবে, সত্যি হাসিব জিনিষ কি না। ততক্ষণ অন্তত এইটুকু বল্‌তে দাও যে, সে দুঃখ না জানি কি, যার জন্য কমলা হেন মেয়ে কাঁদ্‌তে পারে।'

'কেন, কমলার কাঁদাটা কি এতই অসম্ভব ব্যাপার না কি? সেও ত মানুষ।'

'নিশ্চয়। কিন্তু আমার চোখে তার কান্না এই প্রথম।'

কমলা লজ্জায় চুপ করিযা রহিল।

নরেশ বলিল, 'তা বলে আমি মনে করি না, তোমার লজ্জা পাবার কোন কারণ আছে।'

কমলা লজ্জিত ভাবেই জবাব দিল, 'যখন দেখে ফেলেছেন, তখন আর উপায় কি ?'

'কিন্তু দেখে ফেলাতে তুমি কি খুব অসন্তুষ্ট হয়েছ ? আমার কোন দোষ ছিল না—'

'আমি ত আপনাকে দোষ দিচ্ছি না।'

'আমাকে ধন্যবাদ দিবার কোন কারণ নাই।'

'আচ্ছা, সে আমি বুঝ্‌ব। এখন জান্‌তে পারি, কান্না কেন ?'

'একজনরা আমায় অপমান করেছিল।'

'কারা ?'

'মাপ করুন, আমি তাদের নাম বল্‌তে পারব না।'

নরেশ বোধ হয় একটু আহত হইল। কমলা যেমন অন্তরঙ্গ ভাবে আলোচনায় যোগ দিয়াছিল, তাতে সে আশা করিয়াছিল কমলা সরলভাবে সব কথা খুলিয়া বলিবে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'তোমাকে কেউ অপমান কর্‌তে পারে, ভাব্‌তে পারি না।'

কমলা ছেলেমানুষের মত খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল, 'কেন, আমি কি ? শোন কথা, আমাকে না কি কেউ অপমান করতে পারে না!' কমলা প্রচুর হাসিতে লাগিল।

নরেশ কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া বলিল, 'আমি একশ বার বল্‌ব, পারে না।'

'আর আমি একশ বার বল্‌ব, পারে। পেরেছে। এই ত আজ করেছে।'

'আহা! অপমান ত মানুষ ভগবান্‌কেও কর্‌তে পারে, রাজাকেও কর্‌তে পারে।'

'রাজাকে কর্‌লে শাস্তির ব্যবস্থা আছে।'

'কিন্তু ভগবান্‌কে কর্‌লে মুখ চেপে ধর্‌বার কেউ নাই।'

'তা জানি না। অন্য পৃথিবীতে না হোক পরলোকে হয়ত শান্তি পেতে হবে।'

'আমিও ঠিক জানি না।'

'কিন্তু আমাকে অপমান করে কেউ যে শান্তি পাবে না, তা ঠিক।'

'রাজাকে বা ভগবানকে যেমন কেউ অপমান করতে পারে না, আমি সেই অর্থে বলেছিলাম, তেমনি কেউ অপমান করতে পারে না।'

'আমি ত রাজা নই।'

'না, তুমি রাণী।'

'আমি রাণীও নই।'

'তুমি আমার রাণী। আমার হৃদয়ের রাণী।' বলিয়া নরেশ আবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। আজ শুভ মুহূর্তে, শুভ সুযোগে, তার মুখ দিয়া বাণী বাহির হইয়াছে। এ জন্য তার বুদ্ধিকে ধন্যবাদ। সে সম্পূর্ণ সচেতন। সে জানে, সে কার কাছে এই কথা বলিতেছে। সুতরাং সে বাড়াবাড়ির চেষ্টামাত্র করিল না। শুধু কমলার দিকে চাহিয়া রহিল।

আজিকার কান্নার পরিণতি এইরূপ হইবে, কে জানিত? কমলা যদি একটু আগেও জানিতে পারিত, নরেশ কোন্ লক্ষ্যে চলিয়াছে, তা হইলে ছুটিয়া ঘর হইতে পলাইয়া যাইত। কিন্তু এখন বড় দেরী হইয়া গেছে। কমলার মনে হইল, এত দেরী সে কেমন করিয়া করিল? নরেশ এমন কথা উচ্চারণ করিল, অথচ সে কিছুমাত্র বাধা দিল না, এর চেয়ে আশ্চয্য জিনিষ আর কি আছে? হয়ত মানুষের কথার মোহিনী শক্তি অনন্ত। হয়ত মানুষ মনে করে, যে কথা সে কখনও শুনিবে না, শুনিলে বক্তাকে প্রচণ্ডভাবে তিরস্কার করিবে, কায্যকালে সেই কথা কান পাতিয়া শোনে; এমন কি, হয়ত তার ভালও লাগে। একটু আগে, এই ঘরে বসিয়া কমলা যখন কাঁদিতেছিল, তখন সে ত রমেনের জন্য তার সমগ্র হৃদয় পাতিয়া বসিয়াছিল। নরেশের সাধ্য ছিল না সেখানে প্রবেশ করে। নরেশের সাধ্য ছিল না, কমলার হৃদয়-দ্বার

আঘাতে খুলিয়া দিবে। কিন্তু নরেশ যেমন নি[illegible]দ পদসঞ্চারে তার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, তেমন নিঃশব্দে তার [illegible]দয়ে প্রবেশ করিল। এই প্রথম। এই প্রথম কমলা নরেশের দিকে [illegible]হিয়া দেখিল। তার প্রতি রমণীসুলভ করুণা বা আর কিছু অনুভব ক[illegible]ল, বুঝিতে পারিল না। নরেশের অতুল ঐশ্বর্য্য যা করিতে পারে না[illegible], পিতা মাতা ভ্রাতার [illegible] যা সম্ভবপর করিয়া তুলিতে পা[illegible]রে নাই, কমলার তা হইল। আজ সে প্রথম মনে করিল, নরেশের প্রতি হয়ত সে সুবিচার করে নাই, এবং, তার যেমন সকলের নিক[illegible] সুবিচার পাইবার অধিকার আছে, নরেশেরও নিশ্চয় তেমন আছে। [illegible] যে কেবলই তাকে অন্তর হইতে দূর করিয়া দিতেছে, মনে মনে অব[illegible]া করিতেছে, ইহার ত কোন প্রয়োজন ছিল না। বস্তুত নরেশকে সে কোন দিন ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করে নাই। তাকে জানিবার ব[illegible] বুঝিবার চেষ্টা করিলে আর কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত না। বরং মানুষের প্রতি মানুষের সহজ শ্রদ্ধা সর্ব্বদা কাম্য। নরেশের [illegible]র্থ আছে, তা ত দোষের বিষয় নয়। আর ধনীর পুত্র হইয়া জন্মানতে তার ত কোন হাত ছিল না। তার জন্য তাকে অপরাধী করা যায় না। আর কমলা সত্য সত্যই কি ঐশ্বর্য্যকে অবজ্ঞা করিতে পারে? দারিদ্র্যের সহিত জীবন যাপন করা আদর্শের দিক্ দিয়া যাই হোক, আদরে লালিতা কমলা কি সর্ব্বদা তা সহ্য করিতে পারিবে? জীবনকে সুখময় করিবার জন্য প্রচুর অর্থ নিশ্চয় চাই। সুতরাং নরেশ যদি অন্য দিকে কোন প্রকার ন্যূন না হয়, তা হইলে তাকে হেলাফেলা করা ত কমলাব উচিত নয়। নরেশের কথা ভাবিলে অনুকম্পা হয় বৈ কি। পথের ভিখারীর মত, কাঙ্গালের মত, সে যেন কমলাকে সাধিয়া ফিরিতেছে। আজ তার স্বরে কি কাতরতা ও ঐকান্তিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে! অথচ তার অপূর্ব্ব সংযমের জন্য তাকে যথোচিত মান দিবে না, এমন মেয়ে কমলা নয়।

কমলার চোখে যে কোমল আভা ফুটিয়া উঠিল, নরেশ তখনকার মত তাতেই কৃতার্থ হইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

নরেশ চলিয়া গেলে কমলা আবার আগের মত টেবিলে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। চোখে তার জল নাই। এ কমলা যেন সে কমলা নয়। সে কি আজ নরেশকে উৎসাহ দিয়াছে? আজ কমলাকে কি ভূতে পাইয়াছিল, কে জানে। তাই সে নরেশ সম্বন্ধে এমন কথা ভাবিতে পারিয়াছিল, যে জন্য এখন লজ্জা বোধ করিতেছে। হয়ত ঐশ্বর্য্যের প্রতি কমলার আকর্ষণের অভাব সত্য নয়। প্রত্যেক নারীর মধ্যে ঐশ্বর্য্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা হয়ত এত তীব্র যে, তার কাছে তার সমস্ত মহত্ত্ব ভাসিয়া যায়। এ জন্য যদি দোষ কাহাকেও দিতে হয়, তা হইলে নারীর বিধাতাকে দাও। কিন্তু এক্ষণে কমলার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে যে রমেনের ছাড়া আর কারও চিন্তা মনে স্থান দিতে পারে, তা বিশ্বাস করিতে পারিত না। মানুষের মনকে, বিশেষত নারীর মনকে, বিশ্বাস করিতে নাই। কমলা দেখিতেছে, তার মনও যখন টলে, তখন আর ভরসার স্থল কোথায়? কমলার মনে নিজের সম্বন্ধে এই গর্ব্ব ছিল কি যে, তার আদর্শ হইতে সে তিলমাত্র বিচ্যুত হইবে না? তাকে কেহ বিচ্যুত করিতে পারিবে না? সম্ভবত ছিল, এবং এখন সেই গর্ব্ব বিশেষভাবে আহত হইল। তার সহিত যেন অন্য দশজন রমণীর আর কোন পার্থক্য রহিল না। আজ কে যেন তাকে সকল সাধারণ নারীর সহিত ধূলায় মিশাইয়া দিয়াছে। কি কষ্ট! কি অপমান! এখন তার মনে হইতে লাগিল, বেলা ও শীলা যে তাকে অপমান করিয়াছে, ঠিকই করিয়াছে। এখন সে নিজেকে তদপেক্ষাও অধিক অপমান করিতে থাকিল। নিজেকে নিজেই চাবুক মারিল। শয়তান দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সুযোগ পাইবামাত্র প্রবেশ করিয়াছে। সময় থাকিতে সাবধান হইতে হইবে। রমেন তার একমাত্র উপাস্য দেবতা। কমলার হৃদয়ে তার দেবতা ছাড়া

আর কারও স্থান নাই। সেখানে নরেশ কে? অন্যেরাই বা কে? না, না, কমলার নিকট সমস্ত জগৎ রমেনময় হইয়া রহিয়াছে। রমেন বহু পূর্ব্ব হইতে কমলার হৃদয়-মন অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। নরেশ বা আর কারও সাধ্য কি তা দখল করে? কমলাকে হয়ত তার দেবতার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে সে অনন্ত কাল ধরিয়া অপেক্ষা করিবে।

নরেশ বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, রমেন তার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। নরেশের মুখচোখ আনন্দে দীপ্ত। সে আনন্দে ও লজ্জায় রমেনকে আলিঙ্গন করিল।

রমেন এই আলিঙ্গনের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া নরেশের মুখের দিকে চাহিল।

নরেশ সংক্ষেপে বলিল, 'এই মাত্র কমলাদের বাড়ী থেকে আসছি।'

ধীরে রমেনের মনে একটা আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। আজ হয়ত নরেশ কমলাকে সম্পূর্ণ জয় করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। অনেক দিন যাবৎ সে নরেশ-কমলার সম্পর্ক লইয়া কোন খোঁজ করে না। সে যেন ভবিতব্যের হাতে হাল ছাড়িয়া দিয়াছিল। ভবিতব্য এই যে, নরেশ একদিন না একদিন কমলাকে বিবাহ করিবে। সে দিন দূর না হইয়া নিকট হওয়াই সম্ভব; এবং একথা শুনিলেও সে আশ্চর্য্য হইবে না যে, কমলা বিবাহের পূর্ব্বে সম্পূর্ণরূপে নরেশের হইয়া গিয়াছে, নরেশকে আত্মদান করিয়াছে। কারণ নরেশের জীবনের সাধনা এই যে, সে সর্ব্বত্র সিদ্ধিলাভ করিবে। নরেশ প্রত্যেক নারীকে তার পায়ে লুটাইয়া পড়িতে বাধ্য করিয়াছে। কমলার বেলাতেও ব্যতিক্রম না হওয়াই সম্ভব। সত্য বটে, সে একদিন নরেশের সঙ্গে তর্ক করিয়াছিল, শাড়ী, বাড়ী, গয়না, গাড়ী দ্বারা আকৃষ্ট হইবার মত মেয়ে কমলা নয়, এবং কমলাকে দেখিয়া নরেশ তার পূর্ব্ব ধারণা বদলাইবে, কিন্তু এখন রমেনের আর সে বিষয়ে কোন আগ্রহ নাই। অন্তত সে মনে করে, তার মন কমলা সম্পর্কে নিস্পৃহ হইয়া গিয়াছে। না, মনে করে না, ভাবিতে চেষ্টা করে।

বস্তুত, কমলাকে মন হইতে দূর করিয়া দেওয়া রমেনের পক্ষে অসম্ভব। পরন্তু সে যত চেষ্টা করে, তত, কমলা যেন তার মনের মধ্যে শিকড় গাড়িয়া বসে। আজও সে মনের মধ্যে এই কথা ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারে না, তার কমলা আর কারও হইবে। এই জন্য সে অবিরত নিজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে। এই সংগ্রাম তার পক্ষে মর্ম্মান্তিক। তার উপর এ সম্বন্ধে তার প্রতি পরিবারের ব্যবহার এবং কমলার প্রতি অসৌজন্যপূর্ণ আচরণ সেই সংগ্রামকে আরও তীব্র করিয়া তুলিয়াছে। সে যেন কোথাও পলাইতে পারিলে বাঁচে। বস্তুত, সে অন্যত্র যাইবার চেষ্টায় ছিল। সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে এমন ভাবে তার আর দিন চলে না। তথাপি নরেশের কথায় তার মুখে কাল ছায়া পড়িল।

নরেশ লক্ষ্য করিল না। লক্ষ্য করিবার মত সময়ও হয়ত তার ছিল না। চিরকাল যেমন জোর দিয়া কথা বলা তার অভ্যাস, তেমনই কথা বলিতে লাগিল। আর রমেন স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। বলিবার কথা বিশেষ কিছু ছিল না। এইটুকু যে, কমলার কাছে সে নিজের মনোভাব প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। বলিতে পারিয়াছে যে, কমলা তুমি আমার হৃদয়ের রাণী। কথা নূতন নহে। হয়ত ইহার পূর্ব্বে সহস্র লোক সহস্রবার এই কথা বলিয়াছে এবং নানা প্রকারে বলিয়াছে। হইলেই কি হয়? নরেশের অভিজ্ঞতা ত তাদের অভিজ্ঞতা নয়। নরেশ নিজ অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছে। রমেন একবার এই ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইল যে, রমণী সম্পর্কে যে নরেশের অবিচলতা পর্ব্বতের মত ছিল, সে নরেশকেও যেন কমলা কাবু করিয়াছে। যে নরেশ স্ত্রীলোককে সর্ব্বদা নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব বলিয়া মনে করিতে অভ্যস্ত, সে কমলার কথা বলিতে বিশেষ শ্রদ্ধা অনুভব করিতেছে।

রমেন শুনিল মাত্র। এই উপলক্ষ্যে যে বিশেষ কিছু বলিবার বা করিবার ছিল, তা নয়। নরেশের প্রয়োজন ছিল, আজিকার আনন্দের সংবাদ কাহাকেও দেওয়া। সম্মুখে রমেনকে পাইয়া রমেনকেই শুনাইয়া দিল। আর

কাহাকেও পাইলে তাকে শুনাইত। কারণ, নরেশের মত খোলা-স্বভাব লোকের পক্ষে নিজের কথা বলিবার জন্য লোক বাছবার প্রয়োজন হয় না। নরেশ বলিল, 'ভাই, আমি মন স্থির করে ফেলেছি।'

'কি ?'

'যে শীগ্‌গিরই কমলাকে বিবাহের প্রস্তাব কর্ব।'

'কৃতজ্ঞ হলাম। তা হলে তুমি বাস্তবিকই কমলাকে বিয়ে করতে চাও, তাকে মাত্র জয় করতে চাও না ?'

'তা সম্ভব নয়, রমেন। তাকে আমি যখন সত্যি চাই, বিয়ে করতে আপত্তি কি ?'

যেন রমেন আপত্তি করিতেছে। রমেন বলিল, বিবাহ নিশ্চয় সঙ্গত কার্য্য হইবে। কিন্তু নিজ মনে নিশ্চিত বুঝিতে পারিল না, নরেশের কথা কতদূর সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে। নরেশের নিকট কমলার পরাজয় হইয়াছে কি না, তা বুঝিবার উপায় নাই। আর এ সম্বন্ধে নিস্পৃহ হইবার চেষ্টা করিয়াও রমেন নিস্পৃহ হইতে পারে না।

নরেশ তখন প্রস্তাব করিল যে, নরেশের বিবাহের প্রস্তাব রমেনই কমলার পিতামাতার নিকট পাড়িবে। নরেশের নিজ আত্মীয়-স্বজন এমন কেহ নাই যাকে সে এই গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারে। অন্য বন্ধু-বান্ধব অপেক্ষা এ বিষয়ে যে রমেনের যোগ্যতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাতে সন্দেহ নাই। ইহাকেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস। কমলা, তার প্রিয়তমা কমলা, তার বিবাহ-প্রস্তাব করিতে হইবে রমেনকে! রমেন অনেক সহ্য করিতেছে, ভবিষ্যতেও করিবে, কিন্তু এই উপহাস সহ্য করিবে না। রমেন বলিল, অন্য পাত্র হইলে তার বিবাহের জন্য অভিভাবক প্রয়োজন হইত, কিন্তু নরেশ নিজে যখন পাত্র, তখন দ্বিতীয় আর কোন ব্যক্তি তার বিবাহের প্রস্তাব লইয়া গেলে সঙ্গত হইবে না। বিশেষত, রমেন যখন তার আত্মীয় নহে। সুতরাং—

কিন্তু নিজে উপযাচক হইয়া কথাটা বলিতে যাওয়া অশোভন নহে কি ?

মোটেই না। রমেনের মতে, ইহাতে কমলার পিতা অধিকতর সন্তুষ্ট হইবেন। তারপর, তারা প্রতিবেশী হইলেও এবং কমলার সহিত তাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া থাকিলেও, রমেনকে কোন ক্রমেই কমলার অভিভাবক স্থানীয় জ্ঞান করা যাইতে পারে, না। পরন্তু, তা কমলার অভিভাবকদের অসন্তোষের কারণ হইতে পারে।

রমেন কি তাই মনে করে ? নরেশ অবশ্য কমলার পিতাকে অসন্তুষ্ট করিতে চায় না। নিজে প্রস্তাব করিতে একটু লজ্জা করে বৈ কি। সে ভাবিয়াছিল, রমেনকে বলিব মাত্র সে রাজী হইবে। এ বিষয়ে রমেনের কোন বাধা ছিল, সে জানিত না।

কোন বাধা নাই, কিন্তু সুসঙ্গতির দিক্ হইতে রমেন নিষেধ করিতেছে। আশা করা যায়, নরেশ কিছু মনে করিবে না।

বলা বাহুল্য, রমেন অস্বীকৃত হওয়ায় নরেশ খুব খুসী হইল না। তার যে অস্বীকারের কোন কারণ থাকিতে পারে, ইহা মনে করিতে নরেশের ভাল লাগিল না। অবশ্য পিছপাও হইবার ছেলে নরেশ নয়। সফলতা তার ললাটে লেখা আছে।

নরেশ প্রস্তাব করিল, সিনেমায় গিয়া রোমিও-জুলিয়েট দেখা যাক্। নরেশ জানিত, বায়োস্কোপ জিনিষটা রমেন মোটেই পছন্দ করে না। সাধারণত, সিনেমার যে সকল দোষগুণের কথা লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, রমেন সে সকল যুক্তি দেখাইত না। তার যুক্তি অন্য রকম। সে বলিত, সিনেমা চোখ, কান ও অন্য সমুদয় ইন্দ্রিয়কে পঙ্গু করিয়া দিতেছে। তার সর্ব্বাপেক্ষা বড় নালিশের বিষয় এই যে, মানুষের কল্পনা-শক্তি ও পাঠ-শক্তির হ্রাস ঘটিতেছে উহার কল্যাণে। একটি ভাল বহি বাহির হইল। উচিত, সকলের তা পড়া। কিন্তু আজিকার দিনে মানুষের পাঠ-স্পৃহা কম। তার উপর সে যদি সিনেমার সাহায্যে গল্পটা জানিতে পারে, তা হইলে

ত কথাই নাই। সে বইও কিনিবে না, পড়িবে না। ইহাতে বেচারা লেখকের যত ক্ষতি হোক বা না হোক, পাঠকের যে নৈতিক ক্ষতি হইল, তা নিবারণ করিবার কোন উপায় থাকে না। হাঁ, নৈতিক ক্ষতি ভিন্ন ইহাকে আর অন্য কোন নাম দেওয়া চলে না। কোন গ্রন্থের নৈতিকতা সে বাজার দরে যাচাই করিতেছে না। বর্তমান সাহিত্যের শ্লীল বা অশ্লীল প্রশ্ন লইয়া সে মাথা ঘামাইতে রাজী নহে। উহা অনাবশ্যক। কিন্তু পড়িবার প্রবৃত্তিকে নষ্ট করাকে সে বিশেষ অপরাধ বলিয়া জ্ঞান করে। তার হাতে ক্ষমতা থাকিলে সে আইন করিয়া সিনেমা গৃহগুলি উঠাইয়া দিত। যদি এইরূপ বলা যায় যে, সিনেমার সাহায্যে বহু লোক শ্রেষ্ঠ লেখকদের লেখার সহিত পরিচিত হইতেছে, নহিলে লক্ষ লক্ষ লোক—যাদের না আছে সময়, না শক্তি—এই অপূর্ব্ব রস হইতে বঞ্চিত হইত, তা হইলে রমেনের উত্তর এই : সিনেমা যদি যথার্থভাবে শ্রেষ্ঠ লেখার সহিত জনগণের পরিচয় করাইয়া দিতে পারিত তা হইলে কিছু বলিবার ছিল না। দর্শনের অযোগ্য ছবির কথা সে না হয় নাই বলিল। কিন্তু ধর অ্যানা ক্যারেনিনা। কিংবা রোমিও জুলিয়েট। এই দুই বিখ্যাত গ্রন্থের সৌন্দর্য্যের শতাংশের একাংশও ফুটাইয়া তুলিবে, সিনেমার এমন সাধ্য আছে কি? পরন্তু, শেকসপিয়ার বা টলষ্টয়ের গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠায় যা নিবদ্ধ আছে, তাই সিনেমা প্রকাশ করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় উহা নিশ্চয় অনিষ্টকর। এ যেন না পড়িয়া পাশ করার মত। লক্ষ লক্ষ লোক কোন বিখ্যাত গ্রন্থকে বিকৃতভাবে জানিবে, তাতে মঙ্গল, না, প্রকৃত রসিক আসল জিনিসটির পরিচয় পাইবে, তাতে বেশী মঙ্গল? রমেন নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে, সিনেমা না থাকিলে প্রকৃত রসজ্ঞের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইত। তারপর, এমন কথা শোনা যায় যে, সিনেমার সাহায্যে লোক শিক্ষা লাভ করে, নানা বিধ কাজে উৎসাহ ও প্রেরণা পায়। রমেন স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়। গ্রন্থের মধ্যে নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে এক একটি

চরিত্র-চিত্র উদ্ঘাটিত হয়, প্রকৃত শিক্ষা বা উৎসাহ তা হইতেই লাভ করা যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ চিত্র দেখাইবার অবসর সিনেমার নাই। তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশী হইবার সম্ভাবনা। রমেন যে কখনও সিনেমা দেখে না, তা নয়। মনের ঘোর বিরূপতা সত্ত্বেও সে কখনও কখনও ভাল ছবি দেখিতে যায়। তাকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, প্রতি বার তাকে অত্যন্ত নিরাশ হইতে হয়। সে আশা করিয়া যায়, এইবার অন্তত লেখকের যথার্থ মনের কথাটি বলিবার চেষ্টা করা হইবে। কিন্তু হায়! সে চেষ্টা সে কোন দিন দেখিল না। সে সিনেমা দুচোখে দেখিতে পারে না, কিন্তু গল্প-উপন্যাস পড়িতে খুব ভালবাসে। খুব। বাস্তবিক, ভাল বই পড়ার এক অপূর্ব্ব স্বাদ আছে। যে একবার সে স্বাদের সন্ধান পাইয়াছে, তার কাছে সিনেমার মোহ আলুনী ঠেকে। নরেশ ও অন্যেরা ঠাট্টা করিয়া বলে, বেশী পড়িয়াছে বলিয়াই সে সিনেমা উপভোগ করিতে পারে না, তারা দিব্য পারে। রমেন নিজের দোষ কবুল করিয়া বলে, ভগবান্‌কে ধন্যবাদ যে, তার রুচি বিকৃত হয় নাই।

সিনেমার প্রতি একে রমেনের এই বিরূপ ভাব, তার উপর আজ সে রোমিও-জুলিয়েট দেখিতে যাইবার জন্য কোন প্রকার উৎসাহ অনুভব করিতেছিল না। নরেশের হয়ত আজ বিজয়োৎসব সম্পন্ন করিবার প্রয়োজন আছে। আজিকার দিন যদি সে জীবনে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিতে চায় এবং তজ্জন্য যা খুসী তাই করে, তা হইলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু বসিয়া বসিয়া রোমিও-জুলিয়েটের পরস্পরের প্রতি গভীর প্রেম-নিবেদন দেখিবার মত অবস্থা তার নয়। বরং সে একা ঘরে শুইয়া আপন মনে শেক্‌সপিয়ারের এই অমর নাটকের আবৃত্তি করিবে। একা। যেখানে তার নিজের বক্ষ-স্পন্দন শুনিবার জন্য দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি থাকিবে না। কমলাও না। তারা-ভরা অনন্ত আকাশ কত দিন সে দেখে না। অবিরত কাজের চাপে সে যেন জীবনের যা কিছু উপভোগ্য তা হইতে সরিয়া

যাইতেছে। শুধু কাজের চাপে নয়। সংসারের চাপেও বটে। তারা-ভরা আকাশের নীচে বসিয়া রমেন আবার নিজেকে অনন্ত নীলের মধ্যে হারাইয়া ফেলিতে চায়। আকাশকে তার নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে পারিলে সে সুখী হইবে। সেই আকাশ, যার সহিত তার অনেক দিনের অনেক কাহিনী জড়িত হইয়া গিয়াছে। সেই তারাগুলি, যাদের মধুর ছায়া অনেক দিন তার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। পিছনে ফেলা যৌবনের দিনগুলি! নানা রঙীন স্বপ্নে ঠাসা দিনগুলি! তাদের কথা মনে করিলেও তার মন কেমন করিয়া উঠে। আপনার সেই পরিচিত সুন্দর রূপ আজ সে কোথায় হারাইয়া ফেলিয়াছে। সে সাহস কৈ? সে প্রতিজ্ঞা কৈ? অভিজ্ঞতাই মানুষের বয়স বাড়াইয়া দেয়, দিন মাস বৎসর নহে। দারিদ্র্যের সঙ্গে, নিজ প্রিয়জনদের সঙ্গে, অবিরত সংগ্রামে রত রমেন যেন হু হু করিয়া কাল অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। কালজয়ী হইবার কোন অস্ত্র তার হাতে ছিল না। তাই এখন মাঝে মাঝে তাকে মৃত্যু-চিন্তা করিতে হয়। হাঁ, মানুষের এমন একটা বয়স আসে, যখন হইতে সে নিজের মৃত্যুর কথা ভাবিতে আরম্ভ করে। কারও আগে আসে, কারও পরে। রমেনের এই বয়সেই আসিয়াছে। এই কথা ভাবিয়া রমেনের হাসি পাইল যে, বিজয়ী নরেশ, প্রাণের তেজে পূর্ণ নরেশ, যখন প্রেমের ও প্রাণের স্তব করিতেছে, তখন সে মৃত্যুর কথা ভাবিতেছে। সংসার এমনি বিচিত্র বটে। এখানে সব লোকের, সব কথার, স্থান হয়।

নরেশ নিজেকে সংবরণ করিতে না পারিয়া, অথবা হয়ত সংবরণ করিবার জন্যই, রোমিও-জুলিয়েট দেখিতে গেল। আর রমেন আক্রান্ত চিত্ত লইয়া গুরুভারপদে গৃহে প্রত্যাগত হইল।

রমেন নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তা খালি। রণেন ফিরিয়া আসে নাই। আরাম বোধ করিল। সে কি এখন রোমিও জুলিয়েট খুলিয়া পড়িতে বসিবে? নরেশ সিনেমায় গিয়া যা উপভোগ করিতেছে, নিজ

ঘরের আলোতে তা বহু গুণ করিয়া উপভোগ করিবে? না। অন্তত, আপাতত নয়। সে বাতি নিবাইয়া দিল। তারপর ধীরে ধীরে আসিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইল। তারা-ভরা অন্ধকার আকাশ। রাত্রি বেশী হয় নাই, তথাপি আকাশ বাতাসে গ্রীষ্ম নিস্তব্ধতা। জলঝড় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তারই মাঝে মাঝে এই রকম রাত্রির পর রাত্রি। সেই রাত্রির আকাশ ছুঁইয়া, যেন তারালোকের দিকে চাহিয়া, কমলাদের বাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। যে বাড়ীতে কমলা থাকে, যেখানে সে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নিশ্বাস লয়, তার যেন এক নিজস্ব মর্য্যাদা আছে। বাতাসে কমলার ঘর হইতে কলহাস্যস্রোত ভাসিয়া আসিল। কমলার হাসি। বিনা চেষ্টায় রমেন কমলার স্বর চিনিতে পারে। আরও একটু সরু হইলে মিষ্ট বলা যাইত। অতি স্পষ্ট এবং অদ্ভুত মায়াময় এই স্বর। তুমি যতক্ষণ শুনিবে তোমাকে মোহাবিষ্ট করিয়া রাখিবে। এই স্বরে এমন একটা মাদকতা আছে যে, শুনিতে শুনিতে আপনার অজ্ঞাতে তুমি প্রফুল্ল হইয়া উঠিবে। হাঁ, রমেন কথাটা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। উহা সর্ব্বদা তাজা ও সরস। তুমি যে অবস্থায় থাক তোমায় সচেতন করিয়া দিবে। তার অপরূপ হাসির ধ্বনি যেন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের গান। ক্রমে ঊর্দ্ধে উঠিয়া মিলাইয়া যায়। কমলা কার সহিত হাস্য-পরিহাস করিতেছে? কান পাতিয়া শুনিল, রণেনের গলার স্বর ভাসিয়া আসিতেছে। উহাদের কি মধুর স্নেহের সম্বন্ধ! ভাবিলে তার মন স্নেহে বিগলিত হয়। আহা রণেন! ভাই রণেন! এমন ভাই সহজে মেলে না। ভগবানকে ধন্যবাদ, সে এমন ভাই পাইয়াছে। কিন্তু উহাদের কথাবার্ত্তা সে শুনিতে চাহিল না।

কমলার ওখানে রণেন অনেক ক্ষণ আসিয়াছিল। বেলা ও শীলা কমলাকে অপমান করিবার পর রণেনের সহিত কমলার আর দেখা হয় নাই। রণেন একেবারে মরমে মরিয়া গিয়াছিল। তার ক্রমাগত মনে হইতেছিল, ইহার পর আর সে কমলাকে মুখ দেখাইতে পারিবে না। তারপর বেলারা যে অন্যায় ইঙ্গিত করিয়াছিল, তার ঘোরতর প্রতিবাদ সে জানাইয়াছিল বটে,

কিন্তু তথাপি তার মনে হইতেছিল যেন সে সব কথাও কমলার কানে গিয়া পৌঁছিয়াছে। কমলা সেখানে উপস্থিত ছিল না। তবু রণেনের ভদ্র মন লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল। সেজন্য ইতিমধ্যে সে কমলার সঙ্গ সযত্নে পরিহার করিয়া চলিয়াছে। কমলা সম্বন্ধে সে মোটেই উদাসীন নয়। তার স্নেহ পাইবার ও তার নিকট আদর কাড়িবার জন্য তার মন ছটফট করিতে থাকে। কমলাকে লইয়া সে এমন এক নিভৃত স্নেহের নীড় রচনা করিয়াছে! অথচ নিষ্ঠুর মানুষেরা এই বিমল স্নেহকে ভুল করে, যা বলা উচিত নয়, তাই বলিয়া বসে। বসুক। তার জন্য সে মাথা নীচু করিবে না। সহিষ্ণুতা তার নীতি নয়। যে তাকে আঘাত করে, ফিরিয়া তাকে আঘাত করিতে সে জানে। কেনই বা না করিবে? অন্যায়কে সে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নয়। অন্যায়কে ক্ষমা করা আর প্রশ্রয় দেওয়া একই কথা। এরূপ দুর্বলতা তার অন্তঃকরণে নাই। দাদার আছে বটে, কিন্তু দাদার জীবনের আদর্শ ও দর্শন তার নহে। রমেনের কথা আলাদা। সে অন্য এক জাতের মানুষ। তার সঙ্গে অন্য কারও তুলনা চলে না। তার প্রত্যেক কাজের পিছনে অনেক দিনের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। রণেন যখন আরও অভিজ্ঞতা লাভ করিবে, তখন তারও চরিত্র রমেনের মত হইয়া উঠিবে কি না সে বলিতে পারে না। সম্প্রতি তার বুকের মধ্যে যৌবনের উষ্ণতা। তারই জয় হোক। যে তার পথে বাধা দিতে আসিবে, সে যেই হোক তাকে সে ক্ষমা করিবে না। এই জন্য সে বেলা ও শীলার প্রতি অনাবশ্যক রকম উগ্র। আবার এই কারণেই সে কমলার প্রতি প্রীতি-স্নিগ্ধ। সে প্রাণপণে আশা করিয়া রাখিয়াছে, একদিন রমেনের সহিত কমলার বিবাহ হইবে। নরেশ আসুক, মাঝপথে সহস্র বাধা আসুক, সে কমলাকে চিনিয়াছে, কমলা নিশ্চয় তার দাদার মত লোককে ছাড়িয়া নরেশের স্ত্রী হইতে যাইবে না। নরেশের স্ত্রী! কি যোগ্যতা আছে নরেশের, সে কমলাকে স্ত্রীরূপে পাইবার স্পর্দ্ধা করে? নরেশ অসীম ধনের অধিকারী। তাতে তার নিজের কোন কৃতিত্ব

নাই। উত্তরাধিকারসূত্রে সে বিপুল ধন পাইয়াছে। তাতে তার বাহাদুরি কিছু নাই। সে যদি অর্থ উপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা রাখিত, তা হইলে অবশ্য তাকে কৃতী বলিতে হইত। সে কৃতিত্ব রমেনের আছে। রমেন সমুদয় জগতের বিরুদ্ধে কি কঠোর সংগ্রাম করিতেছে! পলে পলে নিজেকে দিয়া দিতেছে। তারই ফলে তার পরিবারের লোকেরা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রহিয়াছে। হয়ত রমেন আরও অধিক উপার্জ্জন করিতে পারিত। কিন্তু সে ত পরিবারকে কথঞ্চিৎ সুখে রাখিতে পারিয়াছে। ইহা কি কৃতিত্ব নহে? ইহার কি মূল্য নাই? আর সে মূল্য যদি কমলার মত মেয়ে না বুঝে, তা হইলে কে বুঝিবে? তারপর, রমেনের অগাধ পাণ্ডিত্য, দেবতার মত মন,—এ সব ত দেবদুর্লভ বস্তু। কমলা আর কোথায় এ সকলের সন্ধান পাইবে? না, না, রণেন কখনও কমলাকে এরূপ নির্বোধ মনে করিতে পারে না যে, সে নরেশ ও রমেনের পার্থক্য বুঝিতে পারিবে না। তবে রণেনের উচিত, কমলাকে উৎসাহিত করা। কমলা যেন তার হৃদয়াবেগ অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে। নরেশের স্ত্রী! এই কথাটা পর্য্যন্ত কেমন বেমানান। ঘটনা আরও কত বেমানান। কিন্তু ইহাও রণেনকে স্বীকার করিতে হয়, দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হয় যে, জগতে সর্ব্বদা শোভন ঘটনাই ঘটিতেছে না। পরন্তু, মানুষের হৃদয় যে কোন্ পথে যাত্রা করিবে, তা পূর্ব্বাহ্নে কিছু নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কমলার হয়ত রমেনকে ভালবাসা উচিত। কিন্তু কমলার হৃদয় যদি নরেশের দিকে ছুটিয়া যায়, তা হইলে সে কি করিতে পারে? আর কেনই বা কমলার হৃদয় রমেনের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইবে না? অনাত্মীয় কমলা ইতিমধ্যে তার পরিবারের লোকদের কাছে গ্লানি ও নিন্দা ভিন্ন আর কি পাইয়াছে? কমলা বধূ হইয়া আসিলে তার অদৃষ্টে কি নিপীড়ন জুটিবে, তা সহজে সে কল্পনা করিয়া লইতে পারে। এই পীড়নের মধ্যে সে যদি আসিতে না চায়, সে যদি সহজ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ সমস্যাহীন জীবন বরণ করে, তা হইলে তাকে কি দোষ দেওয়া যায়? রণেনের মন গভীর বিষাদে

ডুবিয়া যায়। কেন এমন হয়? জগতে কেন এমন হয়? একটু মিষ্ট কথা বলা, একটু মিষ্ট ব্যবহার করা, কিছু কঠিন কাজ নয়। তবু মানুষ কার্পণ্য করে কেন? রণেন স্বর্গ-মর্ত্ত্য আলোড়ন করিয়াও এ 'কেন'র জবাব পায় না। কমলা রমেনের স্ত্রী হইলে রণেনের যত না কেন আনন্দ হোক, সেই আনন্দ দিবার জন্য কমলা নিজেকে বিসর্জ্জন দিবে কিসের লোভে? রমেনের সম্মুখে কোন সুখের সম্ভাবনা পড়িয়া নাই। তারপর, রমেন যে পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শুধু কমলাকে লইয়া সুখের নীড় রচনা করিবে, তার কোন সম্ভাবনা নাই। কমলার স্বার্থের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া শুধু নিজেদের আনন্দ বা আহ্লাদের কথা ভাবিলে চলিবে না। কিসের আসায় কমলাকে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত করান যায়! সুতরাং, ইদানীং যদি নরেশ কমলার সহিত বেশী ঘনিষ্ঠ হইবার প্রয়াসী হইয়া থাকে, তা হইলে কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। রণেন তা বুঝে। বুঝে বলিয়াই নরেশের প্রতি নিষ্ফল আক্রোশ ভিন্ন কিছু করিতে পারে না। সে বিধাতার নিকট এই বর ভিক্ষা করে যেন এমন ঘটনা ঘটে যাতে একবারে সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যায়।

রণেনকে কমলা সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। বলিল, 'এস, এস, আজকাল ডুমুরের ফুল হয়ে গেছ যে।' কমলা তা হইলে রণেনকে ক্ষমা করিয়াছে।

রণেন জবাব দিল, 'হওয়াই উচিত।'

'কেন?'

'সভ্য সমাজে আমাদের আর মুখ দেখান উচিত নয়।'

কমলা বুঝিল। হাসিয়া বলিল, 'এই কথা! তা আমি ত সভ্য সমাজের নই।'

'তুমি তবে কোন্ সমাজের?'

'অসভ্য।'

'ঈস্।'

'ঈস্ কেন ?'

'আহা, বিংশ শতাব্দীর আধুনিকা মেয়ে, শাড়ী বডিস ব্লাউজে শরীর ঢেকে, চটি জুতা পায়ে, আর প্রসাধনের চূড়ান্ত করে, অসভ্য সাজ্ছেন।'

'দেখ্ছি, ইতিমধ্যেই বর্ণেন বাবু মেয়েদের সাজসজ্জা সম্বন্ধে দিব্য পরিপক্ক হয়ে উঠেছেন। তুমি এত লক্ষ্য কর আগে বুঝ্তে পারি নি।'

'লক্ষ্য করেছি কি করে বুঝ্লে ?'

'লক্ষ্য না করলে বল্লে কি করে ?'

'এ ত যে কোন মেয়ে সম্বন্ধে বলা যায়। এর জন্য আবার লক্ষ্য করা দরকার না কি ?'

'বটে! আমি দেখে সুখী হচ্ছিলাম যে, তুমি একটি নূতন বিদ্যা অভ্যাস করছ।'

'আমি দুঃখিত অন্তঃকরণে জানাচ্ছি যে, তোমার ভুল হয়েছে।'

'দুঃখিত হতে হবে না।'

'আশা করি, আমায় মাপ করেছ।'

'তোমার অপরাধ কি ?'

'আমার না হোক্, আমাদের ত।'

কমলা হাস্য করিল, 'ও! তোমাদের! একের দোষের জন্য অন্যকে মাপ কর্তে হবে, এই বুঝি তোমাদের নিয়ম ? আমাদের নিয়ম অন্য রকম।'

'তোমাদের নিয়মের জয়জয়কার হোক! কিন্তু বল, ক্ষমা করেছ।'

'ক্ষমা করা কি এত সহজ ? যদি বলি, ক্ষমা করব না—'

'তা হলে আশ্চর্য্য হব না। কারণ, ক্ষমার যোগ্য ত নই।'

'তুমি ত কিছু কর নি।'

'ওকথায় ত আর আমার মন শান্তি পায় না।

'কিসে তোমার মন শান্ত হবে, বল ত।'

'বোনেদের ক্ষমা করলে।'

'আচ্ছা, করলাম। তারপরে ?'

'এত সহজে করলে তুমি ! সত্যি করলে তুমি !' বিস্ময়ে বণেনের দুই চোখ বড় হইয়া উঠিল।

'হু, সত্যি। কিন্তু এমন কি কঠিন ?'

'কঠিন না ! হয়ত আঘাত পেয়ে এসে কত কেঁদেছ।'

'কেঁদেছি, তাতে ভুল নাই। আর মনে পড়লে পরেও কান্না পাবে।'

'তবে ?'

'সে ত আমার দুর্বলতা। তার জন্য অন্যকে ক্ষমা করা শক্ত হবে কেন ?'

'সত্যি বল ত, আমার কথায় তুমি ক্ষমা করলে কি না ?'

'যদি বলি, তা হলে পারবে ? তুমি ত আর নহাৎ ফেলনা নও।

'তুমি বলছ। আমি কি ?'

'আমাদের অনেক আদরের।'

'আচ্ছা, তোমার আদর মাথায় নিলাম। কিন্তু আমার কথায় তুমি নিজের আনন্দের কোন কাজ করবে, এ আমি চাই না।'

বটে ! কোন কাজই করতে চাও ?

'অত ঘটা করে ত নয়।'

'আচ্ছা, আমি বলি, তুমি বলবার আগে ক্ষমা করেছি, তা হলে খুশী হবে ?'

'খুশী নিশ্চয় হব, কিন্তু—'

'কিন্তু বলে থামলে কেন ? কিন্তু কি ?'

'কিন্তু জানতে চাইব, তা সত্য কি না।

'বাপ্ রে, তুমি এত সন্দিগ্ধ প্রকৃতির লোক আগে জানতাম না।'

'এখন তাই জানলে বুঝি ?'

'হাঁ।'

'অনায়াসে বলতে পারলে, হাঁ ?'

'কেন পারব না ?'

'তবে জান যে ভুল জেনেছ।'

'হবে।'

'হবে নয়। নিশ্চয়। আমি প্রমাণ করব, আমি সন্দিগ্ধ প্রকৃতির নয়।'

'কোরো। কিন্তু আমার কাছে নয়।'

'কেন ?'

'আমার কাছে করে ত তোমার কোন লাভ হবে না। যার কাছে করলে তোমার লাভ হবে, তার কাছে কোরো।' কমলার মুখে দুষ্ট হাসি।

'সে কে ?'

'যেন জানেন না সে কে ?'

'জানি না ত।'

'ন্যাকামি রাখ। সে আমাদের রণেন বাবুর বাঙ্গা টুকটুকে বউ।'

রণেনের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার মুখ একটু রাঙ্গা হইল। কহিল, 'তার জন্য মাথা ঘামাচ্ছে কে ?'

'তুমি।'

'মোটেই না।'

'তবে আমি।'

'তোমারও দরকার নাই। বলে, দাদার ব্যবস্থা হল না, আমার ? দাদা ত আমার চেয়ে কত বড়।'

'তাতে কি ?'

'না, এমন কথা আমি ভাবতেও পারি না।'

'তা হলে না হয় দাদার ব্যবস্থাটাই কর আগে।'

'আমি করব ব্যবস্থা, আর দাদা তা মানবে ? তবেই হয়েছে।'

'অত নিরাশ হচ্ছ কেন ? কোনদিন চেষ্টা করেছ কি ?'

'না।'

'তবে এইবার কর।'

'কি চেষ্টা করব?'

'বিয়ের।'

'তুমি পাগল। আমি বলতে পারি দাদাকে বিয়ের কথা?'

'কেন পার না?'

'আমার চেয়ে কত বড় যে।'

'তাতে কি?'

'তুমি না বুঝতে চাইলে আমি তোমায় কি করে বোঝাব?'

'আচ্ছা, বুঝেছি। ধর, তোমার দাদা যদি বলেন, বলেন তোমার বৌদি পছন্দ কর, তা হলে কি কর?'

'মেয়ে দেখতে আরম্ভ করি।'

'অনেক?'

'নিশ্চয়। দাদার জন্য ত আর যে-সে বউ বাছতে পারি না।'

'তা ত ঠিক। কাপড়ের পাড় পছন্দ করার মত মেয়ে পছন্দ করাও ত দরকার।'

'না, তা নয়। তবে আমার বৌদি যে সে হবে না, তা ঠিক।'

'তোমার বৌদির রূপগুণ বর্ণনা তোমার মুখ থেকে শুনতে ভারী লোভ হচ্ছে।'

'কি আর শুনবে? কিই বা জানি। তোমার সাহায্যেই ত আমায় জানতে হবে।'

'আমার সাহায্য?'

'নিশ্চয়। এ বিষয়ে আর কে আমায় সাহায্য করবে?'

'আমি করব, এ কথা তোমায় কে বল্লে।'

'আমি জানি। আমার মন জানে।'

'হায় ভগবান!'

'কি হল ?'

'আমি ভাব্‌তাম, তুমিন বুঝি আমার নিতান্ত পক্ষপাতী। আজ দেখ্‌ছি সে সব ভুল।'

'কিসে দেখ্‌লে ?'

'বুঝ্‌লাম তোমার কথাবার্ত্তায়। আমি ভেবেছিলাম, তোমার দাদার জন্য আমাকে ছাড়া আর কাউকে তোমার পছন্দ নয়। একদিন ঐ ধরণের কথাও বলেছিলে। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, তোমার দাদার জন্য বউ পছন্দ কর্‌তে আমার কথা তোমার মনেও পড়ে না।'

কমলার মুখে বোধ হয় একটু হাস্য ছিল। অন্তত, রণেনের তাই মনে হইল। সে অবাক্ হইয়া কমলার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। নিজেকে সাম্‌লাইতে না পারিয়া বলিল, 'এ তুমি কি বল্‌ছ ? দাদার বউ হবার জন্য যদি কেউ সৃষ্টি হয়ে থাকে ত সে তুমি। কিন্তু এখন আমাদের পরিবারটিকে বুঝেছ ত ? সেখানে কোন সাহসে আর তোমায় আনবার কল্পনা করি ?'

'কিন্তু যাকেই আন, এই পরিবারেই আন্‌বে ত ?'

'তা আনব। কিন্তু দুঃখ নাও পেতে পারে সে। জেনেশুনে তোমায় দুঃখের আগুনের মধ্যে আন্‌ব কেন ?'

'আমি যদি হাসিমুখে সব দুঃখ সইতে প্রস্তুত থাকি ?'

'সত্যি বল্‌ছ তুমি ? মনের কথা বল্‌ছ তুমি ?' রণেনের বক্ষ আবেগে ও আনন্দে ফুলিয়া উঠিল।

'মিথ্যা বলে আমার কি লাভ হবে, বল।'

মানুষ এর চেয়ে পরিষ্কার ভাবে আর নিজেকে কি করিয়া প্রকাশ করিবে ? কমলা ত নিজেকে সম্পূর্ণ ধরা দিতে চাহিতেছে। সত্য বটে, তার কথাবার্ত্তা সহজ সরল, কিন্তু তাতেই তাকে মানাইয়াছে ভাল। কমলা যে রমেনকে চায়, ইহাতে ভুল নাই। ইহা ভাবিতেও আনন্দ। অথচ কমলার সম্বন্ধে

সে কি অবিচারই না করিতে যাইতেছিল! যে কমলা রমেনের জন্য তাদের পরিবারে আসিতে চায়, জানিয়া শুনিয়া আসিতে চায়, এবং সকল দুঃখ বরণ করিয়া লইতে চায়, সেই কমলার সম্বন্ধে নিজের নির্দয় চিন্তার জন্য বর্ণেনের লজ্জা ও অনুতাপের সীমা রহিল না। তার ইচ্ছা করিল, সে কমলার পায়ে ধরিয়া তার ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া লয়। কমলা মানবী নহে, দেবী। এই দেবীর আগমনে তাদের গৃহ পুণ্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, ধীরে ধীরে সকল অন্ধকার কাটিয়া যাইবে, সন্দেহ নাই

'আমি তা হলে দাদাকে বল্‌তে পারি ?'

'সে তোমার অভিরুচি।'

'আজ থেকে তুমি তা হলে আমার বৌদি। বৌদি বলে ডাক্‌ব।' এই বলিয়া সে কমলাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে, কমলা সরিয়া গেল, প্রণাম লইল না। বলিল, 'যা খুসী তুমি ডাকতে পার। কিন্তু যতদিন সত্যি বৌদি না হই, ততদিন প্রণাম নিতে পারব না ঠাকুরপো।'

এই বলিয়া মুখে কাপড় চাপিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল।

৬

লক্ষ্ণৌ। পরিষ্কার সুন্দর সাদা সহর। মানুষের হাতে তৈরী সহর কত সুন্দর হইতে পারে, লক্ষ্ণৌ তার নিদর্শন। এই সহরে কমলার দাদা কুমুদনাথ কলেজে অধ্যাপকতা করে। ছোট এক সুসজ্জিত বাংলোতে থাকে সে। চারিদিকে সখ করিয়া সে ফল ও ফুলের বাগান করিয়াছে। তার একটি নিজস্ব পাঠাগার আছে। অধ্যাপনা সে করে বটে, কিন্তু অধ্যয়ন সে ভালবাসে এ কথা বলা চলে না। বরং আড্ডা দিতে সে অনেক বেশী ভালবাসে, এবং ছাত্রজীবনে যত সে পড়িয়াছে, তার চেয়ে ঢের বেশী আড্ডা দিয়াছে। তথাপি আশ্চর্য্যের কথা এই যে, সে বরাবর সব পরীক্ষায় ভাল করিয়া পাশ হইয়াছে। এত ভাল যে, তার বন্ধুবান্ধব ও শিক্ষকগণ চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা

করিয়াছেন, সে যাদু জানে না। কুমুদনাথ নিজেও বিস্মিত হইয়াছে। কিন্তু পরীক্ষায় আশ্চর্য্য কৃতকার্য্যতার জন্য তার জীবন-সংগ্রাম সহজ হইয়া গিয়াছে। পাশ করিবার পর তাকে বেশীদিন বেকার অবস্থায় বসিয়া থাকিতে হয় নাই। সহজে লক্ষ্ণৌর এই চাকরীটি পায়। তারপর দশ এগার বৎসর তার কাজ বেশ দক্ষতার সহিত চালাইতেছে। এক একজন লোক থাকে, তারা সহজে ছাত্রদের মনোহরণ করিয়া লয়। কুমুদনাথ সেই শ্রেণীর লোক। সে তার ছাত্রদের মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখে। ছাত্রেরা তাকে যেমন মানে ও ভালবাসে, এমন আর কাকেও নয়। তারা সর্ব্বদা তার কথা শুনিতে প্রস্তুত। বস্তুত, অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে সে এই কলেজকে রক্ষা করিয়াছিল। যখন ছেলেদের ইস্তাহারে অধ্যক্ষ পর্য্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন ও ভাবিতেছিলেন কি করিবেন, তখন সকলে পরামর্শ দিল, কুমুদনাথকে বলা হউক, তিনি ছাত্রদের শান্ত করুন। কুমুদনাথ নিজে বিষম স্বদেশভক্ত। নিজে বিদেশী জিনিষ ব্যবহার করেন না, পরন্তু শিক্ষকতা করিয়াও ছাত্রদের মনে সর্ব্বদা স্বদেশ-প্রেম জাগরিত করিবার চেষ্টা করেন। সেই কুমুদনাথ কি ছাত্রদিগকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে বারণ করিবেন? তাকে অনুরোধ করা মাত্র সে বলিল, নিশ্চয়। তার যুক্তি এইরূপ : অধ্যয়ন তপস্যা বিশেষ। ছাত্রদের অধ্যয়নের সময়। এ সময়ে অন্য কোন দিকে তাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত নহে। প্রকৃত অধ্যয়নও দেশ-সেবার অঙ্গ। মূর্খ লোকেরা দেশকে ভালবাসিতে বা দেশের জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে পারে না। কুমুদ ছাত্রদের বুঝাইয়া বলিতে স্বীকৃত হইল, কিন্তু সর্ত্ত করিল যে, সে সময়ে অধ্যাপকদের আর কেহ বা অধ্যক্ষ উপস্থিত থাকিবেন না। সর্ত্ত মানিয়া লওয়া হইল। তারপর কুমুদ ছাত্রদের কি বলিল অথবা বলিল না, একটি ছাত্রও কলেজ পরিত্যাগ করিল না। অধ্যক্ষ সানন্দে ও কৃতজ্ঞতাভরে কুমুদকে বার বার আলিঙ্গন করিলেন। স্বীকার করিলেন, কুমুদ তোমার জন্য আমার কলেজ রক্ষা পাইল। কুমুদ হাসিয়া বলিল, আপনার রুটিও। অধ্যক্ষ লজ্জিত

হাস্যে স্বীকার করিলেন, রুচিও। অবাঙ্গালী ছাত্রদের উপর বাঙ্গালী অধ্যাপকের এরূপ প্রভাবে যে কোন কোন অধ্যাপক অসন্তুষ্ট হইলেন, তাও সত্য। কিন্তু তাঁদের মনের অসন্তোষ মনেই চাপিয়া রাখিতে হইল। তবে অধ্যাপক মহলেও তার 'যাদুকর' এই নাম রটিয়া গেল। পড়ায় ভাল, অধ্যক্ষের প্রিয়পাত্র, অধ্যাপকেরাও সম্মান করেন,—সুতরাং কুমুদনাথ অধ্যাপকের পদে পাকা হইয়া আসীন আছে। তাকে কোন উপরওয়ালার ভয় বা খোসামোদ করিয়া চলিতে হয় না। তাকে অপমান বা অনাদর করিলে ছাত্রেরা ক্ষেপিয়া যাইবে, একথা সকলেই জানে। অথচ সে কাহারও প্রিয়পাত্র হইবার জন্য কোন দিন চেষ্টা করে নাই। তার আড্ডা-প্রিয় স্বভাব। কিন্তু এখানে আসিয়া সে প্রথমেই বুঝিযাছিল, অধ্যাপকদের সঙ্গ তার কাম্য নয়। সুতরাং ছাত্রেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইযা ভিন্ন ভিন্ন দিনে তার বাড়ী আসিত। এই সব তাজা ও তরুণ মনের সংস্পর্শে আসিয়া সে রীতিমত আনন্দিত হইত। ছেলেরাও তার সহবাসে প্রচুর আনন্দ অনুভব করিত। বস্তুত, কলেজের রাশভারী অধ্যাপক কুমুদনাথ বাড়ীতে প্রত্যেক ছেলের সঙ্গে বন্ধুর মত মিশিত। তার সহকর্মীরা ইহা লইযা প্রথম প্রথম তাকে সাবধান করিয়া দিত। বলিত, ছেলেদেব এরূপ আস্কারা দিলে, পরে তাকে আর তারা মানিবে না; এমন কি, কলেজ বাধ্যতা রক্ষা করাও কঠিন হইযা দাড়াইতে পারে। সকল যুক্তিতর্কের উত্তরে কুমুদনাথ অবজ্ঞার হাসি হাসিত মাত্র। বলা বাহুল্য, তার বন্ধুত্ব ছাত্রমহলে কখনও তাকে হীনমান করে নাই।

ছাত্রেরা আসিয়া শুধু যে কুমুদনাথের সহিত মিশিতে পারিত, তা নয়ঃ তারা তার স্ত্রী বীণার সহিতও অবাধ মেলামেশার সুযোগ পাইত। দুষ্ট লোকেরা বলিত, ছাত্রদের আকর্ষণের বস্তু বীণা, কুমুদ নহে। বীণার বয়স বেশী নহে। কুমুদের কোন কোন ছাত্র বযসে বীণার বড হইতে পারে। কিন্তু কুমুদের মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধার ভাব নাই। বীণা স্বামীর প্রশ্রয়ে তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে ঘরের ছেলেদের মত মিশিতে ও গল্প করিতে পারিত। কিন্তু

বীণাই ছাত্রদের একমাত্র আকর্ষণের বস্তু বলিলে, ছাত্রদের প্রতি অবিচার করা হইবে। বীণা তেমন সুন্দরী নয়। কমলার কাছে দাঁড়াইতে পারে না। স্বয়ং কুমুদ বীণার চেয়ে ঢের বেশী সুশ্রী। কুমুদের চমৎকার দৃঢ়তাব্যঞ্জক লম্বা চেহারা। একটু একটু করিয়া ক্রমাগত মোটা হইতেছে। আর দু একটা চুল পাকিতেছে। আত্মবিশ্বাসে ভরপূর হইয়া চলে। মুখে সন্তোষের ভাব। সে যেন নিজ জীবন ও কৃতকার্য্যতা লইয়া সন্তুষ্ট। সম্ভবত স্ত্রী লইয়াও সন্তুষ্ট। হয়ত তার স্বভাবের মধ্যে সন্তোষের বীজ রহিয়াছে। কিন্তু এই দৃঢ় লোকটির মুখ আশ্চর্য্য সুকুমার। দাড়ি গোঁফ বর্জ্জিত ঢলঢলে মুখখানি। অধর ও ওষ্ঠের বিশেষ আকারের জন্য বেশী সুকুমার বলিয়া বোধ হয়। এই মুখ দেখিয়া বুঝা যায়, কুমুদনাথ কমলার দাদা। কে যেন কমলার মুখখানাই একটু পরিবর্ত্তিত আকারে কুমুদনাথের শরীরে বসাইয়া দিয়াছে। গায়ের রং বড় সুন্দর। যেন ত্বক্ ভেদ করিয়া একটা আভা বাহির হইতেছে। হাঁ, স্বীকার করিতে হইবে, কুমুদ সুপুরুষ বটে। তার ছাত্র-প্রিয় হইবার ইহাও একটি কারণ, অধ্যাপকেরা মনে করেন। স্ত্রী বলে, 'তোমার রূপ দেখে আমার হিংসা হয়।' কুমুদ হাসিয়া বলে, 'কেন? তুমি ত দেখ্‌তে খারাপ নও।' বীণা নিজেকে ভেংচাইয়া জবাব দেয়, 'তোমার সঙ্গে আমার তুলনা! কোন দিক্ দিয়ে আমি তোমার যোগ্য নই।' 'আচ্ছা, থামো, তোমার যোগ্যতার বিচার তোমায় করতে হবে না।'

আজ যারা মনে করে কুমুদনাথের গৃহে ছাত্রদের আকর্ষণের বস্তু তার স্ত্রী, এবং সেজন্য নানাবিধ বিরূপ সমালোচনা করে, তারা ভুলিয়া গিয়াছে, কুমুদ মাত্র পাঁচ বৎসর বিবাহ করিয়াছে। কিন্তু বীণা-হীন তার গৃহে ছেলেদের সমাগম ও কলরব কোন দিন কম হয় নাই। কুমুদকে এখন বড়ই সুখী বলিয়া মনে হয়। আরও মনে হয়, সে যেন চিরকাল এই ভাবেই জীবন কাটাইয়াছে। তা কিন্তু সত্য নয়। তার বিবাহের পিছনে এক দীর্ঘ সংগ্রামময় ইতিহাস আছে। বীণাকে সে সহজে লাভ করিতে পারে নাই। না, বীণাকে লাভ

করিবার পক্ষে তার নানারূপ বাধা ছিল। সে সকল বাধা তাকে অতিক্রম করিতে হয়। ভীষণ সংগ্রামের সেই দিনগুলি। ধর্ম্ম লইয়া পূর্ব্ব হইতেই পরিবারের সঙ্গে তার মনান্তর ঘটিয়াছিল। প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি কুমুদনাথের কোন দিন আস্থা ছিল না। কুমুদ সেই ধরণের লোক, যে কথায় ও কাজে এক। সত্য সত্য যখন সে হিন্দু ধর্ম্মে আস্থা হারাইল, তখন তার পক্ষে তা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা অসম্ভব হইল। কলিকাতায় থাকিতে সে নিয়মিত ভাবে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে যাইত। সেখানকার ক্রিয়াকলাপ তার ভাল লাগিত। তার অনেক সহপাঠী তার সহিত সমাজে আসিত। কিন্তু তাদের সহিত তার একটা বড় পার্থক্য ছিল। ব্রাহ্ম সমাজের ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া তার মনে এই ধারণা দৃঢ় হইয়াছিল যে, ভারতের সকল জাতি ও ধর্ম্মের লোকের মিলিবার এক প্রশস্ত স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে। মুষ্টিমেয় লোক বিভিন্ন ক্ষেত্রে গত শত বৎসর ধরিয়া বাংলার জীবনকে কি ভাবে না প্রভাবান্বিত করিয়াছে! উহাদের অন্তর্নিহিত শক্তির অনুসন্ধান করিতে যাইয়া সে দেখে মূলে এই নূতন ধর্ম্ম। ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে সে এক নূতন ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতে ভালবাসিত। কারণ, সে জানিত, মুসলমান বা খৃষ্টানকে এক নূতন ধর্ম্মই টানিতে পারিবে, হিন্দু ধর্ম্ম পারিবে না। মুক্ত সামাজিক আব্‌হাওয়া এবং কুসংস্কারশূন্য হইবার প্রচেষ্টা তাকে বিশেষ আরাম দিত। মনে মনে একেশ্বরবাদ গ্রহণ তার পক্ষে কিছুই কঠিন হয় নাই। কারণ, সে হিন্দু ধর্ম্মের যতটুকু জানিত, তাতে তার এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, মূলত উহাও একেশ্বরবাদ সমর্থন করিয়াছে। ফলত, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি তার এরূপ অনুরাগ জন্মিয়াছিল যে, সে স্থির করিয়াছিল উহা প্রকাশ্য ভাবে গ্রহণ করিবে। নিজ পরিবারের লোকদের কাছে তার এই সংকল্পের কথা ব্যক্ত করিবামাত্র তাদের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। মাতার কান্নাকাটি, কমলার অনুনয়-বিনয় এবং পিতার তর্জ্জন-গর্জ্জন তাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। পিতামাতা সন্দেহ

করিলেন, তাঁদের ছেলে নিশ্চিত কোন ব্রাহ্ম প্রচারকের হাতে পড়িয়াছে, নতুবা তাঁদের অজ্ঞাতে কোন ব্রাহ্ম পরিবারের সহিত মিশিয়া কোন মেয়ের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, কুমুদ তখন পর্য্যন্ত কোন ব্রাহ্ম পরিবারের সহিত মিশিবার সুযোগই পায় নাই। খুব যে ইচ্ছা ছিল, তা নয়। ব্রাহ্ম সাহিত্য পড়িয়া এবং প্রতি রবিবার সমাজে যাতায়াত করিয়া, সে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুরাগী হইয়াছিল। সুতরাং পিতা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ ব্রাহ্ম প্রচারক তাকে ভুলাইয়াছে, তখন সে অনায়াসে হাসিয়া উত্তর দিতে পারিল, কেহ নয়। সহপাঠীরা ধরিয়া বসিল, তাকে সত্য কথা বলিতে হইবে। কুমুদ অঙ্গীকার করিল, সত্য বলিবে। তখন তারা জানিতে চাহিল, সেই ব্রাহ্ম মেয়েটি কে, যার প্রেমে পড়িয়া সে ধর্ম্মান্তর গ্রহণে স্থিরসংকল্প হইয়াছে। কুমুদ ত হাসিয়াই অস্থির। কুমুদ যে কোনরূপে প্রলুব্ধ হয় নাই, এ কথা ঘরের ও বাহিরের লোকদের বিশ্বাস করা এত কঠিন কেন? তাকে অবিশ্বাস করিবার হেতু কিছু থাকিতে পারে না। না হয় তার পিছনে গোয়েন্দা লাগান হউক, তার সম্বন্ধে সত্য কথা জানিতে বিলম্ব হইবে না। ক্রমে সকলেই বুঝিল, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি কুমুদনাথের অনুরাগ প্রকৃত অনুরাগ। সে এজন্য সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবে। এমন কি, পিতা যদি তাকে ত্যাগ করেন, তা হইলেও সে নিজ প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত হইবে না। সকলের মনে সে কষ্ট দিবে, তা সে ভাল করিয়া জানে। আর সেজন্য সেও মনে কম দুঃখ পাইতেছে কি? তথাপি তাকে সত্যের পথে অবিচলিত থাকিতে হইবে। বস্তুত, সেকালে সেই অল্পবয়স্ক বালক কুমুদনাথের চরিত্রের তেজ ও দৃঢ়তা দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এই সময়ে তাকে অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছিল। পরিবারের সঙ্গে বিরোধ, মনান্তর, যে কি দুঃসহ ব্যাপার, তা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে বুঝিবে না। আর তাকে উপদেশ দিয়া সৎপথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য সে কি প্রচেষ্টা এবং হিন্দুসমাজপতিগণের সে কি আনাগোনা! কুমুদনাথের দোষ এই, সে সকলের সঙ্গে তর্ক

করে, সকলের যুক্তি খণ্ডন করিতে যায়। তার বয়সে যে তা সম্ভব নয়, তা সে ভুলিয়া যায়। শেষ পর্যন্ত তাকে এই সাফ্ জবাব দিতে হয় যে, সে যা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছে, তা কারও কথায় ত্যাগ করিতে পারিবে না, আর তা লইয়া সে কারও সঙ্গে তর্ক করিতেও প্রস্তুত নহে। না, সে অন্ধবিশ্বাসী নহে। তার বিশ্বাসের মূলে আছে যুক্তি ও আত্মপ্রত্যয়। কমলাকে কুমুদ অত্যন্ত ভালবাসে। দাদার হিতের জন্য কমলা তখন কিছু বলিবে, এমন বয়স তার হয় নাই। সে শুধু বিস্ময়ে চোখ বড় করিয়া কুমুদকে এই কথাই বলিতে চাহিত, আমাদের যদি ভালবাস, তা হইলে আমাদের ছাড়িয়া যাইও না।

এই সময়ে কুমুদনাথ নিশ্চয় পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। কিন্তু একটি অঘটন ঘটিয়া গেল। সহরের এক প্রাচীন ব্রাহ্ম হঠাৎ এই সুদর্শন যুবকটির সহিত একদিন আপনা হইতে পরিচয় করিয়া নিজ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিলেন। বীণার সহিত তার প্রথম পরিচয় সেইখানে। বীণা তাঁর বড় মেয়ে। ভয় নাই, পরস্পরের প্রতি প্রেম জন্মিবার মত বয়স তখনও বীণার হয় নাই। বীণা আট নয় বৎসরের বালিকামাত্র, বেণী দুলাইয়া খেলা করে। সুতরাং বাড়ীর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কুমুদের অসঙ্কোচে পরিচয় ও ভাব হইয়া গেল। রাধিকা বাবু, তাঁর স্ত্রী এবং আর সকলকে কুমুদের অত্যন্ত ভাল লাগিল। একদিন তাদের বাড়ীতে খেলা ও গল্প করিতে করিতে তার দেরী হইয়া গেল। ঘড়িতে আটটা বাজিল। তখন রাধিকা বাবু সস্নেহে কুমুদের পিঠে হাত রাখিয়া বলিলেন, 'বাড়ী যাও। দেরী হল।' ইঁহাদের সঙ্গে রাত্রিটা ভারী মিষ্ট লাগিতেছিল। কুমুদের আরও কতকক্ষণ থাকিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু গৃহকর্তা যদি বলেন, যাও, তা হইলে আর কি করিয়া সেখানে থাকা যায়? সুতরাং যাইতে হইবে। যাইবার জন্য সে উঠিয়াও দাঁড়াইল। এমন সময় রাধিকা বাবুর স্ত্রী বলিলেন, 'আহা, থাক্ না, আমাদের সঙ্গে না হয় উপাসনায় যোগ দিবে।' রাধিকা বাবু কঠোর গম্ভীর মুখে বলিলেন, 'না।' কুমুদ শুনিয়াছিল, রাধিকা বাবু প্রতিদিন সকালে ও রাত্রে ছেলেমেয়েদের নিয়া

ব্রহ্মোপাসনা করেন। রাধিকা বাবুর স্ত্রীর কথায় কুমুদের আগ্রহ হইয়াছিল, ইহাদের সহিত সেও উপাসনায় যোগ দিবে। কিন্তু রাধিকা বাবুর গম্ভীর মুখ দেখিয়া তাঁর আর অনুরোধ করিবার সাহস হইল না। কিন্তু পরদিন আসিয়া কুমুদ রাধিকা বাবুকে প্রথমেই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি তার অকপট অনুরাগের কথা নিবেদন করিল। ইহাও জানাইল যে, সে অবিলম্বে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। রাধিকা বাবু অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কুমুদের সকল কথা শুনিলেন। তারপর সস্নেহে তার মাথায় হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'তোমাকে বুদ্ধিমান্ বলে জান্‌তাম। এখন সন্দেহ হচ্ছে।' 'কেন?' 'ধর্ম্মত্যাগ করবে বলে। কেন তুমি করবে?' কুমুদ যথাসাধ্য যুক্তিতর্কের অবতারণা করিল। না, রাধিকা বাবু তার কোন কথা অবিশ্বাস করিতেছেন না, বরং তার প্রত্যেক কথাই তিনি বিশ্বাস করেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রথম কথা এই, সে নাবালক—এই কথা ছাড়িয়া দিলেও তার বুদ্ধি পাকে নাই। আজকের সত্য পথ, কাল সত্য নাও থাকিতে পারে। তাকে ব্রাহ্ম হইতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই। সে যদি হিন্দু সমাজে থাকিয়া মনের শান্তি পায়, তা হইলে তা ত্যাগ করিবে কেন? এমন অনেক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, অনেকে হিন্দু সমাজ ত্যাগ করিয়া আবার সেখানেই ফিরিয়া আসিয়াছে। নিজের মন ভাল করিয়া না বুঝিলে এরূপ হয়। ছেলেমানুষ কুমুদ,—হাঁ, ছেলেমানুষ বৈ কি, ঐ কথায় তার অভিমান হইলেও সে ছেলেমানুষ,—নিজেকে কতটাই বা বুঝিতে পারে? বেশ ত, তাড়াতাড়ি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। সে যথেষ্ট সময় অপেক্ষা করিয়া দেখুক, তার মতিগতি পরিবর্ত্তিত হয় কি না। তখনও যদি তার ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণের সংকল্প অটুট থাকে, তা হইলে সে গ্রহণ করিবে। রাধিকা বাবুর কথায় সে মনে মনে দুঃখ অনুভব করিতে পারে; মনে করিতে পারে, তিনি তার সংগ্রামের কথা বুঝিতে পারেন না, তাকে উৎসাহ দিবার পরিবর্ত্তে নিরুৎসাহ করিতেছেন। তিনি দুঃখিত যে, বাস্তবিক তাঁকে তাই করিতে হইতেছে। এইরূপ করাই তাঁর অভ্যাস। গুরুতর কারণ ব্যতীত সাধারণ করিয়া তিনি ধর্ম্মান্তর

গ্রহণের পক্ষপাতী নহেন। কুমুদের ইহা সখ নয়। সে যে কতখানি স্বার্থত্যাগ করিতে চায়, তা তিনি জানেন। জানেন বলিয়া কুমুদের সহিত পরিচিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁর গর্ব্ব। কিন্তু এই গর্ব্ব তাঁকে কুমুদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অন্ধ করিতে পারে নাই। তিনি তার মঙ্গল চান বলিয়াই তাকে পরামর্শ দিতেছেন, এখন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ না করিবার জন্য। সময় গত হইলেও যদি তার এই আগ্রহ থাকে, তা হইলে তিনি নিজে তাকে সাহায্য করিবেন।

রাধিকা বাবুর ব্যবহারে কুমুদ আশ্চর্য্য হইল। নিজের দল বাড়াইবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নাই। এই ভদ্রলোকটির মুখ হইতে হিন্দু ধর্ম্মের নিন্দাসূচক একটি কথাও সে কোন দিন শুনে নাই। পরন্তু তাঁর বাড়ীতে অনেকের সহিত তর্কবিতর্কে তিনি হিন্দু ধর্ম্মের এমন অনেক দিক্ নিরপেক্ষভাবে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন, যা তার এবং তার মত অনেকের চোখে পড়ে নাই। বস্তুত, তিনি সকল ধর্ম্মের প্রতি সমান সহিষ্ণু, কিন্তু নিজ ধর্ম্মকে একমাত্র সত্য পথ বলিয়া মনে করেন। অথচ এই সত্য পথে তিনি কাহাকেও জোর করিয়া আনিতে চাহেন না। তাঁর মত এই যে, ধর্ম্ম কাহারও বসনের ন্যায় নহে, ইচ্ছামাত্র ত্যাগ করা চলে। উহা প্রত্যেকের জীবনের অঙ্গ-বিশেষ। জীবনের অপরি-ত্যাজ্য অঙ্গ। ধর্ম্মময় জীবন প্রত্যেক মানুষকে যাপন করিতে হইবে। এরূপ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্ম হইয়াও তাঁর দলবৃদ্ধির ঝোঁক নাই দেখিয়া কুমুদ রাধিকা বাবুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা অনুভব করিল এবং স্থির করিল তাঁর কথা শুনিয়া চলিবে। কুমুদের পরিবার কিছু দিনের জন্য হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

কিন্তু কুমুদের দৃঢ় মত পরিবর্ত্তিত হইল না। বি. এ. পাশ করিয়া কুমুদ রাধিকা বাবুকে জানাইল, তার মত বদলায় নাই। এম. এ. পাশ করিয়াও জানাইল। তারপর সুদূর লক্ষ্ণৌতে চাকরী লইয়াও জানাইল। প্রতি বারে রাধিকা বাবু জানাইলেন, এখনও সময় হয় নাই। সে চাকরী জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দুই বৎসর কাটাইবার পর রাধিকা বাবু বলিলেন, তুমি ইচ্ছা কর ত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পার। আমি সহায় হইব।

সুতরাং আর একবার পরিবারে শোকের ছায়া পড়িল। আবার কিছু দিন নানা সংগ্রাম ও পরীক্ষার মধ্য দিয়া কুমুদকে যাইতে হইল। সে ব্রাহ্ম হইল। তারপর কয়েক বৎসর পরে রাধিকা বাবুর মেয়ে বীণাকে বিবাহ করিল। রাধিকা বাবু কুমুদের সহিত বীণার বিবাহ কল্পনা করেন নাই। তিনি জানিতেন, ইহারা ছেলেবেলা হইতে আত্মীয়ের মত মিশিয়াছে। বীণার মনে যে ইতিমধ্যে অঙ্কুরের মত অনুরাগ জন্মিয়াছিল, তা তিনি জানিতে পারেন নাই। প্রথম যেদিন তিনি স্ত্রীর নিকট এই সংবাদ শুনিলেন, হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। স্ত্রীর উপর রাগও করিলেন। বলিলেন, লোকের কাছে মুখ দেখাইবার আব পথ থাকিবে না। কারণ, লোকে মনে করিবে, তিনি তাঁর মেয়ের জন্যই এত কাল ধরিয়া ছেলেটিকে চোখে চোখে রাখিযাছেন। ভগবান্ জানেন, তাঁর মনে সেরূপ কোন উদ্দেশ্য ছিল না। যদি সম্ভব হয়, বীণাকে অন্যত্র বিবাহ দিলে শোভন হয়। স্ত্রী জানাইলেন, বীণা-আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না, এবং অন্য বিবাহ তিনি নিজেও অনুমোদন করিবেন না। সুতরাং চিঠিতে কুমুদের নিকট কথাটা পাড়িতে হইল। অবশ্য সাবধানে। কিন্তু সাবধানতার প্রয়োজন ছিল না। বীণা যে রাধিকা বাবুর কন্যা হইয়া জন্মিয়াছিল, ইহাই তার পক্ষে মস্ত প্রশংসা-পত্র। কুমুদ নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে এই কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারে। এক কথা, বীণা ব্রাহ্মণ-কন্যা এবং সে কায়স্থ। কিন্তু তার বা রাধিকা বাবুর নিকট জাতনাশ অর্থহীন কথামাত্র। তার পরিবারের লোকেরা ঘোরতর বিরোধিতা করিতে লাগিল। হইলই বা সে ব্রাহ্ম। একবার সে সকলের বক্ষে শেল হানিয়াছে, আবার কি না হানিলেই চলে না? বলা বাহুল্য, বিবাহ লইয়াও তাকে বহু পীড়ন ও গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়। সেও এক সংগ্রামের দিন গিয়াছে।

সেই সব দুঃখময় দিন কুমুদনাথ পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে। নিজের পুরাতন দুঃখ লইয়া অনুশোচনা করিবার মানুষ কুমুদনাথ নয়। যা পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে, তা পিছনেই থাক্। সেদিন হয়ত সমস্যা তার কাছে

গুরুতর হইয়া দেখা দিয়াছিল, কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারে নাই; কিন্তু সেই গত জীবনের জন্য সে আজিকার জীবনের আনন্দ মাটি হইতে দিবে কেন? সেদিনকার সংগ্রাম, দুঃখ ও বেদনা নিশ্চয়ই তার কাছে খুব সত্য হইয়া দেখা দিয়াছিল। ভগবান্‌কে ধন্যবাদ, সে তা উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। এখন তার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে; অনাবৃত সরস জীবন; তার প্রেমময়ী স্ত্রী; তার কর্ম্মক্ষেত্র; তার প্রিয় ছাত্রগণ। একটা লোকের সমুদয় মনোযোগ আকর্ষণের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। তদুপরি সে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ। অর্থাৎ প্রকৃত ব্রাহ্মের ন্যায় জীবন যাপন করিতে চেষ্টা করে। অন্যকে এই পথে চালিত করিতেও তার উৎসাহ কম নয়। তার পাঠাগার ব্রাহ্মদের সাহিত্যে পূর্ণ। বাস্তবিক, এই একটি বিষয়ে তার উৎসাহের অন্ত নাই। কত রকম সৎ কাজে যে ছেলেদের দল বাঁধিয়াছে, তার ঠিক নাই। সে এই সহরে আসিবার পর হইতে যে ছেলেদের নৈতিক জীবনের বিশেষ উন্নতি ঘটিয়াছে, তা শত্রু-মিত্র সকলেই স্বীকার করে। ছেলেরা সিগারেট ত খাইতই, মদ খাওয়াও একেবারে অপ্রচলিত ছিল না। তাদের চরিত্র-হীনতার সংবাদ শিক্ষকেরা মাঝে মাঝে পাইতেন। কুমুদনাথ আসিবার পর হইতে বহু ছেলে সৎ পথে ফিরিয়া আসিয়াছে, মদ খাওয়া ছাড়িয়াছে এবং সহরের একটি বড় সিগারেটের দোকান অন্যত্র উঠিয়া গিয়াছে। এ সবের জন্য ও তার পরোপকারী স্বভাবের জন্য, লক্ষ্ণৌর অধিবাসীরা তার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ। কুমুদ যা করিত সহজে করিত, গম্ভীর উপদেষ্টা সাজিয়া করিত না। বীণা বলিত, তার অধ্যাপকের কাজ না লইয়া প্রচারকের কাজ লওয়া উচিত ছিল। উল্টাইয়া কুমুদ প্রশ্ন করিত, তার বাবাই বা সে কাজ লন নাই কেন? বাঃ রে, রাধিকা বাবু আর কুমুদনাথ কি সমান? না, সমান নয়। কুমুদ জীবনকে লঘুহাস্যে বরণ করিয়াছে। গভীর ও গম্ভীর হইবার অবকাশ সে পায় নাই। সুতরাং সব সময়ে সে মানুষের জীবনকে ধর্ম্ম বিষয়ে পরিবর্ত্তিত করিতে যাইবে না। মানুষ তার সংস্পর্শে

আসিয়া যদি এক উচ্চতা লোকের সন্ধান পায়, তা হইলেই সে কৃতার্থ বোধ করিবে।

সম্প্রতি কুমুদনাথ এক অদ্ভুত চিঠি পাইয়াছে। চিঠিতে যথেষ্ট মুন্সিয়ানা আছে। পত্র আসিয়াছে তার স্বদেশস্থ কোন প্রতিবেশীর নিকট হইতে। চিঠিটা এই: 'প্রিয় কুমুদ বাবু, আপনাকে এই চিঠি লিখিতেছি বলিয়া মাপ করিবেন। ইহা এমন একটি প্রসঙ্গ লইয়া যা সাধারণত আলোচনা করাও নিষিদ্ধ, চিঠিতে লিপিবদ্ধ করা ত দূরের কথা। তাই যদি হইবে, আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তা হইলে আমিই বা কেন তা আপনার নিকট উপস্থিত করিতেছি? তার কতকগুলি কারণ আছে। আপনি আমার নাম দেখিয়া হয়ত আজ আমাকে স্মরণ করিতে পারিবেন না। কারণ, আপনি আজ দশ বৎসরের অধিক কাল দেশছাড়া। সুতরাং সেকালের অতি পরিচিত নামও যদি বিস্মৃতির তলে তলাইয়া গিয়া থাকে, তা হইলে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। এক কালে আপনার সহিত আমার যে অল্প একটু বন্ধুতা হইয়াছিল, তার সুযোগেও বটে, মর্যাদা রক্ষার জন্যও বটে, আপনার ঘরের কথা আপনার নিকট বলিবার স্পর্দ্ধা করিতেছি। দ্বিতীয়ত, আপনার মঙ্গল ছাড়া ইহাতে আমার নিজের কোন স্বার্থ নাই। আমি কোন দিন কাহারও নিকট কোন বিষয়ে কৃপাপ্রার্থী হই নাই। মা দুর্গা কৃপা করিলে ভবিষ্যতেও হইব না। তৃতীয়ত, আমি আপনার ও আপনাদের মঙ্গলার্থী বলিয়াই, কেহ আপনাদের কোন প্রকার নিন্দা করিবে, ইহা আমি সহ্য করিতে পারি না। আপনি বলিতে পারেন, এই চিঠি আপনাকে অত দূরে না লিখিয়া এখানে আপনার পরিবারস্থ লোকদের সহিত চিঠির বিষয় লইয়া আলাপ করিলেই বেশী বুদ্ধিমানের কাজ হইত না কি? হয়ত হইত। কিন্তু তাতে দুইটি বাধা ছিল। প্রথমত, আপনি ব্যতীত পরিবারের আর কেহ এ বিষয়ে কোন প্রতীকার করিতে সমর্থ কি না সন্দেহ। আমি আপনার পরিজনদের কোন প্রকার নিন্দা করিতেছি না। মানুষ কখনও

কখনও এমন অবস্থায় পড়িয়া যায় যে, তাকে টানিয়া না তুলিলে সে উঠিতে পারে না। কিন্তু যে টানিবে তাকে যথেষ্ট শক্তিমান্ হওয়া দরকার। আমি স্বীকার করি, আমার সে শক্তি নাই। দ্বিতীয়ত, আপনার পরিজনদের সহিত এ বিষয়ে কথা বলিতে গেলে আমি শুধু অনর্থক তাদের ক্লেশের কারণ হইব, অথচ কোন উপকার করিতে পারিব না। ইহা আমার অভিপ্রেত নহে। সুতরাং আপনার শরণ লওয়া ভিন্ন গত্যন্তর রহিল না।

"আপনি নরেশচন্দ্র সিংহকে চিনেন কি না, জানি না। ইনি এখানকার একজন ধনী যুবক। বয়স আপনাদের মত হইবে। দেখিতে মন্দ নয়। অবিবাহিত। ইহাকে লইয়া আমরা কোন দিন মাথা ঘামাই নাই। আজও ঘামাইতে হইত না, যদি ইনি আপনাদের পরিবার মধ্যে প্রবেশ না করিতেন। শুধু প্রবেশ নয়—যাক্, ক্রমে বলিতেছি। ইনি যে কবে কেমন করিয়া আপনার পরিজনদের সহিত প্রথম পরিচিত হইলেন, তা জানি না। হঠাৎ আমরা দেখিতে লাগিলাম যে, ইহার বিরাট মোটর গাড়ী ভেঁপু বাজাইয়া যখন-তখন আসিয়া আপনাদের দরজার সামনে দাঁড়াইতেছে। ধনীদিগের সঙ্গ পাওয়া কঠিন হইলেও, ধনী ব্যক্তি নিজ প্রয়োজনে আসিতে পারে। তা দোষের নয়। কিন্তু ক্রমে আমরা আবিষ্কার করিলাম, তিনি বিনা প্রয়োজনে আসেন এবং বিনা প্রয়োজনেই বেশী আসেন। যদি জিজ্ঞাসা করেন, কি করিয়া জানিতে পারিলাম—বিনা প্রয়োজনে আসেন, তা হইলে আমার জবাব এই যে, তা এই চিঠি পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন। আপনার ভগিনী কমলা বিবাহযোগ্যা বয়স্থা মেয়ে। সুন্দরীও বটে। আমাদের সমাজে প্রচলিত না থাকিলেও আপনার ভগিনীর প্রতি কোন যুবকের প্রেম হইতে পারে, ইহা স্বীকার করি। তা দোষের বলিয়াও মনে করি না। এমন কি, সেই উদ্দেশ্যে নরেশ যাতায়াত করিতেছেন দেখিলেও আমরা তাঁকে দোষ দিতাম না। মন্মথ-শরে আহত হইয়া কে কবে বিবেচনা-পূর্ব্বক কাজ করে? আর নরেশের দিক্ হইতেও তাকে সর্ব্বাংশে উপযুক্ত বর মনে

করিবার প্রচুর হেতু রহিয়াছে। তাঁর মত ছেলেকে কন্যার জন্য লাভ করিতে কেহ উদ্‌গ্রীব হইলে, তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। মেয়ের ভাল বিবাহ দিবার জন্য কে না উদগ্রীব হয়? সুতরাং আপনার ভগিনীর জন্য নরেশের ন্যায় একটি সুপাত্র পাইবার জন্য যদি আগ্রহ জন্মে, তা হইলে বলিব, তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। পরন্তু, এরূপ চেষ্টা পিতামাতার পক্ষে না করাই অকর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হইবে।

'সম্ভবত বাড়ীর পত্রে আপনি নরেশের কথা জানিয়া থাকিবেন। এমন কি, আমার ধারণা এই যে, নরেশ সম্বন্ধে আপনার মতামতও সংগ্রহ করা হইয়াছে। অর্থাৎ নরেশের মত সুপাত্রের সহিত কমলার বিবাহে আপনার সম্মতি আছে কি না, জানা হইয়াছে। আমি ঠিক জানি না। আমি জানি, আপনি ব্রাহ্ম। কিন্তু আপনি কমলার পক্ষে পাত্র মনোনয়ন অথবা পূর্ব্বরাগ পছন্দ করিবেন, তা জানি না। আপনি ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মোচিত আচরণ করিয়াছেন এবং আদর্শ ব্রাহ্ম জীবন যাপন করিতেছেন। এক কালে হয়ত আমরা আপনার অত্যন্ত প্রতিকূল ছিলাম। অনেক প্রকার বিরোধিতা করিয়াছি। আপনি হয়ত আমাদের বিরোধিতা আজ আর মনে রাখেন নাই এবং বলিয়া না দিলে বুঝিতে পারিবেন না, কাহারা বিরোধী ছিল। বিরোধীদের মধ্যে আমি অগ্রণী ছিলাম। একে আমি ভট্টাচায্যবংশী, ব্রাহ্মণ। তদুপরি বরাবর আপনাদের স্নেহের চোখে দেখি। আপনার পিতার সমূহ বিপদে আমি কি উদাসীন থাকিতে পারি? আমি উদাসীন থাকি নাই। আপনার বিবাহের সময়ও অনেক বাধা দিয়াছিলাম। কিন্তু ঐ সব কাজের জন্য আমি আজও লজ্জা অনুভব করিতেছি না। কারণ, আমি যা ভাল মনে করিয়াছিলাম তাই করিয়াছি। আশা করি, আপনি এ বিষয়ে আমার সহিত একমত হইবেন যে, প্রত্যেক মানুষের নিজের একটা ভালমন্দের ধারণা আছে; তাকে তদনুসারে কাজ করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। আপনি হয়ত বলিবেন, নিছক পরের উপকার করিবার বা প্রয়োজন কি? মানুষকে নিজ

ইচ্ছামত ভাল বা মন্দ পথে চলিতে দিলেই ত হয়। নীতি হিসাবে এই কথার উৎকর্ষ স্বীকার করি। কিন্তু আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, সংসারে উৎকৃষ্ট নীতি পালন করা সম্ভব কি না। দেশে যতগুলি সৎ কাজ আরম্ভ হইয়াছে, ঐ নীতির জন্য সেগুলি ত্যাগ করিতে হয়। আমি স্বীকার করি, আমি প্রাণ ধরিয়া তা করিতে পারি না। আমায় ক্ষমা করিবেন, আমি যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন পরের মঙ্গল করিতে চেষ্টা পাইব।

'আমি বলিতেছিলাম, যদি নরেশের সহিত আপনার ভগিনী কমলার বিবাহের প্রস্তাব হইয়া থাকে, তা হইলে তা অত্যন্ত উত্তম প্রস্তাব। এই বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত হইবে এবং আমি ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। কমলার ন্যায় লক্ষ্মী ও সুন্দরী বালিকা সুপাত্রে ন্যস্ত হয়, ইহা আমার আন্তরিক কামনা। আমার প্রথম কথা এই যে, আমি নিশ্চিতরূপে জানিতে পারি নাই যে, নরেশের সহিত কমলার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছে। সেজন্য উদ্বিগ্ন আছি। আপনার কাছে নিশ্চিতরূপে জানিতে চাই যে, এই শুভ বিবাহ হইবে। আরও জানিতে চাই যে, উহা শীঘ্র হইবে।

'কিন্তু আমি যতদূর সংবাদ লইতে পারিয়াছি তাতে আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, এখন পর্যন্ত কমলার সহিত নরেশের বিবাহের প্রস্তাব আসে নাই। অথচ কমলা ও নরেশ অবাধে মেলামেশা করিতেছে। এমন কি, যখন নরেশ আপনাদের বাড়ীতে আসে, প্রায় প্রতিদিন আসে, তখন তাকে বহুক্ষণ ধরিয়া কমলার সহিত একা থাকিতে দেওয়া হয়। যদি আমার এ সংবাদ ভুল প্রতিপন্ন হয়, তা হইলে আন্তরিক সুখী হইব। আর যদি ভুল না হয়, তা হইলে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে সুখী হইব। আপনি বুদ্ধিমান্ মানুষ। আপনাকে ইঙ্গিতেই অনেক কথা বলা চলিবে। আপনি নিশ্চয় শাস্ত্রের সেই বচন জানেন। পুরুষের সহিত অগ্নির ও ঘৃতের সহিত যুবতী নারীর তুলনা করিয়া বলা হইয়াছে, ঘি যেমন আগুনে গলিবেই, স্ত্রীলোকও সেইরূপ পুরুষ সংস্পর্শে গলিয়া যাইবে। কমলার সেরূপ কোন

পরিণতির কথা ভাবিতেও আমার সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হয়। অথচ আপনার পরিবারের লোকেরা কি প্রকারে এ বিষয়ে উদাসীন রহিয়াছেন, বুঝিতে পারি না। নরেশ হয়ত খুব ভাল ছেলে। কমলাও সৎ। কিন্তু দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে মানুষ প্রকৃতির নিকট তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যায়। এরূপ আগুন লইয়া খেলিবার প্রয়োজন কি? নরেশের বা কমলার কখনও মতিভ্রম হইবে না, একথা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না। তাদিগকে অনবরত প্রলোভনের সম্মুখে ফেলিলে তারা নিজেদের সর্ব্বদা সংবরণ করিতে পারিবে, একথা শুধু মানব-চরিত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিই বিশ্বাস করিতে পারে। আমি পারি না। এই অন্যায়ের যথোচিত প্রতীকার চাই।

'হাঁ, আপনাকে স্পষ্ট করিয়া কথাটা বলা দরকার। আমি আপনাদের বাড়ীর অনাচার সহ্য করিব না। তা দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আমি 'অনাচার' বলিলাম বলিয়া আপনি রাগ করিবেন না। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি কমলা আজ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ও নিষ্পাপ। নরেশও সম্ভবত তাই। কারণ, আমি এ পর্য্যন্ত অন্যরূপ কোন প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু তাই যথেষ্ট নহে। সমাজ পদার্থটি অত্যন্ত সজীব ও সচল। কলিকাতায় যে কাজ লোকের চোখে সহজে পড়ে না, এখানে তা সকলে লক্ষ্য করে। বস্তুত, নরেশের সহিত কমলার অবাধ মেলামেশা ইতিমধ্যে সহরে গল্পের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। আপনি হয়ত মনে করিতে পারেন, জানি না করিবেন কি না, আমার বাড়ীতে যা খুসী হোক্ তাতে অন্য লোকের কি? আপনাদের লক্ষ্ণৌর খবর আমি জানি না। কলিকাতাতে একে অন্যের বাড়ীর খবর নেয় না। কিন্তু এখানে তা হইবার জো নাই। কাহারও চোখ এড়াইয়া কোন কাজ করা চলে না। সুতরাং আপনাদের বাড়ীর বিষয় লইয়া এ সহরের আলোচনা বন্ধ করিবার উপায় নাই। অবশ্য বিবাহ হইলে আপনি বন্ধ হইয়া যাইবে। আপনার পরিবারের মেয়েদের সম্বন্ধে কোন আলোচনা হইবে, ইহা আমার পক্ষে ক্লেশের কারণ। সেই ক্লেশ নিরতিশয় বাড়িয়াছে

এইজন্য যে, এই সহর নরেশ ও কমলা সম্পর্কে নানা বিদ্রূপে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। লোকে সম্ভব অসম্ভব সকল প্রকার কথাই বলিয়া থাকে। আপনাদের উদ্দেশ্য ভাল হইতে পারে। হয়ত নরেশের সহিত কমলার বিবাহ একদিন হইবে। কিন্তু ধরুন যদি বিবাহ না হয়! তা হইলে এই বিসদৃশ আচরণের আপনারা কি জবাবদিহি করিবেন? ধরিয়া লইলাম, কমলা নিজেকে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া চলিতেছে। কিন্তু এই মেলামেশার ফলে যদি তার মনে গভীর অনুরাগ জন্মে, তা অসম্ভব না, আর নরেশ তখন তার প্রত্যুত্তর না দিয়া সরিয়া পড়ে, তা হইলে একটি কোমল হৃদয়কে ও জীবনকে এমনভাবে ব্যর্থ করিবার জন্য কে দায়ী হইবে?

'আপনি আমাকে ভুল বুঝিবেন না। আপনাদের সমাজে প্রণয়-পরিণয় প্রচলিত আছে, তা জানি। পূর্ব্বরাগ অনুরাগ প্রভৃতি আপনাদের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। আমাদের দেশে হিন্দুসমাজেও ইহা সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত নহে। অপরিজ্ঞাত থাকিলে রাধা-কৃষ্ণের রাগানুরাগের কথা এত জন-প্রিয় হইতে পারিত না। এত কবি উহাই তাঁদের কাব্যের উপাদান করিতেন না। বস্তুত, বিবাহের পূর্ব্বে কুমারী কন্যার অনুরাগের কাহিনী এক্ষণে হিন্দু সমাজেও বহুল পরিমাণে শোনা যায়। আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান হইলেও কালের গতি সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট জ্ঞান রহিয়াছে। আমি জানি, হিন্দু সমাজে বিবাহযোগ্যা কন্যার বয়স ক্রমাগত বাড়িতে থাকিবে, আর পূর্ব্বরাগ দেখা দিবে। সেইজন্যই আমাদের আরও বেশী সাবধান হওয়া দরকার। আপনার ভগিনী ভালবাসিয়া বিবাহ করিবেন, ইহা ভাল কথা। কিন্তু তাই বলিয়া আপনাদের বাড়ীতে এমন আচরণ হইবে, যার কদর্থ করা লোকের পক্ষে সম্ভব, ইহা সঙ্গত নহে। সুতরাং আমার মিনতি এই, আপনি এমন ব্যবস্থা করুন যাতে আপনার ভগিনীর সহিত নরেশের বিবাহ অতি সত্বর সুসম্পাদিত হয়। আর দেরী হইলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

'আর একটি কথা ভাবিয়া দেখিবেন। আপনি যদি এক্ষণে নরেশের সহিত

কমলার মেলামেশা বন্ধ করিয়া দেন, তা যথেষ্ট হইবে না। এখন আশু প্রয়োজন বিবাহের। লোকের রসনা যেরূপ উগ্র হইয়া উঠিয়াছে, তাতে মান বাঁচাইবার পক্ষে কমলা-নরেশের বিবাহ অনিবার্য্য। নরেশকে বারণ করিয়া দিয়া লোকাপবাদ দূর করার পক্ষে বড দেরী হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে যদি কোন কারণে নরেশের সহিত কমলার বিবাহ না হয়, তা হইলে এখানকার সমাজ আপনাদের কোনক্রমে ক্ষমা করিবে না। কমলার অকলঙ্ক ললাটে যে কলঙ্কের তিলক আঁকিয়া দিয়াছে, তা দূর করিবার উপায় আর থাকিবে না। কমলা চিরকালের জন্য কলঙ্কের দাগ লইয়া থাকিবে। আপনি কি ইহা অনুমোদন করিবেন? এখন যা অবস্থা তাতে কমলাকে নরেশের হাতে দিয়া আপনারা বংশের সুনাম রক্ষা করুন। এ বিষয়ে কমলাকে বা নরেশকে শাসন করিয়া কোন লাভ হইবে না। বস্তুত, ইহাদের দোষ তত নয়, যত আপনার পরিবারের লোকদের। তাঁদের উৎসাহ না পাইলে কমলা ও নরেশ এমনভাবে মিশিতে পারিত না, দশের নিকট নিন্দাভাজনও হইত না। আপনারা সাবধান হন নাই। তজ্জন্য নরেশ বা কমলা কেন অন্য রকম ফল লাভ করিবে? তাদের বয়স বিবেচনা করিলে তারা ক্ষমার্হ।

'আপনাকে এই দীর্ঘ পত্র লেখার জন্য ক্ষমা করিবেন। কমলা আপনার পরম স্নেহের ভগিনী, সে জন্য আমাদের স্নেহের পাত্রী। কমলার ও পরিবারের নামে নিন্দা গ্লানি রটিত হইবে, ইহা আমার পক্ষে অসহ্য। আপনি দূরে আছেন বলিয়া সমস্ত বিষয় নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হইবেন। এই সময়ে আপনার সৎসাহসের প্রয়োজন। এই সৎসাহস আপনার জীবনে বহু বার দেখিয়াছি। আর এক বার তার প্রয়োজন হইয়াছে। কমলার ভবিষ্যৎ সুখের জন্য এবং আপনাদের পরিবারের সুনামের জন্য আপনি অবিলম্বে ব্যবস্থা করুন, এই প্রার্থনা। নচেৎ, আমা হেন পরকে কোন একটা পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে।'

পত্র-প্রেরক শ্রী নরহরি ভট্টাচার্য্য এক কালে কুমুদনাথের পরিচিত ছিলেন কি না স্মরণ নাই। চেষ্টা করিলেও তাকে আর মনে পড়ে না। চিঠিতে যথেষ্ট ভয় দেখান হইলেও উহা যে বেশ সংযত ভাবে লিখিত, তা স্বীকার করিতে হইবে। চিঠি পাইয়া কুমুদের মন খারাপ হইয়া গেল। কমলাকে নিয়া কি এত কাণ্ড হইয়া গিয়াছে? সে ত কিছুই জানে না। এখন কুমুদের কাছে সমস্যা এই যে, চিঠিতে লিখিত অভিযোগ সে বিশ্বাস করিবে কি না। সত্য বটে, কমলার জন্ম পাত্র অনুসন্ধানের কথা তার অজ্ঞাত নয়; সে কোন কোন পাত্র সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে তার মতামত জানাইয়াছে। নরেশের নাম তার কাছে একেবারে অপরিচিত নয়। সে কিছু দিন পূর্ব্বে নরেশের মনোনয়ন সমর্থন করিয়া পাঠাইয়াছে। কিন্তু একথাও সত্য, সে পরিবারের লোকদের নিকট হইতে দূরে বাস করিতেছে। দূরত্ব শুধু স্থানের নয়, মনেরও বটে। ব্রাহ্ম হওয়ার পর হইতে তার সঙ্গে পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ত ছিলই না, পরন্তু সম্পর্কটা নিতান্ত মামুলি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কুমুদনাথকে তার পিতা শেষ পর্য্যন্ত ত্যাগ করেন নাই, কিন্তু প্রয়োজন ভিন্ন যোগাযোগও রাখেন না। কমলা, আদরের কমলা, মাঝে মাঝে বৌদি ও দাদাকে চিঠি লেখে। দুই পরিবারের মধ্যে সে যেন বন্ধন—সেতু। সে কিছুতেই তার দাদা-বৌদিকে মন হইতে মুছিতে পারে না। হয়ত কেহই মুছে নাই। কিন্তু সে তাদের সংবাদ জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। আবার নিজেদের সংবাদ জানাইতেও তার উৎসাহের অন্ত নাই। কমলার চিঠি যেন নূতন এক জগতের বার্ত্তা বহন করিয়া আনে। কমলার চিঠি কুমুদ ও বীণা উভয়ের অত্যন্ত প্রিয় বস্তু। কিন্তু চিঠি পাইতে কুমুদের যত ভাল লাগে, লিখিতে তত ভাল লাগে না। সে কথা সে পূর্ব্বাহ্নেই কবুল করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং চিঠির জবাব দিতে হয় বীণাকে। ননদ-ভাজ দুজনে চিঠি লিখিতে ওস্তাদ। এ বিষয়ে কমলা কখনও কখনও অনুযোগ করে বৈ কি। তবে সে এই ব্যবস্থা মানিয়া লইয়াছে। কচিৎ দাদার চিঠি আসে। তখন তার আর আনন্দের সীমা থাকে না। কুমুদ নিজে ধর্ম্মান্তর

গ্রহণ করিয়াছে, তার জীবন-যাত্রার প্রণালী অন্য রকম হইয়া গিয়াছে, অন্তত সকলে তাই মনে করে, কিন্তু সে কোন দিন তার পরিবারস্থ কাহাকেও এই পথে টানিবার প্রয়াস করে নাই। কমলাকেও না। কিন্তু কালস্য কুটিলা গতিঃ। শ্রী নরহরি ভট্টাচার্য্যের অভিযোগে যদি কিছু সত্যতা থাকে, তা হইলে বলিতে হইবে, বিবাহের পূর্ব্বে কন্যাকে অবাধে অপরিচিত যুবকের সহিত মিশিতে দেওয়া হইতেছে। অপরিচিত যুবকটি নরেশ বলিয়াই বোধ হয়, তা সম্ভব হইয়াছে। তথাপি ইহা একটা বড় রকম পরিবর্ত্তন; এবং এই পরিবর্ত্তন বক্তৃতা বা উপদেশ দ্বারা হয় নাই, আপনি হইয়াছে। কালের গতির কাছে কে না পরাভব মানিবে? অথচ এই পরিবর্ত্তনে সে সুখী হইযাও সুখী হইতে পারিতেছে না। ইহা পরিহাস বটে।

নরেশ লোকটি দেখিতে কেমন? তাকে একবার দেখিবার জন্য কুমুদের আগ্রহ হয়। তার পরম স্নেহের ভগিনী কমলার মন যে ব্যক্তি হরণ করিয়াছে, তার সহিত পরিচিত হইবার ইচ্ছা হওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক। নরেশ সম্বন্ধে বীণার আগ্রহ আরও বেশী। সে ধরিয়া লইযাছে, এই বিবাহ হইবে। ইহা লইয়া তার জল্পনা-কল্পনার আব অন্ত নাই। বস্তুত, নরেশের খবর জানিবার পব হইতে বীণার প্রধান আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে নরেশ। সম্ভবত, বিবাহ-ব্যাপারে মেয়েদের অনন্ত কৌতূহল থাকে। বীণা ব্যতিক্রম নহে। তারপর, বীণার বয়সও এমন কিছু বেশী নয। নিজে ভালবাসিয়া বিবাহ করিয়াছে। কুমুদ তা লইয়া আজ পয্যন্ত তাকে অনেক ঠাট্টা করে। তা করুক। পুরুষ মানুষ,—নারীর মনের ব্যথা বুঝিবার সাধ্য ত নাই। সে কল্পনা করে, কমলাও আজ তার মত অবস্থায় উপনীত। এ পর্য্যন্ত সে কোন প্রমাণ পায় নাই, কমলা নরেশকে ভালবাসে। তথাপি ধরিয়া লইয়াছে, কমলা ভালবাসে। কুমুদ প্রতিবাদ করায় সে অনাবশ্যক তর্ক করিয়া তাকে নাকাল করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই চিঠি পড়িয়া তার মুখ সুন্দর হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এই হাসি উপভোগ করিবার

মত। মাথা নাড়িয়া বলিল, 'কেমন, তোমায় আগেই বলেছিলাম না?—আমার আন্দাজ ঠিক।'

'কি?'

'যে, কমলা ভালবাসে।'

'কিন্তু তা এই চিঠি পড়ে ত প্রমাণ হয় না। নরহরি সে বিষয়ে কিছু জানে না। আমাদের বাড়ী সম্বন্ধে সে যে রকম খবর রাখে, জান্‌লে নিশ্চয় তা চিঠিতে লিখ্‌ত।'

বীণা চিঠির এক স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, 'তা হলে তুমি চিঠি ভাল করে পড়নি। এই দেখ লেখা রয়েছে, আপনার ভগিনী ভালবাসিয়া বিবাহ করিবেন—'

'পড়েছি। বেশ ভাল করে পড়েছি। আর, একবারের বেশী পড়েছি। আর আমার নিজের স্ত্রী ছাড়া কেউ মনে করে না যে, আমার বুঝ্‌বার ক্ষমতা কম। আমার ছাত্রেরা একথা শুন্‌লে ক্ষেপে যাবে, আমি আগে থেকে সাবধান করে রাখ্‌লাম।'

'ওঃ, ভারী ছাত্র, তার আবার অহংকার! তুমি ত ঘুষ দিয়ে ছাত্র বশ করেছ।'

'বটে! ঘুষ বা ঘুষি দিয়ে ছাত্র বশ করা যায়, এ আমি জান্‌তাম না।'

'তুমি কিই বা জান। মনে কর, অনেক জান—'

'না, মনে করি না।'

'তুমি নিজে মনে না করতে পার, কিন্তু অনেকে, বিশেষত তোমার সহকর্ম্মীরা মনে করে—তুমি মনে কর অনেক জান।'

'তারা আর কি মনে করে?'

'হায়! তাও আমায় বলে দিতে হবে? এমন লোককে নিয়ে ঘর করায় কোন সুখ নাই।'

'বেশ ত, আর কাকে নিয়ে ঘর করতে চাও, বল; আমি তাকে ডেকে আনি।'

'নিশ্চয় বল্‌ব। তুমি কি মনে করেছ, আমি নাম বল্‌তে ভয় পাব? আমি চরিত্রহীনা বটে, কিন্তু ভীরু নই। আমার সেই ভালবাসার জনটির নাম আমি নিশ্চয়ই বল্‌তে পারি। শুধু তোমায় কেন, আমি জগতের সকলের সাম্‌নে, বল্‌তে পারি। চেঁচিয়ে বল্‌তে পারি।'

'চেঁচিয়ে বল্‌বার দরকার নাই, তাতে আমার বদনাম হবে। কানে কানে বল।'

'আচ্ছা, বল্‌ছি।' এই বলিয়া, আসিয়া কুমুদনাথের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'বল্‌ব? আচ্ছা, বলি। শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ দত্ত। ঐ যাঃ, বলে ফেল্লাম।' বীণা কুমুদের বুকে মুখ লুকাইল।

(কুমুদনাথ সস্নেহে স্ত্রীর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া তার ওষ্ঠপুটে একটি চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিল।) 'তা হলে এই লোকটিকে নিয়ে ঘর করতে চাও? আচ্ছা, দেখি খুঁজে, একে কোথায় পাওয়া যায়। আমি যদিও চিনি না, তবু মনে হয়, চেষ্টা করলে খুঁজে এনে দিতে পারব। স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করবার জন্য আমি একটু কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত আছি বৈ কি।'

'আচ্ছা মশায়, আপনি থামুন। আপনাকে আর কষ্ট স্বীকার করতে হবে না। (যে জিনিষ) খোঁজ করবার তা খোঁজ করলে বাধিত হই।'

'কি সে জিনিষ?'

'ছেলে।' বলিয়াই গভীর লজ্জায় মুখ নীচু করিল।

প্রত্যেক রমণীর মনে পুত্রের জন্য কামনা রহিয়াছে। বীণার এই আকাঙ্ক্ষা যে কত প্রবল তা কুমুদ জানে। সে বেশ কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'সময় ত যায়নি। অধীর হয়ো না।'

বীণা ভয়ে ভয়ে স্বামীর গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'আমায় ক্ষমা কর। তোমার মনে ব্যথা দিবার জন্য আমায় ক্ষমা কর।'

'আরে পাগল! এর মধ্যে ক্ষমার কি আছে?' কুমুদ স্ত্রীকে আদর করিতে করিতে বলিল, 'কিন্তু কৈ, বল্লে না ত কি ঘুষ দিয়ে ছাত্রদের বশ করেছি।'

'তার আমি কি জানি? তুমি জান। তুমি বল্‌তে পার।'

'তবে আমি বলি?'

'বল।'

'স্ত্রীর সঙ্গে সকলকে মিশ্‌তে দিয়ে।' কুমুদ ভাবিয়াছিল, গম্ভীরভাবে কথাটা বলিবে, কিন্তু শেষে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

'যাও, এমন বল্লে আমি আর কারও সাম্‌নে বেরুব না।'

'তুমিও যেমন, আমি কি নিজের কথা বল্‌ছি?'

'তবে কার কথা?'

'জান না, আমার নামে সবাই এই অপবাদ দেয়?'

'সবাই মানে তোমার সহকর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ ত। কিন্তু বিয়ে আর কদিন করেছ? বিয়ের আগে যখন অধ্যাপকতা করেছ, তখন কি ছেলেরা কম বশ ছিল?'

'তুমি এটা বুঝ্‌ছ না যে, মানুষের স্মরণশক্তি বড় কম। আমি অবিবাহিত অবস্থায় কি ছিলাম, তা লোকে ভুলে গেছে। মরুক্‌গে লোকের কথা। কমলার কথা কি বল্‌তে চাও শুনি।'

'সে ত বলেছি। কমলা ভালবাসে।'

'কাকে? নরেশকে?'

'তা ছাড়া আর কাকে? বোঝা ত যাচ্ছে আর কারও সঙ্গে মিশ্‌বার সুযোগ সে পায়নি।'

'উঁহু', বলিয়া কুমুদ মাথা নাড়িল। তারপর কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল, 'আচ্ছা, কমলা তোমায় যে চিঠি লিখেছে, তার শেষ আট দশ খানা নিয়ে এস ত।'

বীণা একতাড়া চিঠি আনিয়া কুমুদকে দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি করবে?'

'পরীক্ষা।' বাস্তবিক, কুমুদ কমলার চিঠিগুলি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িতে লাগিল। যদি কমলার মনের কথা কোথাও তার অজ্ঞাতসারে লেখনীর মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়া থাকে। কিছু বোঝা গেল না। সেরূপ স্পষ্ট

আভাষ কোথাও পাওয়া গেল না। কুমুদ মনে মনে কমলাকে চোখের সাম্‌নে দাঁড় করাইয়া বিচার করিতে লাগিল। এখন কমলা দেখিতে ঠিক কেমন ও কত বড় হইয়াছে, তা সে জানে না। তার আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত পরিচিত হওয়াও তার পক্ষে সম্ভব নয়। চিঠিগুলি হইতে শুধু একটা আনন্দে উজ্জ্বল স্বর ধরিতে পারিল। যেন নব-জীবনের চাঞ্চল্যে ভরপূর কমলা! খুসীতে ফাটিয়া পড়িতেছে। নিজেকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। কিন্তু যৌবন-সমাগমে অনেক নারীর এরূপ হয়। ইহা হইতে কল্পনা করা যায় না, কমলা কাহাকেও ভালবাসিতেছে। বীণা বলে, সে অন্ধ, তাই বুঝিতে পারে না। হয়ত অন্ধ। কিন্তু নিশ্চয়রূপে কিছু জানিতে না পারিলে সে অন্ধই থাকিয়া যাইবে।

ভালবাসার প্রশ্নের সহিত অবশ্য বিবাহের প্রশ্ন জড়িত নয়। সে জানিত, তাদের পরিবারে মেয়ের মনের গতি দেখিয়া বিবাহের কথা উঠিবে না। ছেলেটি সর্ব্বাংশে উপযুক্ত বিবেচিত হইলে তার সহিত কমলার বিবাহের কোন বাধা থাকিবে না। সে দিক্ দিয়া নরেশ নিশ্চয় উপযুক্ত। সুতরাং তার সহিত বিবাহে তার মত জিজ্ঞাসা করিলে সে সম্মতি দিতে ইতস্তত করে নাই। কমলা যদি সত্যই নরেশকে ভালবাসিয়া থাকে, তা হইলে ত আরও ভাল কথা। আর এরূপ উপযুক্ত ছেলেকে কমলা কেনই বা না ভালবাসিবে? নরহরির চিঠি উপেক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু নরেশের সহিত কমলার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে, এরূপ সংবাদ সে এ পর্য্যন্ত পায় নাই। তার মত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল মাত্র। তার পর বহু দিন অতীত হইয়াছে। অথচ তাদের পরিবারে নরেশ কমলার সহিত মিশিতেছে। সম্ভবত, এ সংবাদ সত্য। কারণ, মিথ্যা সংবাদ দিয়া নরহরির কোন লাভ নাই। আর সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসংবাদ এই যে, সহরে ইহা লইয়া আলোচনা হইয়াছে, কমলার নামে নিন্দা রটিত হইতেছে। ইহার একটা প্রতীকার আবশ্যক বৈ কি। কিন্তু কিছু করিবার আগে জানা দরকার, নরহরির কথা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য।

কুমুদনাথ বীণাকে বলিল, 'বীণা, তুমি কমলাকে চিঠি লেখ। নরেশের নাম করবে না, কিন্তু কৌশল করে এমন ভাবে লিখবে যেন সে নিজের ভালবাসার কথা স্বীকার করে বসে। দেখব তোমার মুন্সিয়ানার দৌড়। আমি না কি চিঠি লিখতে জানি না, এবার দেখি তুমি কি কর।'

'কেন, তুমিই লিখে দাও না?'

'ওরে বাস্‌রে, ননদ-ভাজে যে সব কথাবার্ত্তা চলতে পারে, ভাইবোনে তা কি চলে? বিশেষ ও আমার চেয়ে অনেক ছোট।'

'তা আমিও ত তোমার চেয়ে কিছু ছোট।'

'কিছু কেন? অনেক। তুমি ত কমলার চেয়ে দু তিন বৎসরের বড বৈ নয়। তা তুমি যদি কমলার সঙ্গে তোমার আসন পাত্‌তে চাও ত বল—'

বীণা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল, 'থাম, আর বল্‌তে হবে না।'

বীণা চিঠি লিখিয়া আনিল, কিন্তু কোন কোন জায়গা কুমুদের পছন্দ হইল না। তারপর দুইজনে মিলিয়া অনেক পরামর্শ ও কাটাকুটির পর বীণার স্বাক্ষরে এই চিঠি গেল: 'ভাই কমলা, অনেক দিন তোমায় দেখি না। এখন দেখতে ইচ্ছা করে। তোমার দাদা সব সময় নিজের কাজে ব্যস্ত। বিশেষত, এই গ্রীষ্মকালে তাঁর অবসর খুব কম। আমাকে অনেক সময় একা কাটাতে হয়! তখন কি ইচ্ছা করে জান? ইচ্ছা করে, আমার আদরের ননদিনীটির গলা জড়িয়ে ধরে নিজের সুখদুঃখের গল্প করি। তুমি এখানে থাকলে কি চমৎকার যে সময় কাটত, তা ভাবতেও আনন্দ হয়। আসবে তুমি আমাদের কাছে? যদি তুমি আসতে রাজী থাক, তা হলে গ্রীষ্মাবকাশ আরম্ভ হতেই তোমার দাদা তোমায় গিয়ে নিয়ে আসবেন। আর কতকালই বা তুমি বাপের ঘরে থাকবে! হয়ত আগামী গ্রীষ্মকালে আমাদের আদরের কমলা দিব্যি গিন্নীবান্নির মত শ্বশুর কুল উজ্জ্বল করছে, দেখতে পাব। আহা! সেদিন শীগ্‌গির আসুক। কিন্তু তার আগে আমরা না হয় তোমার সঙ্গ একটু পেলাম। না হয় তোমার বর তোমার

সুন্দর গাল দুটি টিপে দিবার আগে আমি একটু দিলাম। না হয় আমিই আগে জড়িয়ে ধরে চুমা খেলাম। পরে যে আস্‌বে, সে না হয় হিংসায় আমার দিকে তাকাবে না বা বেশী ভাত খাবে।

'কিন্তু এই দেখ, আমি নিজের সুখ আর আনন্দের কথা ভেবে তোমার কথা ভুলেই গেছি। আমি একথা ভাব্‌ছি না যে, তোমার মন এক্ষণি কারও চিন্তায় ভরপুর থাক্‌তে পারে। ভাব্‌ছি না যে- তোমার পক্ষে ওখানে এমন আকর্ষণের বস্তু থাক্‌তে পারে, যার কাছে বৌদি তুচ্ছ, বৌদির কাছে আসা অসম্ভব। আমায় মাপ কর, ভাই। আমি এ রকম সম্ভাবনার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আমার অবশ্য ভুলে যাওয়াটা ঠিক হয় নি। অন্তত, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা মনে রাখ্‌লে, আমি তোমার সম্বন্ধেও সাবধান হয়ে কথা বল্‌তাম। তবে না কি তোমার দাদার ও আমার তোমাকে দেখ্‌বার আগ্রহটা খুব প্রবল, তাই তোমায় আস্‌বার নিমন্ত্রণ করেছিলাম। কিন্তু না ভাই, তোমার মন যদি কোথাও আট্‌কে গিয়ে থাকে, তা হলে আমি আমার নিমন্ত্রণ ফিরিয়ে নিলাম। এ রকম নিমন্ত্রণ করে শাপের ভাগী হব কেন ?'

'বৌদিকে চুপি চুপি সত্যি কথাটা বলে ফেল না, ভাই। আমি কাউকে বল্‌ব না। তুমি যদি বল ত, তোমার দাদাকেও না। বল্‌বে ভাই সেই গোপন কথাটি ? আচ্ছা, আমি নাম জান্‌তে চাইব না। নাম জেনে আমার কিই বা হবে ? তুমি যাকে ভাল করে চেন, আমি তার মুখও দেখিনি। নাম বল্লেই ত আর লোকটা আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌বে না। লোকটির উপর আমার কিন্তু, ভাই, ভারী হিংসা হচ্ছে। হয়ত তোমার সব মনটিই সে দখল করে বসেছে। তার চেহারা ও স্বভাবচরিত্রের বর্ণনা তোমার কাছ থেকে শুন্‌তে পেলে আমি নিশ্চয়ই খুব খুসী হতাম। কিন্তু তাতে যদি তোমার আপত্তি থাকে, তা হলে তাও না হয় নাই শুন্‌লাম। পরে একদিন চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন নিশ্চয় হবে। আমি শুধু জান্‌তে চাইছি, সত্যি কি তুমি তাকে খুব ভালবেসে ফেলেছ ? এইটুকু আমায়

বল। এইটুকু জান্‌লেই আমি সন্তুষ্ট হব। দেখ আমার দাবী কত কম। আশা করি, মিট্‌বে। আর আমি ত, ভাই, তোমার ভালবাসায় ভাগ বসাতে যাব না। সুতরাং তুমি নিভয়ে বল্‌তে পার। সত্যি তুমি তাকে কেমনতর ভালবাস, তা জান্‌তে মরে যাচ্ছি। সে লোকটিকে দেখ্‌লেই বা তোমার কি কর্‌তে ইচ্ছা করে, আর না দেখ্‌লে কি রকম মনে হয়, বল্‌বে একবার? সেই কবে তোমার দাদাকে ভালবেসেছিলাম। ভুলে গেছি সব। তাই তোমার ভালবাসার মধ্য দিয়ে আমার সেই পুরাণ দিনগুলিকে আবার ফিরিয়ে পেতে চাই। তারপর জান ত, তোমার দাদার কাছে আমি ক্রমেই পুরাণ হয়ে যাচ্ছি। তোমার নতুন প্রেম থেকে আমি অনেক শিখ্‌ব আর উৎসাহ পাব। এমন কি, তোমার দাদাকে আবার নতুন করে ভালবাসাতে পার্‌ব। আমার আঁচল ছেড়ে কোথাও আর যেতে চাইবেন না। যেমন তোমার উনি এখন কর্‌ছেন।

'তোমাদের সকলের খবর দিও। গুরুজনদের প্রণাম দিও। কিন্তু তোমার সম্বন্ধে যা জান্‌তে চাইলাম, তা না লিখ্‌লে আমি আর চিঠি লিখ্‌ব না।—বৌদি।'

বীণা প্রায় শেষ কয় ছত্র, 'সেই কবে তোমার দাদাকে ভালবেসেছিলাম··· আমার আঁচল ছেড়ে যেতে চাইবেন না', লিখিতে চায় নাই। বড় নির্লজ্জপনা হয়। কিন্তু কুমুদ জোর করিয়া লিখাইয়াছে। মোসাবিদাও তার। এই চিঠি লিখিয়া সে খুব খুসী। ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারা হইয়াছে। কমলা ফাঁদে ধরা পড়িবেই। চিঠি শেষ করিয়া তার হাসি আর থামে না।

বীণা বলিল, 'অনেক সময় আমার মনে হয়, তুমি ওকালতি না করে গুরুগিরি কর্‌তে এলে কেন? ওকালতি কর্‌লে তুমি পসার কর্‌তে পার্‌তে, আমার বিশ্বাস।'

'জান, মাষ্টারি পেশা যে আমি ভেবে চিন্তে বেছেছি, তা নয়। হাতের কাছে যা জুট্‌ল, তাই নিলাম। ওকালতিতে হয়ত পসার হত। আমার

সহকর্ম্মীরাও অনেকে এ কথা বলে। এমন কি, অধ্যাপক হবার কিছু দিন পরে আমাকে তারা ওকালতি পাশ করতে খুব অনুরোধ করেছিল। কিন্তু পসার আমার নাও হতে পারত।'

বলা বাহুল্য, প্রশ্ন পুরাতন, উত্তরও পুরাতন। প্রথম প্রথম কুমুদনাথ এ বিষয়ে নিজের সম্বন্ধে বীণাকে অনেক গল্প বলিয়াছে, তাতে তার ওকালতি-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এখন সে সব আর প্রয়োজন হয় না।

সপ্তাহ না ঘুরিতেই কমলার চিঠি আসিল। 'বৌদি, তুমি দিন দিন কি হচ্ছ, বল দেখি? দাদা তোমায় দিন দিন আহ্লাদ দিয়ে মাথায় উঠিয়েছে। রোস, আমি একবার লক্ষ্ণৌ যাই, তারপর তোমায় মজা দেখাব। তখন দেখা যাবে, কে কার গাল টিপে দেয়। আমায় কচি খুকী পেয়েছ কি না। কিন্তু ছি ছি, তোমার কি কাণ্ড! তোমার চিঠি এলে পর মা বাবা দেখ্‌তে চান। বরাবর আমি দি। কিন্তু এ চিঠি আমি কি করে দি? এমন চিঠি কখনও লিখ্‌তে আছে? এই চিঠি যদি বাবা খুল্‌তেন, তা হলে, বল ত, আমার অবস্থা কি হত? লজ্জায় আমার মাথা রাখ্‌বার ঠাঁই থাক্‌ত না।

'ইনিয়ে বিনিয়ে কি যে তুমি জান্‌তে চেয়েছ, তা তুমিই জান। তুমি আমাকে ভেবেছ কি? ভেবেছ নেহাৎ বোকা একটা পাড়াগেঁয়ে মেয়ে। যা লিখ্‌ব, তাই বিশ্বাস করবে। যত বোকা, যত পাড়াগেঁয়ে হই, একথা ঠিক, দাদার প্রতি তোমার গভীর ও অবিচলিত ভালবাসার কথা আমি ভাল করেই জানি। দাদাকে ভালবাস্‌বার জন্য বা দাদার ভালবাসা পাবার জন্য আমার কাছে থেকে ভালবাসার কাহিনী পাওয়া দরকার, এ আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করব না, করব না। যাকে ইচ্ছা এই সব গল্প করবে, আমাকে নয়। আমি কোন দিন বিশ্বাস করব না।

'আমার আবার ভালবাসার জন কে হতে গেল? এ সব খবর তোমায় কানে কানে গিয়ে কে দিয়ে এল? বাতাস বুঝি। তাই আমি ভাবি, বৌদি সারা দিন বসে বসে করে কি? মনে মনে এত সব উপন্যাস রচনা করছ,

তা আমি কি জানি! কিন্তু নিজের উপন্যাসটি শেষ কর না কেন? এতদিনেও একটি ছেলে হল না, আমায় কচি মুখে পিসিমা ডাক্‌বার কেউ নাই, এ আপ্‌শোষ আমার যাবার নয়। একটি ছেলে এবার চাই। তা না হলে নোটিস্‌ দিয়ে রাখ্‌ছি, দাদার আবার বিয়ে দেব। এই কথা শুনে তুমি হাস্‌ছ বুঝি? ভাব্‌ছ, তোমাদের ব্রাহ্ম বিয়ে। দাদা আর বিয়ে কর্‌তে পার্‌বে না। আচ্ছা, দেখা যাক্‌, কিছু করতে পারি কি না। কিন্তু তোমায় আগে থেকে সাবধান করে দিলাম। লক্ষ্ণৌ যাবার আমার খুব ইচ্ছা। যেদিন নিয়ে যাবে সেদিন যাব। এখন বুঝ্‌ছ ত ভালবাসার জন কেউ নাই। কিন্তু শূন্য ঘরে, খোকাহীন ঘরে, আমি লক্ষ্ণৌ যেতে চাই না। তা তুমি যদি ভরসা দাও, বছর খানেকের মধ্যে ঘর পূর্ণ হবে, তা হলে আমি শূন্য ঘরে যেতে রাজী আছি।—কমলা।'

চিঠি পাইয়া কুমুদনাথের নিকট আসিয়া বীণা গালে হাত দিয়া বলিল, 'মাগো!'

'কেন, কি?'

'দেখ্‌লে, তোমার বোন্‌ কি চালাক! কিছুতেই ধরা দিতে চায় না।'

চিঠি পড়িয়া কুমুদ বলিল, 'উল্টে তোমায় ছেলে ছেলে বলে জব্দ করে দিয়েছে।'

'তা দেবে না? তোমারই ত বোন্‌।'

'যেন জব্দ করা আমার স্বভাব।'

'তাতে আর সন্দেহ কি? চিরকাল আমিই ত তোমার কাছে হার স্বীকার করে আস্‌ছি।'

'মোটেই না। কিন্তু তর্ক থাক।—তোমায় আবার চেষ্টা কর্‌তে হবে ঐ ধরণের চিঠি আবার লেখ।'

'আবার! এই চিঠি বাবার হাতে পড়্‌লে সত্যি ত লজ্জার সীমা পরিসীমা থাক্‌ত না। তোমার যখন জেদ্‌ হয়, তখন ত আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। আর আমায় দিয়ে চিঠি লিখিও না, বাবু।'

'তা, ননদ-ভাজের চিঠিতে রামায়ণ থাক্‌বে, না, হরিকথামৃত থাক্‌বে ? এতে লজ্জার কি আছে ? বাবা যদি সে চিঠি পড়্‌তেন, তা হলে তাঁর অন্যায় হোত। বাবাদের এ সব অন্যায়।'

বীণা হাসিল, 'তোমায় আর বাবা-মার ন্যায়-অন্যায় ঠিক করে দিতে হবে না।'

শেষ পর্যন্ত বীণাকে চিঠি লিখিতে হইল। লিখিলঃ 'ভাই কমলা—তোমার চিঠি পেয়ে আমার হরিষে বিষাদ হল। হরিষ—আমার আদরের ননদিনী চিঠি লিখেছে। বিষাদ—প্রথম, আমার বড় সাধের আশায় ছাই পড়েছে। কারণ, তুমি লিখেছ ঘর শূন্য থাক্‌লে তুমি আস্‌বে না। আমি, ভাই, এ বিষয়ে কথা দিতে পার্‌ছি না,—কবে একটি খোকা দিয়ে তোমার দাদার ঘরটি আলো কর্‌ব। এমন কি, কোন দিন আমার ছেলে হবে কি না তাও জানি না। আমার কি, ভাই, ছেলের অসাধ ? কিন্তু এ ত আমার হাতে নয়। যাঁর হাতে তিনি না দিলে আমার শুধু চোখের জল ফেলা সার হবে। তুমি শাসিয়েছ, ছেলে না হলে তুমি আবার তোমার দাদার বিয়ে দেবে। দাও না। কে মানা করেছে ? আমি বাধা দেব না, বরং তোমার সহায় হব। কিন্তু যে গোঁয়ার তোমার দাদা, তোমার বা আমার কথাতে কোন কাজ কর্‌তে তার বয়ে গেছে। ব্রাহ্ম বলে বাধা কি ? যেটুকু বাধা আছে সেটুকু একটু চেষ্টা কর্‌লেই সরিয়ে দেওয়া যায়।

'আচ্ছা, কমলা, তুমি এমন চাপা স্বভাবের কবে থেকে হলে ? বৌদি বুঝি তোমার পর ! তাই মনের কথা চেপে চিঠি লেখা অভ্যাস কর্‌ছ। আমি জান্‌তে চাইলাম, তুমি সত্যি কাউকে ভালবেসেছ কি না। সোজা প্রশ্ন। এর জবাবে ত একটি হাঁ বা না বলে তুমি আমার মুখ বন্ধ কর্‌তে পার্‌তে। বাস্তবিক, তার চেয়ে বেশী আমি কিছু চাইও নি। কিন্তু তুমি তার ধার দিয়েও গেলে না। উল্টে আমায় ধম্‌কালে,—আমার আবার ভালবাসার জন কে হল ? স্পষ্ট করে বল না, কেউ নাই। তোমায় আবার পাড়াগেঁয়ে, বোকা, কবে ভাব্‌লাম ? কমলা কখনও বোকা হতে পারে ?

এ কথা যে বল্‌বে আমি তার সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া করব। আমাকে ভুল বুঝো না, ভাই। আর তোমার দাদার ভালবাসার কথা! তুমি যদি আস্‌তে, তা হলে বুঝ্‌তে পার্‌তে তাতে ভাঁটা পড়েছে কি না। আর আমিও, ভাই, তাঁকে দোষ দি না। একে ত আজ পর্যন্ত আমি তাঁকে একটি ছেলে উপহার দিতে পারলাম না, তার উপর তাঁর কাজ এবং তাঁর ছাত্রেরা তাঁকে এমন পেয়ে বসেছে যে, তাঁর নিজের সময় বলে জিনিষটা ক্রমেই ছোট হয়ে আস্‌ছে। ছাত্রদের জন্য তিনি ত অবারিত-দ্বার। তাঁকে তারা কি ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে তা দেখ্‌লে আশ্চর্য হতে হয়। ক্রমে তারা তাঁর সবটুকু ভালবাসা কেড়ে নেবে বলে আমার আশঙ্কাটাকে একেবারে উড়িয়ে দিও না। তখন আমার কি অবস্থা হবে, বল। তাই, তোমার নতুন ভালবাসার স্বাদ পাবার জন্য কাঙ্গালপনা করেছি। দোষ হয়েছে কি, ভাই?

'তোমার চিঠির সুরে ধরে নিচ্ছি, তুমি কাউকে মন দাও নি। তুমি মুক্ত। এ কথা ভাব্‌তেও, তোমার উপর আমার হিংসা হয়। মন দেওয়ার যে কি জ্বালা, সে আমি জানি, ভাই। তোমার সে জ্বালা নাই, এতে আমি সুখী। তোমাকে মুক্ত জেনে তোমার দাদা এখানে তোমার জন্য ভারী সুন্দর একটি পাত্র ঠিক করেছেন। শীগ্‌গিরই তার সম্বন্ধে বাবাকে লিখ্‌বেন। ছেলেটির নাম রণজিৎ সরকার। লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারি আছে। নিজে এম. এস-সি. পাশ করেছে। নিখুঁত স্বভাব চরিত্র। বিনয়ী। আর এমন সুন্দর চেহারা যে, তার মুখ থেকে চোখ ফেরান যায় না। তুমি নিজে এলে বুঝ্‌তে পার্‌বে, ভদ্রলোক কি সুন্দর। তোমার নিশ্চয় পছন্দ হবে। ছেলেটি তোমার দাদার সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়েছে। আমাদের ইচ্ছা, রণজিৎকে বিয়ে করে আমাদের আদরের কমলা সুখী হয়। বোধ হয়, তোমাদের পরিবারে কারও আপত্তি হবে না। ভাই, এই রত্নটি তোমায় দেখাবার জন্য আমার এমন আগ্রহ হচ্ছে, কি বল্‌ব?'

চিঠি শেষ করিয়া বীণার সে কি হাসি! কুমুদ যত বলে, 'হাসি থামাও,'

সে তত বেশী করিয়া হাসে। শেষে বলিল, 'আচ্ছা, তুমি আমাকে দিয়ে এত মিথ্যা কথা লেখাবে?'

'তা, আমার বোনের মঙ্গলের জন্য তুমি না হয় একটু মিথ্যা লিখ্‌লে। লাখ টাকা ছাড়া রণজিৎ সম্বন্ধে আর সবই ত সত্যি কথা। নরেশের লাখ টাকার পাণ্টা লাখ টাকা চাই ত। সে কমলার জন্য নয়, বাবা-মার জন্য। নইলে তাঁদের মন ভিজ্‌বে কেন? তাঁদের কথা ভুলে যেও না।'

'কিন্তু কমলা কি জানে না যে, নরেশের কথা তোমায় লেখা হয়েছে?'

'হযত জানে। জান্‌লেই বা কি। আমি যে নরেশের সম্বন্ধে তার মন জান্‌তে চাইছি, সে বুঝ্‌বে না। কমলার সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব হচ্ছে, আমি এইমাত্র জানি। সে যে কমলার সঙ্গে মেলামেশা করছে, তা আমার জান্‌বার কথা নয। শ্রী নরহরি ভট্টাচাযা চিঠি না লিখ্‌লে আমার কোন সন্দেহ হত না। কিন্তু আমি তার চিঠি পেয়েছি, তা কমলা জানে না।'

কমলা উত্তর দিল: 'বৌদি ভাই, আমায় মাপ কর। আমি তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি জেনে এত দুঃখ হচ্ছে যে কি বল্‌ব। তুমি কি বুঝ্‌তে পার নি যে, আমি ঠাট্টা করে বলেছি,—দাদার ছেলে না হলে, আমি তোমাদের ওখানে যাব না? তুমি যে এই ঠাট্টায এত দুঃখ পাবে, আগে বুঝ্‌তে পারিনি। পার্‌লে, ঠাট্টাও কর্‌তাম না। অবশ্য, আমার বোঝা উচিত ছিল, এতে তোমার মনে কষ্ট হবে। আমি তোমার কাছে মাপ চাইছি। আশা করি, আমায ক্ষমা কর্‌বে। তুমি পত্রপাঠ লিখো যে ক্ষমা কর্‌লে। না হলে আমি মনে শান্তি পাব না।

'আচ্ছা, বৌদি ভাই, তুমি যখন দাদাকে ভালবেসেছিলে, তখন কি খুব ভালবেসেছিলে? কেমন মনে হত তখন তোমার? আচ্ছা, আমি বলি। পলকে প্রলয, না? মনে হত, দাদা যেন এক মুহূর্ত্ত চোখের আড়াল না হন। মনে হত, দাদার মত লোক পৃথিবীতে আর একটিও নাই। দিনরাত আমরা ত কত মুখ দেখি, আবার ভুলে যাই। কিন্তু এক একটি মুখের

কি যে অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণ থাকে, বল্‌তে পারি না। সে মুখ ভুল্‌ব, সাধ্য কি? ভোলা দূরের কথা, দিনরাত সকল কাজে, এমন কি স্বপ্নের মধ্যেও, সেই মুখ টান্‌তে থাকে। সেই টানে অস্থির হতে হয়। কি কর্‌ব ভেবে পাই না। প্রিয় জন আমাদেব হয়ত ঢের থাকে। কিন্তু একটি লোক সকলের চেয়ে প্রিয়, সকলের উপরে তার স্থান। সে যেন ক্রমাগত প্রিয় হতে প্রিয়তর, মিষ্ট হতে আরও মিষ্ট হয়। তার কথা শুন্‌তে ভাল লাগে। তার কাছে থাক্‌তে ভাল লাগে। সে যদি আমার দিকে একটু স্নেহভরে তাকায়, আমি কৃতার্থ হয়ে যাই। এই রকম আরও কত কি। বলে শেষ কবা যায় না। আচ্ছা বল ত, তোমার কথা আমি ঠিক লিখ্‌লাম কি না।

'ভাই বৌদি, তুমি নিশ্চয় বুঝেছ, তোমাদেব কমলা মরেছে। এর চেয়ে মরাও ভাল ছিল। কিন্তু আমি কি কর্‌ব ভাই? আমি ত সাধ করে তাঁকে ভালবাসি নি। তিনি আমায় যথাসম্ভব দূরে রেখে চলেছেন। আজও চল্‌ছেন। এমন কি, তাঁর ব্যবহারে আমায় সময় সময় মনে খুব ব্যথা পেতে হয। তবু ভাই, তিনি সেই একজন যাঁকে ভাল না বেসে থাকা যায না। তাঁকে আমি পাব কি পাব না, জানি না। তাঁর দিকে আমার মন দুর্দ্দান্ত বেগে ছুটে চলেছে। আমি জানি, আমি হিন্দু ঘরের মেয়ে। বাপ-মা আমাকে যাঁর সঙ্গে বিয়ে দেবেন, তাঁকেই মেনে নিতে হবে। এ সম্বন্ধে আমার কোন মতামত থাকা উচিত নয়। ছিলও না। কিন্তু আমার মন যদি শাসন না মানে, তা হলে আমি কি কর্‌তে পারি, বল? আমি জানি না, আমার কি হবে। যখন ভালবাসার কোন বালাই ছিল না, তখন বাপ-মা আমায় যাঁর হাতে দিতেন, তাকে নিয়েই সন্তুষ্টচিত্তে সারা জীবন কাটিয়ে দিতাম। কিন্তু এখন আর তা হবার জো নাই। যাঁকে ভালবেসেছি, হাঁ বৌদি ভাই, তোমার বুকে মুখ লুকিয়ে স্বীকার করছি, খুব ভালবেসেছি, তাঁকে না পেলে আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমি আর কারও হতে পার্‌ব না, তা নিশ্চয় জেন। তোমাদের আদরের

কমলাব কপালে শেষ পর্য্যন্ত কি আছে, কে জানে। তোমরা আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন শেষ পর্যান্ত তাঁকেই পাই।

'বৌদি ভাই, আজ আমার লজ্জা করলে চলে না বলেই এত কথা বল্লাম। তুমি যে তাঁর নাম-ধাম জানতে চাওনি, এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। ওদেশে দাদার নাম যাতুকর বলে কেউ কেউ রটিয়েছে। কিন্তু যাতুবিদ্যায তুমিও ত কম যাও না, ভাই। নইলে আমার পেটের কথা তুমি টেনে বের করলে কি করে? কে তোমায় বলে দিল, আমি কাউকে ভাল-বেসেছি? ভালই হল। আমি মন খোলসা করে বাঁচলাম। এত দিনে আমাব মনের গোপন কথাটি তুমি জানতে পেরেছ। এখন এ নিয়ে যত ইচ্ছা ঠাট্টা করতে পাব।'

কমলার আবরণ এত দিনে উন্মোচিত হইল। কমলা এত দিন যেন বালিকামাত্র ছিল, আজ নারীত্ব লাভ করিয়াছে। বীণা কমলার প্রতি এক অপূর্ব্ব সহানুভূতি ও সখিত্ব অনুভব করিল। কুমুদনাথ ও বীণার মনে সংশয় মাত্র রহিল না যে, কমলাব পরম ভালবাসার জনটি নরেশ। 'নরেশের উপর আমার হিংসা হচ্ছে'—এই কথা বলিয়া কমুদনাথ বীণার নিকট ছোট একটি কীল খাইল। মমতায পূর্ণ হইয়া বীণা বলিল, 'নরহরি ভট্টাচায্যের চিঠিতে মনে হয়, নরেশও কমলার অনুরাগী। তোমাদের পরিবার তার পক্ষপাতী। তা হলে দুজনের বিয়েতে দেরী হচ্ছে কেন?'

কুমুদনাথের একবার একটু সন্দেহ হইযাছিল, হয়ত কমলা যার কথা লিখিয়াছে, সে নরেশ নয়। কিন্তু নরেশ না হইলে আর কেই বা হইবে? আর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির সন্ধান ত মিলিতেছে না। নরহরির সূক্ষ্মদৃষ্টি এড়াইয়া নরেশ তাদের পরিবারে প্রবেশ করিতে বা মিশিতে পারে নাই। আর কেহ মিশিয়া থাকিলে নিশ্চয় ধরা পড়িয়া যাইত। নরহরি আর কারও কথা বলে নাই। সুতরাং ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, আর কেহ নাই। আর সরলা সংসার অনভিজ্ঞা কমলা! তার পক্ষে নরেশই যথেষ্ট। নরেশকে

দেখিয়াছে এবং মজিয়াছে। কমলার পক্ষে ভালবাসিয়া স্বীকারোক্তি করা সহজ জিনিষ নয়। সে নিশ্চয় এমন স্থানে আসিয়া পৌছিয়াছে, যেখানে আর নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। নরহরির অভিযোগের ঔচিত্য কুমুদ স্বীকার করিল। কিন্তু তার চিঠিব উত্তর দিতে সে প্রবৃত্ত হইল না। ভাবিল, অভিযোগের কারণ দূর করাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। উহা দূর হইলে নরহরির চিঠির উত্তর আপনা হইতে দেওয়া হইয়া যাইবে। কিন্তু কমলাকে লইয়া কি করা যায়? নরেশের সহিত কমলার মিলন হয়ত হইবে। একটু দেরী হইতেছে। এই দেরীটুকুও কি কমলা সহ্য করিতে পারিতেছে না? কমলার চিঠির মধ্যে একটা হতাশার স্বর বাজিতেছে। যেন তার ভালবাসার জনকে না পাওয়াই তার পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়া সে ধরিয়া লইয়াছে। কুমুদনাথ ইহার অর্থ বুঝিতে পারে না। কমলা নিশ্চয়ই জানে, নরেশের সহিতই তার বিবাহের প্রস্তাব হইতেছে, আর কারও সহিত নয়। তা হইলে তার মনে নিরাশার সুর বাজিয়া উঠে কেন? কুমুদনাথ মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিল, তার দুই প্রকার কারণ থাকিতে পারে। প্রথমত, কমলার ভালবাসার জন নরেশ না হইতে পারে। এ বিষয়ে বীণার সহিত তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হইল। বীণার মনেও যে কোন খট্‌কা নাই, তা নয়। কমলার ভালবাসার জনের নাম বীণা নিজেই জানিতে চাহে নাই। কমলা বলিবে বলিয়া মনে হয় না। এরূপ ভাবে নাম গোপন করিবার কোন কারণ আছে কি? নরহরিব চিঠি কিন্তু সন্দেহের অবকাশ দেয় না। ইতিমধ্যে সমস্ত সহরে কমলা ও নরেশের নাম একত্র জড়াইয়া গিয়াছে। লোকেরা না জানি কত মন্দ কথা বলিয়াছে! পরে আরও কত বলিবে। সে ঢেউ যখন কমলার কাছ পর্য্যন্ত পৌছিবে, তখন তার পক্ষে কি মর্ম্মান্তিক না হইবে! সম্ভব হইলে তার আগেই তাকে রক্ষা করা দরকার। দ্বিতীয়ত, নরেশ ও কমলার বিবাহের প্রস্তাব চলিতে থাকিলেও, কমলা হয়ত বুঝিয়াছে, সে নরেশেব সমগ্র মন জয় করিতে পারে নাই। কোন নারী, বিশেষত সে যদি সুন্দরী হয়, তা

হইলে, পুরুষের চিত্ত জয় করিতে পারিতেছে না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

কিন্তু নরেশ যদি কমলাকে ভাল না বাসে, তা হইলে সে নিয়মিত তাদের বাড়ী আসে কেন ?

নরেশের আচরণ রহস্যজনক হইলেও অস্বাভাবিক নহে। সে হয়ত আজও মন স্থির করিতে পারে নাই। হয়ত কমলার দিক্ হইতে যত আকর্ষণ হইয়াছে, তার দিক্ হইতে তত আকর্ষণ হয় নাই। তথাপি কমলার সহিত মিশিতে ভাল লাগে বলিয়া সে আসে। এমন কি, নারীর মর্য্যাদা ও সম্মান রক্ষা বিষয়ে তার ধারণা উচ্চ নাও হইতে পারে। হয়ত সুবিধা পাইলে সে রমণী সম্বন্ধে সকল প্রকার সুযোগ লইতে ইতস্তত করে না। আশা করা যাক্, নরেশ সে শ্রেণীর জীব নয়। ভবিষ্যতে যে তার ভগিনীপতি হইতে পারে, যাকে দেখিয়া কমলা মুগ্ধ হইয়াছে, সে সৎ ও উচ্চমনা হইবে, ইহাই কুমুদ স্বাভাবিক বলিয়া মনে করে।

কিন্তু নরেশ খুব সৎ হইলে সমস্যার সমাধান হয় না।

নরেশের সততা কমলাকে বিপদের মুখ হইতে রক্ষা করিবে। কিন্তু কমলার প্রাণভরা ভালবাসার জবাব আসিবে কোথা হইতে ? কমলার মন জানা গিয়াছে, কিন্তু নরেশের মন কি প্রকারে জানা যাইবে ? আশ্চয্য এই, কমলার চিঠিতে নিরাশার সুরের সন্ধান লইতে গিয়া ধরিতে হইল, কমলার ভালবাসার প্রতিদান নরেশ দিতেছে না, অথচ কমলার চিঠিতে তা লইয়া কোন প্রকার অনুযোগ নাই, বরং চাপা প্রশংসা আছে। কমলা হয়ত অন্ধ। নরেশের-চরিত্রের কোন প্রকার দোষ তার চোখে পড়ে না। এরূপ ক্ষেত্রে বিধাতার বিরুদ্ধে নালিশ করা স্বাভাবিক। সে তাও করে নাই। বরং সেই দিনের অপেক্ষা করিতেছে, যেদিন সে তার প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইতে পারিবে অর্থাৎ নরেশ সম্পূর্ণরূপে বিজিত হইবে।

কুমুদনাথ শীঘ্রই আর সব কথা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল। কি

করিয়া নরেশের সহিত কমলার বিবাহটা তাড়াতাড়ি হয়, এই হইল তার চিন্তা। তাড়াতাড়ি না হইলেই বা দোষ কি? কোন একদিন হইলেই হইল। কমলা সুখী হোক্।

বীণা চিঠিতে জানাইল, কমলার মনের গোপন কথাটি জনিয়া তাকে ঠাট্টা করিবার প্রবৃত্তি তার মোটেই নাই, বরং সে তার প্রতি গভীর মমতা ও সহানুভূতি বোধ করিতেছে। সে সবই বুঝিতে পারিয়াছে। কমলা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। একদিন তার প্রিয়তমের সহিত তার মিলন হইবেই। বীণা আশীর্ব্বাদ করিতেছে। সে দিন বড় দূরে নহে। তার মুখে যেদিন স্বর্গীয় সুখের হাসিটি ফুটিবে, সেদিন যেন গরীব বেচারা বৌদির কথা মনে থাকে। তার বৌদির ধন বা ঐশ্চর্য্য নাই বটে, কিন্তু হৃদয় আছে, এবং সেই হৃদয় ভরিয়া ভালবাসা আছে। সেই ভালবাসার কোনদিন অপ্রতুল হইবে না। কমলা যেন চিরদিন তার বৌদিকে বিশ্বাস করে ও তার উপর নির্ভর করে। কমলার সুখের জন্য তার যা সাধ্য তা সে করিবে।

৭

রমেন এক ইংরেজ সওদাগরি অফিসে কেরাণীর কাজ করে। প্রথম যখন সে চাকরীতে ঢুকিয়াছিল, তখন তার বেতন ছিল আশী টাকা। তের চৌদ্দ বৎসরে বাড়িয়া উহা দেড়শত টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এই অফিসে দুইটি সুবিধা আছে। প্রথম, তার যত টাকা মাহিনা প্রায় তত টাকাই দেওয়া হয়—প্রভিডেণ্ড ফণ্ড বাবদ্ অতি অল্প অংশ মাত্র কাটিয়া রাখা হয়। সে তার অনেক বন্ধুর জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে জানে, তাদের বেতন যত টাকায় নির্দ্দিষ্ট, তার চেয়ে ঢের কম টাকা ঘরে আসে। এক জনের বেতন আশী টাকা হইলে, সম্ভবত প্রতি মাসে সে দশ টাকা কম পায়। কিন্তু তাকে রসিদে সই করিতে হয় যে, সে আশী টাকা পাইয়াছে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, বাকী টাকাটা কি হয়, তা হইলে তার সদুত্তর

দেওয়া কঠিন। অফিস যদি শাখা-অফিস হয়, তা হইলে উহা যারা চালায়, তারা এইরূপে মোটা টাকা উপরি উপার্জ্জন করে। এই হিসাব উপরের অফিস কখনও জানিতে পারে না। কোন দুঃসাহসী কর্ম্মচারী কখনও এই রহস্য প্রকাশ করিলে তার চাকরী ত যায়ই, পরন্তু অফিসের সকল কর্ম্মচারীকে তজ্জন্য বিশেষ জরিমানা দিতে হয়। অন্য দিকে, হেড্ অফিসের পরিদর্শককে সহজেই বুঝান যায় যে, দুঃসাহসী ব্যক্তিটি মিথ্যা কথা বলিয়াছে এবং তাকে রাখা কোম্পানির পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। রমেনের কখনও এইরূপ অভিজ্ঞতা হইবার সম্ভাবনা নাই জানিয়া সে সুখী। দ্বিতীয়, বৎসরে বৎসরে মাহিনা আপনা হইতে বাড়ে। এজন্য কোন সুপারিশ, কোন খোসামোদের প্রয়োজন হয় না। কার্য্যপটুতা দেখাইলে বিশেষ উন্নতির ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু কাহারও সাধারণ উন্নতি ব্যাহত হয় না। ইহার একটা ফল এই হইযাছে যে, অফিসের কর্ম্মচারীরা সকলেই এই কোম্পানির শুভানুধ্যায়ী।

তথাপি এই কোম্পানির কর্ম্মচারীরা আর দশটা কোম্পানির চাকুরেদের মত গোলাম বই কিছুই নয়। আর এই কথা তাহাদিগকে অষ্টপ্রহর মনে করাইয়া দিবার জন্য লোকের অভাব নাই। তারা রমেনের নিজের দেশের লোক। রমেন প্রথম যখন এই অফিসে ভর্ত্তি হয়, তখন তার বয়স কাঁচা। আজ তার চেয়ে কনিষ্ঠ অনেক লোক কাজ করিতেছে। বয়স কম বলিযা সে সময়ে সে অনেকের নিকট আদর ও প্রশ্রয় পাইত। কেহ কেহ তাকে অকারণে আসিয়া সাহায্য করিত। কিন্তু সেদিনও তার চোখে দুইটি জিনিষ বিশেষ করিয়া ধরা পড়িয়াছিল। প্রথমটি, নিম্নতন কর্ম্মচারীদের প্রতি উচ্চতন কর্ম্মচারীদের অবিমিশ্র অন্যায় ও বিচারহীন ব্যবহার। বিন্দুমাত্র ভুলচুক্ হইলে, তা যতই অনিচ্ছাকৃত হোক্ না কেন, তার কোথাও ক্ষমা নাই। কত সামান্য কারণে সে কিরূপ লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছে এবং আজও হয়, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এক এক সময় তার মন বিদ্রোহী হইয়া

উঠিত। ভাবিত, চাকরী ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু তারপর নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া সকল অপমান স্বীকার করিয়া লইত। ক্রমে উহা গা-সহা হইয়া গেছে। এখন এই অবস্থাই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। ইহা লইয়া সে আর মাথা ঘামায় না। দ্বিতীয়টি, কর্ম্মচারীদের পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষ। সে এই অফিসে প্রবেশ করিয়া অবধি আজ পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিয়াছে, এক শ্রেণীর লোক কোন প্রকার কাজ না করিয়াও দিব্য চাকরী বজায় রাখিয়াছে ও বাৎসরিক উন্নতি ভোগ করিতেছে। বড় কেহ ইহাদের কৈফিয়ৎ চায় না। চাহিলেও ইহাদের দোষক্রটি সহজে ঢাকা পড়িয়া যায়। প্রথম প্রথম ইহাতে আশ্চর্য্য হইলেও, রমেন এখন আর আশ্চর্য্য হয় না। কারণ, ইহাদের অস্ত্র কি, তা সে জানে। ইহাদের একমাত্র ব্যবসা, সহকর্ম্মীদের নামে উপরওয়ালার নিকট সত্য-মিথ্যা লাগান। পশ্চাতে থাকিয়া দংশনের প্রবৃত্তি কর্ম্মচারীদের মধ্যে বড়ই প্রবল। সুযোগ পাইলে কেহ কাহাকেও ছাড়ে না। এ পর-নিন্দা নয়, পর-নিন্দার চেয়ে ভয়াবহ ও ক্ষতিকর। কে যে কাহার বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করিতেছে, জানিবার উপায় নাই। এমন কত দিন হইয়াছে, রমেন আগের দিন ভাল কাজ করিয়া হাসিমুখে অফিসে ঢুকিতেছে, এমন সময় তার উপরে ডাক হইল। তারপর সমস্ত দিনটাই তিক্ত হইয়া গেছে। সে যে কি দোষ করিয়াছে কিছুই বুঝিল না, অনর্থক কতকগুলি তিরস্কার লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিল। হয়ত, কেহ অসাবধান হইয়া বড় বাবুর নামে টিপ্পনি কাটিয়াছে। তাঁর কানে সে বার্ত্তা পৌছাইয়া দিবার লোকের অভাব হয় না এবং পরদিন সেই হতভাগ্যের আর লাঞ্ছনার অবধি থাকে না। রমেন প্রথম প্রথম ইহা লইয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হইত এবং অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে যা খুসী বলিয়া গায়ের জ্বালা নিবারণ করিত। কিন্তু দেখিল, তাতে ফল ভাল না হইয়া খারাপ হয়। সুতরাং সে অভ্যাস সে ত্যাগ করিয়াছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাঙ্গালী সব চেয়ে বেশী বাঙ্গালীর শত্রুতা করে।

তাদের অফিসে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অনেক চাকুরে আছে। অন্য প্রদেশের লোকেরা স্বভাবত ন্যায়পরায়ণ এবং তাদের প্রবৃত্তি এরূপ হীন নহে। বড় বাবুটি বোধ হয় অনেক অফিসেই অদ্ভুত পদার্থ-বিশেষ। তাঁকে সুখী করিতে সকলেই সচেষ্ট। সেজন্য বিবেক-বুদ্ধি জলাঞ্জলি দিতেও পশ্চাৎপদ না হইবার লোকের অভাব নাই। সকলেই বড বাবুকে খুসী করিতে চায়। সুতরাং তাঁর প্রিয়পাত্র হইবার জন্য ভীষণ প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে। ইহাই জীবন-যুদ্ধ। এই যুদ্ধে যে জেতে সেই ভাগ্যবান্। ইহার জন্য কোন উপায়ই নিন্দনীয় নহে। এই অফিসে মাহিনা বৎসর বৎসর বাড়ে। তথাপি বড় বাবুকে খুসী করিবার কি প্রয়োজন, এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। বাস্তবিক প্রয়োজন হয়ত কিছু নাই। 'গুরুতর কারণ ব্যতীত এখানে কাহারও চাকরী যায় না বা বাৎসরিক উন্নতি বন্ধ হয় না। তাতে বড বাবুর হাত সামান্য মাত্র। সুতরাং বলিতে হয়, তাঁকে খুসী করার এই নিরন্তর চেষ্টা বাঙ্গালীর অন্যতম স্বভাব। এজন্য তাকে দোষ দেওয়া যায় না। আরও একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বড বাবু বা অন্য উৰ্দ্ধতন কৰ্ম্মচারী অন্যায় বা অবিচার করিলে, সাহস করিয়া কেহ বড় বা ছোট সাহেবের গোচর করিতে পারিলে, তার পুনৰ্ব্বিচার হয়। কিন্তু সেই সাহস বেশী লোকে করে না। তার প্রধান কারণ, অধিকাংশ কৰ্ম্মচারীর মনে এই ভয় রহিয়াছে যে, তাদের ইংরেজি জ্ঞান এমন নহে যে, তারা নিজের মনের কথা গুছাইয়া বলিতে পারিবে। একে বিদেশী ভাষা, তার উপর মনিবদের কাছে, বিলাতী মনিবদের কাছে, বলিতে হইবে, কি বলিতে কি বলিয়া বসিবে, কে জানে। অত হাঙ্গামে কাজ কি বাপু? একটা কথা বলিলে পাঁচটা কথা জিজ্ঞাসা করিবে, তার উত্তর দিতে গলদ্ঘৰ্ম্ম হইতে হইবে। তার চেয়ে বড বাবুকে খুসী করিবার চেষ্টা করা সহজ। কিন্তু যখনই কেহ কোন অভিযোগ সাহেবদের কাছে লইয়া গিয়াছে, তখনই সাহেবেরা সুবিচারের জন্য চেষ্টা করিয়াছে, ইহা রমেন লক্ষ্য করিয়াছে। এই জন্য আগে রমেন তার অভিযোগ সোজা তাঁদের নিকট করিত। কিন্তু এখন আর তাঁদের

নিকট যায় না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, তার সহকর্মীরা তার উপরে বড়ই অসন্তুষ্ট হইত। তারা মনে করিত, রমেন নিজের ইংরেজি শিক্ষাপটুত্বের গর্বে আর বাঁচে না। এই গর্ব্ব অশোভন। কেহ তাকে ক্ষমা করিত না, নানাবিধ তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে বিদ্ধ করিত। রমেন দেখিল, বিপদ্। সকলের অপ্রীতিভাজন কেহ হইতে চায় না। তার চেয়ে অবিচার, অসম্মান ও অন্যায় ব্যবহার ভাল। তা তখনকার মত মনকে বিক্ষুব্ধ করে। তারপর তার দাগ মন হইতে মুছিয়া যায়। সতীর্থদের পরশ্রীকাতরতায় তার খুব লাগে। একের অন্যের নামে লাগাইবার প্রবৃত্তিকে সে অত্যন্ত ঘৃণা করে। সে অনেক চিন্তা করিয়াও এই প্রবৃত্তির কারণ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। ইহা লইয়া কোন কথা কাহাকেও বলা চলে না। সকলেই জানে, অফিসে এইরূপ হয়। যখন যে ব্যক্তি জালে পড়ে, তখন সে তার লাঞ্ছনা-অপমানের পর আসিয়া সকলকে শুনাইয়া কোন অনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশে গালাগালি করে। সকলে তা উপভোগ করে। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে বলিলে আর রক্ষা থাকিবে না। একেবারে আগুন জলিবে। সকলেই এ কাজ গোপনে করে। সুতরাং কারও বিরুদ্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। কিন্তু বলিতে হইলে আন্দাজে বলিতে হয়। আন্দাজে বলার অনেক অসুবিধা। যে আন্দাজে কথা বলে, তাকে সকলে মিলিয়া বাঘের মত আক্রমণ করে। সে বেচারা আর পলাইবার পথ পায় না। বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হইতে থাকে।

কিন্তু ইহারা পরস্পর সুখে দুঃখে সহায় হয় না, মনে করিলে ভুল হইবে। প্রায় প্রত্যেকেই অন্যের বাড়ীর খবর রাখে। কোন পারিবারিক সমস্যা উপস্থিত হইলে পরস্পর আলোচনা করে, বর্ষীয়ান্দের কাছে পরামর্শ চায়। ইহারা অনেক কথা এমন অক্লেশে সকলের সামনে উচ্চারণ করে যে, শুনিলে লজ্জিত হইতে হয়। কাহারও ব্যারাম-পীড়া হইলে তার বাড়ী গিয়া সংবাদ লয়। সর্ব্বপ্রকারে পীড়িত ব্যক্তির কিছু সেবা করিবার প্রয়াস পায়। কেহ কেহ কখনও কোন পীড়িত সহকর্মী বা তার ছেলেমেয়ের জন্য নিজ গাঁটের

পয়সা খরচ করিয়া কল কিনিয়া দিয়া আসে। তারপর যাদের অবস্থা একটু ভাল, শনি-রবিবারে তাদের বাড়ীতে তাসপাশার আড্ডা বসে। তাতে পাড়াপ্রতিবেশীরা থাকে, আর সহকর্মীরাও কেহ কেহ থাকে। অফিসে আসিয়া প্রত্যেকে অন্যদের সুপ্রভাত জানাইয়া তবে নিজের জায়গায় গিয়া বসে। কাহাকেও বিষণ্ণ দেখিলে কারণ জিজ্ঞাসা করে এবং উহা জ্ঞাত হইয়া সহানুভূতি দেখায়। আবার কেহ আনন্দে উল্লসিত থাকিলে অন্যেরাও তার সুখের ভাগ পায়। একজন কেহ শাস্তি পাইলে বা অপমানিত হইলে অন্যেরা উল্লসিত হয় না। এমন কি, তার এই শাস্তি বা অপমান যদি কাহারও গোপন লাগানর ফলে হয়, তা হইলে সেও খুসী হয় না বা আহ্লাদ প্রকাশ করে না। কাজ করিবার কালে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন চরিত্র প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কেহ রসিক, মাঝে মাঝে সকলে তার কথায় হাসিয়া উঠে। কেহ সহজে চটে, তাকে সকলে মিলিয়া ক্ষেপায়। কেহ ভাবুক প্রকৃতির, তার কাছে সবাই কবিতা অথবা স্ত্রীর পত্র আব্দার করে। এ যেন একটা স্বতন্ত্র জগৎ। কেরাণীদের জগৎ। তাদের হাসিকান্না সুখদুঃখ প্রতিফলিত হইয়া উঠে। মানুষগুলি প্রতি দিন দিবাভাগের ছয় ঘণ্টা এইখানে কাটায়। প্রতি দিনের জীবন হইতে ছয় ঘণ্টা সময় কম নহে। সেই সময়কার জন্য ইহাদের কার্য্যকলাপ তুচ্ছ নয়। অফিসের কাজ একঘেয়ে কাজ, কিন্তু জীবন একঘেয়ে নহে। প্রতি দিন নব নব তরঙ্গ উঠে। প্রতি দিন নব রূপে দেখা দেয়। লোকগুলি এক। স্থান এক। তারই মধ্যে জীবনের বিচিত্র লীলা ফুটিয়া উঠে। তারই মধ্যে মানুষের নূতন পরিচয়, এবং তজ্জন্য বিস্ময়। বিস্ময় এখন কমিয়া গিয়াছে। কারণ, ক্রমাগত আবিষ্কারে বিস্ময় কাটিয়া যায়, তখন নূতন আবিষ্কার প্রত্যাশিত হইয়া উঠে। এই জীবনের সহিত আসিয়া রমেন নিজের জীবন মিলাইয়াছে।

অফিসে ইহাদের প্রধান আনন্দের বিষয়, থিয়েটার ও বায়স্কোপের নূতন বই লইয়া আলোচনা। ছবি দেখিতে ত ভালবাসেই, উপরন্তু কোন নাটক

দেখাই বাদ যায় না। যার আয় খুব কম, সেও স্ত্রী-পুত্র লইয়া এই আমোদ উপভোগ করিতে বিরত হয় না। নারায়ণগঞ্জের মত মফস্বল সহরে প্রচুর ছবি বা নাটকের আমদানি হয় না। তাতে কি? একই বিষয় বার বার দেখায় ত আপত্তি নাই। ইহা লইয়া আবার অফিসে বসিয়া হিসাব হয়, কে কোন্ ছবি বা নাটক কত বার দেখিয়াছে। দেখাও যেন প্রতিযোগিতার বিষয়। যে জেতে সে বিশেষ আত্মপ্রসাদ ও গর্ব্ব অনুভব করে। তারপর নাটক ও ছবির বিষয়-বস্তু লইয়া ইহাদের আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক যেন ফুরাইতে চায় না। অভিনয়-নৈপুণ্য সম্বন্ধে সকলের মত একপ্রকার নহে। অথচ সকলেই প্রমাণ করিতে ব্যস্ত, একমাত্র তার মত গ্রহণযোগ্য। আবার কেহ কেহ নাটকের আলোচনা মাত্র করিয়া সন্তুষ্ট হয় না। নাটকের কোন পাত্র বা পাত্রী সাজিয়া দর্শক সহকর্ম্মীদের সম্মুখে অভিনয় করিয়া বিশেষ তৃপ্তি পায়। বিশেষ বিশেষ পাত্রপাত্রীর বক্তব্য ইহাদের মুখস্থ। আর মুখস্থ না থাকিলেই বা ক্ষতি কি? পকেট হইতে জরাজীর্ণ বইখানি বাহির করিয়া তা হইতে উচ্চরবে আবৃত্তি করিতে আর কতক্ষণ লাগে? থিয়েটার বা ছবির মোহ বোধ হয় বাঙ্গালী চরিত্রের বিশেষত্ব। রাষ্ট্রনীতির ব্যাপারেও সে এমন ভাবে তাতিয়া উঠে কি না সন্দেহ। এই একটি বিষয়ে সে কখনও ক্লান্তি বোধ করে না। তার পেটে অন্ন, গায়ে বস্ত্র, না থাকিতে পারে, সংসারে অভাব-অনটন নিরন্তর কষাঘাত করিতে পারে, কিন্তু থিয়েটার তার দেখা চাই, অন্তত ছবি, এবং পরদিন পান চিবাইতে চিবাইতে সে সম্বন্ধে অফিসে বিস্তৃত সমালোচনাও তার করা চাই। ইহারা থিয়েটার বা ছবির যে আলোচনা করে, তা একটুও উচ্চ অঙ্গের নহে। অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে উচ্চ স্তরের সাহিত্য-প্রীতি বা সাহিত্য-রস গ্রহণের ক্ষমতা নাই। বহু লোকের পড়াশুনার অভ্যাস লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ সস্তা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস, বাজে বাংলা উপন্যাস, বড় জোর শরৎচন্দ্রের দুএকখানি উপন্যাস পড়ে—ভাল ইংরেজি উপন্যাস পড়া ত দূরের কথা। বিশ্বের

সাহিত্য জগতের কোন খবর রাখে না। ভাল বই সম্বন্ধে ইহাদের অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্যের সীমা নাই। ইহাদের অন্তঃপুরিকারা প্রচুর পরিমাণে বাংলা উপন্যাস পড়ে। কিন্তু সেগুলির অধিকাংশ অত্যন্ত নোংরা ও অপাঠ্য। তথাপি বার বার সেগুলি গৃহলক্ষ্মীদের ও কন্যাদের হাতে দিতে ইহাদের বাধে না। দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের পর হইতে ইহারা নিয়মিতভাবে খবরের কাগজ পড়ে। এইটুকু উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু সেই পড়ার পিছনে কোন মনন শক্তি নাই। গান্ধী, মতিলাল, চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে দুএকটা টীকাটিপ্পনি কাটে বা হয়ত কিছুক্ষণ আলোচনাও করে। তাতে প্রকাশ পায়, ইহাদের অন্তরে দেশ-প্রীতি সঞ্চিত আছে। কিন্তু দেশের জন্য কোনপ্রকার ত্যাগ করিতে ইহারা অক্ষম। দেশকে ভালবাসিলে কি হইবে? পেটের চিন্তা সকলের আগে করিতে হয়। স্ত্রীর গায়ের গয়নার কথা আগে ভাবিতে হয়। ছেলে-মেয়ের জামাজুতা আগে দরকার।

রমেন এই সব জীবনের সহিত নিজ জীবন যোগ দিয়াছে বটে, কিন্তু আজ পর্যন্ত ইহাদের সহিত মিলিতে পারে নাই, ইহাদের একজন হইতে পারে নাই। প্রথম প্রথম সে ইহাদের অত্যন্ত সংকীর্ণ জীবন-যাত্রা দেখিয়া মনে পীড়া অনুভব করিত। এখন গা-সহা হইয়া যাইতেছে। তখন যেমন দোতলা হইতে উদাসভাবে শীতলক্ষা নদীর দিকে তাকাইয়া ভাবিত, এখনও ভাবে। অন্যকে জোর করিয়া নিজের মতে আনা ও চালান রমেনের স্বভাব নয়। কি ঘরে, কি বাহিরে, সে কোন দিন পথ-নির্দ্দেশ করে না। তার নিজ পথ হইতে সে সহসা চ্যুত হইতে চায় না। কিন্তু তাই বলিয়া অন্যকে সে জোর করিয়া বলিবে না, 'এই পথে এস।' সে অপেক্ষা করিয়া থাকিবে, অন্যে তার পথ ও মতের শ্রেষ্ঠতা বুঝিয়া সেই পথ ও মত অবলম্বন করিবে। সুতরাং তার সহকর্ম্মীদের আচরণ বা আলোচনা তার মনঃপূত না হইলে সে চুপ করিয়া থাকে। এত বড় অফিসে সেজন্য সে নিজেকে বড়ই একাকী মনে করে। সে যেন নিজের জগৎ নিজে। সে যে কার সঙ্গে মেশে না বা হাসি ও তামাসায়

যোগ দেয় না, তা নয়। কিন্তু সে নিজের অন্তরে জানে, সে ইহাদের একজন নয়। নিজেকে সে ইহাদের ঊর্দ্ধে স্থাপন করে না, কিংবা তার ব্যবহারে এমন ভাব প্রকাশ পায় না, সে ইহাদিগকে তাচ্ছিল্য করে, তথাপি সে অন্তরে চিরকাল উপবাসী হইয়া রহিয়াছে। পাঁচজনের মধ্যে ভুলিয়া থাকিবার বিদ্যা সে এত দিনে নিশ্চয় আয়ত্ত করিয়াছে,—এমন কি, কারও কারও সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতাও হইয়াছে,—কিন্তু সে যে এমন এক লোকে আসিয়া পড়িয়াছে যেখানে তার স্থান নয়, তা সে জানে। অন্যেরা তা লক্ষ্য করে কি না, তা সে জানে না। কিন্তু সে বড়ই একাকী বোধ করে।

বড় একা সে। ঘরে ও বাহিরে সর্ব্বত্র সে একা। সকল লোকের সহিত মেশে,—এমন কি, লোকে বলে তার মিশিবার ক্ষমতা অদ্ভুত, সে অল্প দিনে নিজের নম্র ও শান্ত ব্যবহার দ্বারা সকলকে বশ করে। সকলের সহিত সে হাসিয়া গল্প করে। কিন্তু তবু কোথাও তার ঠাঁই নাই। না নিজ-গৃহে, না পর-সম্মেলনে। ঘরে যারা পর, তারা সাধারণত পরের নিকট আপনার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লয়। কিন্তু রমেনের স্থান কোথাও নাই। সে তার এই অবস্থাকে মানিয়া লইয়াছে। সে অন্য দশজনের মধ্যে একজন হইয়া নিজের একাকীত্ব ঘুচাইবার অনেক প্রয়াস পাইয়াছে, কিন্তু সফল হইতে পারে নাই। নিজের মনে যে একা, কে তাকে সঙ্গীযুক্ত করিবে?

হাঁ, অফিসে রমেনের একমাত্র পরম বন্ধু শীতলক্ষা নদী। এই নদীর সঙ্গে তার পরিচয় বহু দিনের। ছেলেবেলায় ইহার তীরে যখন আসিয়াছে, তখন সেই প্রথম সাক্ষাতের সময় হইতে, ইহার সহিত এক নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। এই নদীকে সে কত ভালবাসে, ইহার প্রতি তার টান কিরূপ প্রবল, তা সে বহু দিন বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু এই অফিসে চাকরি করিতে আসিয়া বুঝিল, শীতলক্ষাকে তার কত প্রয়োজন। সে যেখানে বসে সেখান হইতে জানালা দিয়া শীতলক্ষা দেখা যায়। অনেক সময় কাজের মধ্যে ডুবিয়া থাকে বলিয়া, ভুলিয়া যায়, শীতলক্ষা কাছে রহিয়াছে। কিন্তু

তের চৌদ্দ বৎসরে এই নদী তার অত্যন্ত আপনার জন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তার সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার, এমন কি মনের গোপনতম চিন্তার, অংশীদার যেন শীতলক্ষা। সে ইহাকে সব কিছু নিবেদন করিয়া তৃপ্তি পায়। এই বন্ধুর নিকট গোপন করিবার মত যেন কিছুই নাই। শীতলক্ষা না থাকিলে রমেনের কি অবস্থা হইত সে কল্পনাও করিতে পারে না। অথচ অফিসের আর সবাই, এমন কি সহরের লোকেরাও, এই নদী সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন। প্রাতে ও সন্ধ্যায় বালকেরা ও যুবকেরা হয়ত বেড়াইতে আসে, কিন্তু এই নদীর বুকে ক্ষণে ক্ষণে যে অপরূপ শোভা ফুটিয়া উঠে তা তারা দেখে না। রমেন যেখানে ভাষাহারা হইয়া দাঁড়ায়, অন্যেরা সেখানে অত্যন্ত বাজে বিষয় লইয়াও মুখর। নদীর জন্য মোহ তার দিন দিন বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। এই নদীকে ভাল না বাসিয়া যেন তার উপায় নাই। ইহাকে মনে মনে সে নূতন করিয়া নিরন্তর সৃষ্টি করিতেছে।

আরও এক বন্ধুতার জন্য মনে মনে সে কাঙ্গাল। সে কমলা। নদীর সঙ্গে কমলার এক আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। সে অনেক দিন সন্ধ্যার পর নৌকা ভাড়া করিয়া কমলাঘাট পর্য্যন্ত বা আরও দূরে গিয়াছে। একা। কারণ, সমস্ত সৌন্দর্য্য সে প্রাণমন দিয়া ভোগ করিতে চায়। নদীর জল হাত দিয়া স্পর্শ করিয়াছে, স্থিরনেত্রে উহার ঢেউয়ের দিকে, উহার তলদেশে, তাকাইয়া রহিয়াছে। জল কি শীতল! স্রোত ধীর। কল কল জলস্রোতে কি যেন আহ্বান-গীত ধ্বনিয়া উঠে! নদীর বুকে ও আকাশে সূর্য্যাস্তের শোভার আকর্ষণ কে বর্ণিতে পারে? ধীরগতি কমলার অন্তরের বার্ত্তা যদি কেহ আকাশের গায়ে লিখিয়া দিত, তা হইলে কি লেখা ফুটিয়া উঠিত? নদীর মত কমলার আকর্ষণ। নদীর কাছে যত বার ইচ্ছা যাওয়া যায়, স্পর্শ করা যায়, অবগাহন করাও চলে। কিন্তু কমলার কাছে যাওয়া সহজ হইলেও, তাকে কি স্পর্শ করা যায়? স্পর্শের জন্য মন যে লালায়িত হইয়া উঠে। রমেন অনুভব করিতেছে, সে যেন কমলার প্রতি দিন দিন অধিকতর আকর্ষণ অনুভব করিতেছে। কমলার

চোখেও যেন কি ভাষা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে কি আত্ম-সমর্পণের ভাষা? রমেন কোথাও ছুটিয়া পলাইতে পারিলে বাঁচে। সে গোপনে দরখাস্ত করিয়াছে, তাকে যেন কলিকাতার অফিসে বদ্‌লি করা হয়। সে কমলাকে ভুলিতে পারিবে না। কিন্তু কলিকাতার কর্ম্মস্রোতে—দবে—নিজেকে হারাইয়া দিয়া সে সান্ত্বনা পাইবার চেষ্টা করিবে। সে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছে, তার দরখাস্ত যেন মঞ্জুর হয়। অথচ মঞ্জুর হইলে, সে-ব্যথাও কম নয়। প্রথমত, কমলা চোখের আড়ালে চলিয়া যাইবে। তারপর এই স্নেহের আত্মীয় পরিজন, এমন কি অফিসের সহকর্ম্মীদের ছাড়িয়া যাইতে মন ব্যথায় ভরিয়া উঠে বৈ কি। সেই বিদায় দিনের কথা মনে করিলে মন বিষণ্ণ হইয়া যায়। তবু রমেনকে এই সহর ছাড়িয়া যাইতে হইবে। তার নিজের জন্য। কমলার জন্যও বটে। এবং নরেশের জন্য। নরেশ আজকাল প্রত্যহ কমলাদের বাড়ী আসে। ইহাতে সে ঈর্ষা অনুভব করে কি? ঠিক ঈর্ষা নয়। কারণ, কমলার সহিত নরেশের পরিচয়ের মূলে ত সে নিজে। এ কথা সে বুঝিতে পারিয়াছে, কমলার পরিবারের লোকেরা নরেশ-কমলার মিলনের জন্য সমুৎসুক হইয়াছে। সেও ত নিজের অন্তরকে একদিন প্রবোধ দিয়াছিল, সে যখন নিজে কমলাকে লাভ করিতে পারিবে না, তখন কেনই বা নরেশ তাকে লাভ করিবার চেষ্টা না করিবে? কমলার সহিত প্রথম পরিচয়ের দিন আজ বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহার মধ্যে তার মনের উপর দিয়া ক্রমাগত অনেক ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে। আজ সে দূরে যাইবার জন্য ব্যাকুল। কমলার প্রতি ভালবাসা কমিয়া গিয়াছে বলিয়া নয়। কমলার জন্য তার হৃদয়াবেগ যদি প্রশমিত হইত, তা হইলেই বরং সে এখানে থাকিতে সাহস করিত। কলিকাতায় সে যাইতে চায় বটে। কিন্তু সেখানে ত শীতলক্ষা নাই। তার বন্ধু শীতলক্ষা নদী। দরদী। কলিকাতায় থাকিবে, না কমলা, না শীতলক্ষা। তা হইলে তার দিন কাটিবে কি করিয়া? কমলার জন্য যখন তার মন অহরহ কাঁদিতে থাকিবে, তখন শীতলক্ষার দিকে চাহিয়া তার সান্ত্বনা পাইবার আর উপায়

থাকিবে না। শীতলক্ষা না থাকুক্, কলিকাতায় গঙ্গা আছে। সেখানে রাত্রিতে গঙ্গা-বক্ষে লক্ষ আলো জ্বলিয়া উঠে। সেই আলোকমালা শোভিত জলরাশির দিকে তাকাইয়া সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিবে। সেখানে কমলার কথা ভাবিতে কেহ তাকে বাঁধা দিবে না। কেহ কমলার নামে শতপ্রকার অভিযোগ করিয়া তার মনকে তিক্ত করিতে আসিবে না। মনে হয়, সে কমলাকে আরও নিকট করিয়া পাইবে। আপাতত বিদায়ের আগে পর্য্যন্ত শীতলক্ষাকে—এবং কমলাকে—প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইবে। এতদিন সে কমলাকে কতকটা এড়াইয়া চলিয়াছে। তাকে যখন শীঘ্রই ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে, তখন আর এড়াইয়া চলিবার প্রযোজন নাই। নিবিবার আগে প্রদীপ একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠে। তাতে কেহ দোষ ধরে না। সেও যদি নিবিবার আগে, কমলার জগৎ হইতে অদৃশ্য, হয়ত চিরতরে অদৃশ্য হইবার আগে, একটু অনুরাগ-ভরে জ্বলিয়া উঠে তা হইলে কি দোষের হইবে ?- তা হইলে কি কমলা দোষ ধরিবে ?

অন্য একটি কারণেও সে এই অফিস ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে চায়। ইদানীং সে তার চরিত্রের অবনতি লক্ষ্য করিয়া শঙ্কিত হইয়াছে। এই সংকীর্ণ, দীন কেরাণী জীবনের সহিত সে কোন দিন নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারে নাই। ইহাদের মধ্যে থাকিয়াও সে ইহাদের একজন ছিল না। এই একাকীত্বে সে দুঃখ পাইয়াছে, ইহা ঘুচাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু ইহার জন্য তার মনে মনে একটা গর্ব্ব ও মমতা ছিল। অধুনা তার সেই নিষ্কলুষতার অটুট বর্ম্মে যেন ফাটল ধরিয়াছে। সে ক্রমে যেন ইহাদের একজন হইয়া যাইতেছে। এই জীবন-যাত্রার প্রতি যেন ধীরে ধীরে তার একটা মায়া জন্মিতেছে। তের চৌদ্দ বৎসরের সঙ্গীদের প্রভাব ত কম নয়। সে ইহা নিজের পক্ষে অধঃপতন বলিয়া মনে করে। এজন্য সে চিন্তিত ও ভীত। প্রথম যখন সে চাকরী গ্রহণ করে,—সে বড বাবুর খোসামোদ না করিয়াই চাকরী পায়,—তখন দুএকজন হিতৈষী তাকে সৎপরামর্শ দিতে আসে। তারা বলে,

রমেনের যা বিদ্যাবুদ্ধি আছে তাতে সে অনেক উন্নতি করিতে পারিবে। কিন্তু তাদের পরামর্শ শুনিয়া চলিলে তার উন্নতি দ্রুত হইবে, নচেৎ হইবে না।

'পরামর্শটা কি ?'

'না, অন্যদের দুর্ব্বলতা ও ভুলত্রুটির সুযোগ গ্রহণ।'

'সে কি রকম ?'

'ভুল ত সকলেরই হয়।'

'তা হয়।'

'অফিসে বসে বেফাঁস কথাবার্ত্তাও অনেকে বলে।'

'তা বলে।'

'এইগুলি কাজে খাটাতে হবে।'

'বুঝা গেল না।'

'এ সব কথা লুকিয়ে বড বাবুর কাছে লাগালে, তিনি অত্যন্ত খুসী হবেন।'

'কি, আমি গোয়েন্দাগিরি করব ?' রমেন ত চটিয়া লাল। ভাগ্যে চীৎকার করিয়া বলা ও অন্যের নামে দশজনের কাছে নালিশ করা তার স্বভাব নয়, নহিলে হিতৈষীরা বিপদে পড়িত।

কার্য্যস্থলে সে কোন দিন মিথ্যা কথা বলে নাই, উপরি লয় নাই। উপরি কি জিনিষ, তার পরিচয় সে চাকরী জীবনে প্রবেশ করামাত্র বুঝিতে পারিয়াছিল। বাহিরের খরিদ্দার যে কত রকম প্রলোভন দেখাইতে পারে, আগে সে তা ধারণা করিতে পারিত না। এখন বোধ হয় শুধু এই বিষয় লইয়া সে এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিতে পারে। জুয়াচুরি-বিদ্যার চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছে। আর তার পূর্ণ সুযোগ নেয় না এমন কেরাণী দুর্ল্লভ। বড় বাবু স্বয়ং এ বিষয়ে অত্যন্ত উদার। তিনি বলেন, ইহা ঘুষ নয়, উপরিও নয়, উপহার মাত্র। কেহ যদি আদর করিয়া উপহার দেয়, তা হইলে তা না লওয়া অভদ্রতা ও অসৌজন্যের পরিচয় মাত্র। আর অত ভাল, অত ধর্ম্ম-পুত্র যুধিষ্ঠির, না হয় নাই হইলাম। সংসারের নিরানব্বই জন যে পথে

অর্থোপার্জ্জন করিতেছে, নিজের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে, আমি সে পথ ছাড়িয়া অন্য পথ ধরিতে যাই কেন? পিতা পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ আর কিছু অগৌরবের বিষয় নয়। সুতরাং উপহার লইতে কাহারও মানা নাই। শুধু সাহেবেরা যেন না জানিতে পারে। উপহার লইতে যেন মানা নাই, কিন্তু কোম্পানির ক্ষতি করিয়া উপহার গ্রহণ কোন্ শাস্ত্র দ্বারা অনুমোদিত,—এ কথা বড় বা ছোট বাবুদের জিজ্ঞাসা করিবার সাহস নিম্নতন কর্ম্মচারীদের নাই। অবশ্য নিম্নতন কর্ম্মচারীরা মহাজনদের পথেরই অনুবর্ত্তী। তাদের যুক্তি অন্য রকম। তারা স্বীকার করে, কাজটা অন্যায়। কিন্তু বেতন হিসাবে তারা যা পায় তা এত কম যে, তা দ্বারা তাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। সুতরাং উপরি গ্রহণ করিয়া তাদের নিজ পরিবারদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে হয়। পরন্তু থিয়েটার ও ছবির পয়সাও জুটে। গিন্নীকে মাসে না হোক্ মাঝে মাঝে দুএকখানা অলঙ্কার দেওয়া চলে। গিন্নীরা জানিতে চায় না, এই স্বল্প আয় হইতে অলঙ্কার কি করিয়া হয়। জানিলেও অসন্তুষ্ট হয় না। তারা অলঙ্কার পাইলেই খুসী। আর মাঝে মাঝে থিয়েটার ও ছবিও দেখা চাই বৈ কি। যদি বলা যায়, না হয় দারিদ্র্য-দুঃখ বরণ করিয়া সৎপথেই থাকিলে, তা হইলে কেরাণীরা তা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। পয়সা উপার্জ্জনের এই ত সময়। এখন উপার্জ্জন না করিলে আর কবে করিবে? আগে অর্থোপার্জ্জন করি, তারপর না হয় ধর্ম্মচিন্তায় মন দেওয়া যাইবে।

বলা বাহুল্য, রমেনের কোন দিন এরূপ প্রবৃত্তি হয় নাই। সে নিজের উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। সে জন্য সে কাজ দেখায়, খাটে। অন্যায় পথে এক পয়সা উপার্জ্জন করে নাই। কখনও যে লোভে পড়ে নাই, তা নয়। লোকে বাড়ী আসিয়া গোপনে তাকে টাকা দিতে চাহিয়াছে। সে তা লইলে কেহ জানিতে পারিত না। তার পরিবারের অভাব-অনটনের পক্ষে সে টাকা দেবতার আশীর্ব্বাদের মত। তবু সে তা প্রতিবার ফিরাইয়া

দিয়াছে। অফিসেও সে এক কপর্দ্দক গ্রহণ করে নাই। সহকর্ম্মীরা তাকে শুচিবায়ুগ্রস্ত বলিয়া উপহাস করিয়াছে। সে তা মাথা পাতিয়া লইয়াছে। কিন্তু নিজ গৃহে ইহা লইয়া তাকে বহু উপহাস ও ক্রোধের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তার এই অর্থ-বিমুখীনতাকে,—সকলে এই নাম দিয়াছে,—কেহ ভাল চোখে দেখে না। ইহা যে তার নির্ব্বুদ্ধিতা সে বিষয়ে কারও মনে সন্দেহ নাই। তার যদি প্রচুর আয় থাকিত, তা হইলে কেহ কি তাকে উপরি পাওনা গ্রহণ করিতে বলিত? সে নিজে জানে, স্বীকার করে, অফিসের সকলের এই অভ্যাস আছে। তা হইলে সে একা কেন ক্ষতিগ্রস্ত হয়? অন্য সকলে যে কাজ স্বচ্ছন্দে করিতেছে, তা অন্যায় হইতে পারে না। আর যদিই বা অন্যায় হয়, তা হইলে ক্ষতি কি? পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য পালনের স্থান কি সকলের উপরে নয়? যেখানে সে বুঝিতেছে, আপনা হইতে আগত অর্থ লইলে সে পরিজনদের বহু দুঃখ-ক্লেশ নিবারণ করিতে পারে, সেখানে তা না লওয়া শুধু মূঢ়তা নয়, কর্ত্তব্যে ত্রুটিও ঘটে। তার কাজের ফলে তার পরিবারের লোকেরাই বঞ্চিত হইতেছে। এরূপভাবে তাদের বঞ্চিত করিবার অধিকার তার নাই। সকলে যা করে, সেও তা করুক্ না। কিন্তু এ বিষয়ে রমেনের মন বড় দৃঢ়। সে নমিত হইতে চায় না। ঘুষের টাকা হাত দিয়া ধরিতেও তার ঘৃণা বোধ হয়। আশ্চর্য্য এই, তার এই সাধুতার জন্য সে যে লোকের অধিকতর সম্মান আকর্ষণ করে, তা নয়। বরং সকলেই মনে করে, এমন একদিন আসিবে যেদিন রমেনের এই নির্ব্বুদ্ধিতা দূর হইবে, সে আর দশজনের মত স্বচ্ছন্দে এই উপায়ে নিজ আয় বাড়াইবে। সেদিন সকলে মিলিয়া তাকে আর একবার উপহাস করিবে। সকলে যেন সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছে।

এত দিনে রমেন কেরাণী জীবনের মর্ম্ম ভাল করিয়া বুঝিয়াছে। ইহাও বুঝিয়াছে, কেরাণীর পক্ষে আর সব প্রলোভন ত্যাগ করা সম্ভব, কিন্তু টাকার প্রলোভন ত্যাগ করা সম্ভব নহে। কেরাণীর জগৎ একে ত অতি ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ,

স্বার্থপর জগৎ, সেখানকার আবহাওয়া দূষিত হইয়াই আছে, তার উপর ইহাদের অনটন এত বেশী যে, হাতে উপরি টাকা আসিলে অন্য সব চিন্তা ইহাদের মন হইতে মুছিয়া যায়। ইহাদের অর্থ নাই বলিয়া অর্থের প্রতি প্রলোভন দারুণ। সে অর্থ অসৎ উপায়ে ঘরে আসিলে তা লইয়া যখন ঘরে ও পরে কেহই ধিক্কার দেয় না, বরঞ্চ বুদ্ধির প্রশংসা করে, তখন সাধুতার জন্য ইহাদের আকর্ষণ থাকিবে না, তাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। বস্তুত, যারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করে, তারা এক বিশেষ উচ্চশ্রেণীর জীব বলিয়া সমাজে মান পায়। সকল শ্রেণীর লোক তাদের প্রশংসা ও খোসামোদ করে। এরূপ অবস্থায় সৎপথে থাকিয়া দরিদ্র হইবার আদর্শ কে গ্রহণ করিতে পারে ?

কিছুদিন হইল, রমেনের দৃঢ়তা কেমন যেন শিথিল হইয়া গিয়াছে। আজও সে কোন উপরি লয় নাই, হয়ত ভবিষ্যতেও লইবে না। কিন্তু দারিদ্র্যের কষাঘাতে এবং পরিজনদের কথার আঘাতে তার কখনও কখনও মনে হইয়াছে, সে হয়ত তার দুর্জ্জয় পণ রাখিতে পারিবে না। মনে মনে সে কল্পনা করিয়াছে, সেও যেন এইরূপে প্রচুর উপার্জ্জন করিতেছে। সে জানে, সে চেষ্টা করিলে এইরূপে কিছু কালের মধ্যে বহু অর্থ ঘরে আনিতে পারিবে, এমন কি তার ধনবান্ হওয়াও অসম্ভব নয়। কারণ, সম্প্রতি তাদের কোম্পানির পাটের কারবারে বিপুল লাভ হইতেছে। আর তা সে-ই তদারক করে। কোম্পানি যেখানে হাজার হাজার টাকা পায়, সেখানে তার পক্ষে মাসে কয়েক শত টাকা বাহির করিয়া লওয়া কিছুই শক্ত ব্যাপার নয়। রমেন নিজের কাছে স্বীকার করিবে, এই মধুর প্রলোভন তাকে সম্প্রতি পাইয়া বসিয়াছে। সেজন্যও সে নারায়ণগঞ্জ ত্যাগ করিতে চায়। স্থান ত্যাগ করিলেও যে প্রলোভন তার পিছনে তাড়া করিবে না, কে বলিবে ? প্রলোভন জয়লাভ করিলে সে নিজ পরিজনদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইতে পারে, জীবন-সংগ্রাম সহজ হয়। কিন্তু শুধু পরিজনদের সুখের কথা ভাবাতেই কি প্রলোভন মোহিনী মূর্ত্তি ধরিয়াছে ? উহার সহিত কি আর কারও কোন যোগাযোগ নাই ? বর্ত্তমান

আর্থিক অবস্থায় বিবাহ করা রমেন অন্যায় মনে করে। তার অবস্থা স্বচ্ছল হইলে সে নিশ্চয় বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারিত। হাঁ, আলাদিনের প্রদীপের সাহায্যে রমেন যদি রাতারাতি বড় লোক হইয়া যায়, তা হইলে কাল গিয়া সে নির্ভয়ে ও স্বচ্ছন্দে কমলার কাছে বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারে। সে অবশ্য কোন দিন নরেশের মত ধনী হইতে পারিবে না। কিন্তু তব যথেষ্ট ধনী হইতে পারে। এক বৎসরের মধ্যে পারে। সেই আলাদিনের প্রদীপ তার হাতে আসিয়াছে। সম্প্রতি বড় সাহেব নিজে ডাকিয়া তাকে পাটের ভাণ্ডারী নিযুক্ত করিয়াছেন। এত বড় বিশ্বাসের কাজ পূর্ব্বে বাঙ্গালীকে দেওয়া হইত না। অবশ্য এই কাজে সাহেবরা যে বেতন পাইত, সে তা পায় না। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। সে যেন এতদিনে কুবেরের ঐশ্বর্য্য-গৃহের চাবি-কাঠি পাইয়াছে। এখন এই চাবি ব্যবহার করিলেই হয়। এত কাল ত চলিয়া গিয়াছে। রমেন অনেক চেষ্টা করিয়াও তার অবস্থার উন্নতি করিতে পারে নাই। আজ যদি সে নিজের পদমর্য্যাদার সুযোগ লইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করে, তা হইলে পরিবারের প্রত্যেকের মুখে হাসি ত ফুটিবেই, কারণ প্রত্যেকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িবে, নিজেও কোন না নিজের স্বর্গনীড় রচনা করিতে সমর্থ হইবে। সত্য বটে, বড় সাহেব তাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন,—ইহারা প্রতি কর্ম্মচারীর সম্বন্ধে যে খবর রাখেন তা আশ্চর্য্য,—তাকে অত্যন্ত বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্য মনে করেন বলিয়াই, বহু ব্যক্তিকে ছাড়াইয়া এই পদ তাকে দেওয়া হইতেছে। ইহা সত্য, সে এই বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখিতে না পারিলে নিজের কাছে চিরদাগী হইয়া থাকিবে। কিন্তু পৃথিবী বিপুল, কাল নিরবধি। তার বিশ্বাসঘাতকতা কে মনে করিয়া রাখিবে? কেহ মনে রাখিলেও কালে তা বিস্মৃত হইবে। অথচ কত না সুখ, শান্তি ও সম্পদের অধিকারী সে হইতে পারে। প্রলোভন শয়তান হইয়া যেন তাকে টানিতেছে। তার মনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে। সে কলিকাতায় পলাইয়া গিয়া এই দ্বন্দ্বের হাত হইতে মুক্তি পাইতে চায়।

তৃতীয় আর একটি কারণে রমেন নারায়ণগঞ্জে থাকিতে চায় না। সম্প্রতি তার যে পদোন্নতি ঘটিয়াছে, তাতে তার প্রতি অনেকে ঈর্ষান্বিত হইয়াছে। যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ না হইলেও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল, তারা যদি বিমুখ হইয়া দাঁড়ায় তা হইলে তার পক্ষে চাকরী যে সুখকর হয় না, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। অল্প কয়েক দিন মাত্র আগে ছোট সাহেব তাকে নিজ কামরায় ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। খুব হৃদ্যভাবে কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসার পর তিনি জানিতে চাহেন, অফিসে তার শত্রু কেহ আছে কি না। তাঁর প্রশ্নের ধরণে বিস্মিত হইয়া রমেন জানিতে চায়, শত্রু বলিতে তিনি কি বুঝেন। সাহেব তেমনি সহাস্যবদনে বলেন, কেহ তার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিলে তাকে শত্রু বলা যাইতে পারে।

কি রকম অনিষ্ট ?

সাহেব তখন টাইপ করা এক দীর্ঘ পত্র তার হাতে দেন। সেই পত্রের মর্ম্ম এই যে, রমেনকে তাঁরা পাটের ভাণ্ডারী নিযুক্ত করিয়া ভাল করিয়াছেন কি না বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। কোম্পানির নিরন্তর শুভানুধ্যায়ী কর্ম্মচারীরূপে তারা যে রমেনের এই নিয়োগে উদ্বিগ্ন হইয়াছে, তা গোপন করিয়া লাভ নাই। রমেনের বিরুদ্ধে তারা কোন কথা বলিতে চায় না, যদিও তার নৈতিক জীবন খুব আদর্শস্থানীয় না হইতে পারে। যে কার্য্যে সে নিযুক্ত হইয়াছে তাতে অসীম প্রলোভন। এই প্রলোভন কাটাইয়া উঠা রমেনের পক্ষে সম্ভব হইবে কি না, ইহাই হইল প্রশ্ন। তারা কোন ভবিষ্যদ্বাণী করিতে চায় না। বরং রমেনের পূর্ণ যোগ্যতা প্রমাণিত হইলে তারাই সর্ব্বাপেক্ষা সুখী হইবে। কিন্তু তা হইবে কি? সে বিষয়ে তারা ঘোর সন্দেহ প্রকাশ করিতেছে। গরীবের ছেলে বেচারা রমেনকে এইরূপ প্রলোভনের মধ্যে ফেলায় তারা কর্ত্তৃপক্ষের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারিতেছে না।

রমেন এই পত্র দেখিয়া বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া গেল। সাহেব বলিলেন,

রমেনের বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই। তাঁরা সকল কর্ম্মচারীকেই ভাল করিয়া জানেন। রমেনকে বর্ত্তমানে ভার দিয়া ভাল করিয়াছেন, কি মন্দ করিয়াছেন, তা তাঁরা বুঝিবেন। এ বিষয়ে কর্ম্মচারীদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া তাঁরা নীতি স্থির করিবেন না। তিনি শুধু জানিতে চাহেন, কাহাকে বা কাহাদের এই পত্র-প্রেরক বলিয়া তার সন্দেহ হয়।

রমেনের হয়ত কাহাকেও কাহাকেও সন্দেহ হয়। কিন্তু সাহেবকে তার প্রতি বিশ্বাসের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিল, তার পক্ষে কাহাকেও নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া সম্ভব নহে।

ইহার পর অবিলম্বে সকল কর্ম্মচারীর মধ্যে উপর হইতে এক পত্র জারি হইল। তার মর্ম্ম এইরূপ ঃ কোম্পানির অবলম্বিত নীতি বা নিয়োগ সম্বন্ধে কোন প্রকার পরামর্শ-দান বা সমালোচনা কর্ম্মচারীদের অধিকার-বহির্ভূত বিষয়। বলা বাহুল্য, এই পত্র দ্বারা রমেনের উপর তার সহকর্ম্মীদের প্রীতি বাড়িল না। তারা বহু প্রকার বক্রোক্তি করিয়া তাকে অপদস্থ করিল। অথচ সে যে কাহারও নাম না করাতে সকলে সমূহ ক্ষতি হইতে রক্ষা পাইয়াছে, সে কথা কেহ বুঝিতে চেষ্টা করিল না, সেও বুঝাইল না। কারও কথার উত্তর দিতে পর্য্যন্ত তার প্রবৃত্তি হইল না। রক্ষা এই, সে শীঘ্র এই স্থান ছাড়িয়া যাইবে।

আজকাল প্রায় সে নারায়ণগঞ্জ ষ্টীমার ঘাটে যায়। ধোঁয়া ছড়াইয়া ষ্টীমার চলিয়া গেলে সেদিকে সে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে। গোয়ালন্দগামী এক ষ্টীমারে একদিন হয়ত তাকে এই স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। বারটা একটার সময় যখন গোয়ালন্দ-কলিকাতাগামী ষ্টীমার জোরে জোরে বাঁশী বাজায়, তখন অফিসে বসিয়া কাজ করিতে করিতে তার মন চঞ্চল হইয়া উঠে। কলেজ-জীবনে গঙ্গার ঘাট হইতে সে অনেক দিন সাগরগামী জাহাজের দিকে চাহিয়া কত না কল্পনা করিয়াছে। ভাবিয়াছে, ইয়োরোপে, বিশেষত ইংল্যাণ্ডে, গিয়া একদিন তার সাধের স্বপ্ন সফল করিবে। সেই দিন, সেই

কল্পনা আর ফিরিয়া আসিবে না। এখন কলিকাতা যাত্রাই তার চূড়ান্ত কল্পনা। কলিকাতায় যে জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছে, সেই সুন্দর ও উন্নত জীবন, সেই মদির যৌবন, আর সে ফিরিয়া পাইবে না। তবু সেই অতি-পরিচিত কলিকাতা! সেই সময়ে তার বাপ কাজ করিতেন। অর্থের স্বচ্ছলতা ছিল। তিনি রেলে কাজ করিয়া যা উপার্জ্জন করিতেন, তাতে পরিবারকে যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যে রাখিয়া রমেনকে যে হাতখরচ দিতেন, তাতে সে রাজার হালে থাকিত। সে দিন আর নাই। কোন এক গুরুতর অপরাধের জন্য পিতা কর্ম্মচ্যুত হন। অবসর-কালে যা কিছু সুবিধা পাইবার কথা ছিল, তার কিছুই পান নাই। সহসা একদিন বৃহৎ সংসারের সমস্ত ভার তার ঘাড়ে আসিয়া পড়িল। ভাগ্যে সে ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের তোরণগুলি অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাই তার সান্ত্বনা। কলিকাতার সেই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শময় জীবন যেন তাকে বার বার আহ্বান করিতে লাগিল।

শীতলক্ষা নদীর তীরে বেড়াইতে বেড়াইতে রমেন নিজ জীবনের কথা ভাবিতেছিল। তার চিন্তার মধ্যে কমলা বার বার আনাগোনা করিতেছিল। দুঃসহ দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম, তার প্রতি সহকর্মীদের বিদ্বেষ, নিজ অন্তরে অসৎ উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের জন্য প্রলোভন, তার সমস্ত সুখ-চিন্তাকে ছাপাইয়া তাকে মাঝে মাঝে বিমনা করিয়া ফেলিতেছিল। অর্থ ও কমলা এই উভয় হইতে সে বঞ্চিত হইবে, সে বুঝিতে পারিতেছে। সে তার হৃদয়-দেবতার দুয়ারে লক্ষতম বার নালিশ জানাইল, এই বঞ্চিত ও বিড়ম্বিত জীবন কেন তিনি দান করিয়াছিলেন? ইহা দ্বারা তাঁর কোন উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে? যেদিকে তাকায় সেদিকেই নিরাশা। যাতে হাত দেয়, তাই তাকে অন্য পথে টানিয়া লইয়া যায়। আজ যেন সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। তার জীবনে কোন দিন কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল কি? হয়ত ছিল না। কিন্তু জীবনে সুখ ও শান্তি ছিল। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাধা দিবার ত কেহ নাই। তার আশা ও আকাঙ্ক্ষার অবধি ছিল না। কল্পনা ছিল আকাশ-

চুম্বী। সেই কল্পনার বলে মানস-লোকে কত না অসাধ্য সাধন করিয়াছে। আজ কল্পনা পঙ্গু। তখন অনেক অসম্ভব বিষয় সে অনায়াসে সম্ভব বলিয়া ভাবিতে পারিত। আর আজ সম্ভবকেও সে দূরে রাখে। কল্পনার স্থখ হইতে বঞ্চিত হওয়ার মত দুর্দ্দশা আর নাই। রমেন সেই জন্য নিজ চিত্তের দৈন্য দেখিয়া নিজে পীড়িত হয়। তখন মন ছিল পরিষ্কার, বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতের ভাবনা লইয়া বিব্রত হইবার কারণ ছিল না। আর আজ পদে পদে কালকার ভাবনা ভাবিতে হয়। মানস-লোকে কোন এক অনির্দ্দিষ্ট স্থন্দরীর ধ্যানময়ী মূর্ত্তি হয়ত ফুটিয়া উঠিত, কিন্তু কমলার চিন্তা চিত্তদাহ ঘটাইত না। রমেন ভাবে, কেন এমন হয়? কেন মানুষ জীবনের সরল দিনগুলি হারাইয়া ফেলে? জীবনের সেই সহজ স-লীল ভঙ্গী যেন হঠাৎ আসিয়া এক বাঁকের মুখে থামিয়া গিয়াছে। যে স্থতায় জীবনের মণিগুলিকে গ্রথিত করা হইতেছিল, স্থতা ছিঁড়িয়া যাওয়ায় সেগুলি যেন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। নূতন করিয়া পথ আরম্ভ করিবার আর উৎসাহ নাই, সময় নাই, অথচ পুরাতন পথেরও আর উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না। ছড়ান মণিগুলির কতক হারাইয়া, কতক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যেগুলি আছে সেগুলি দিয়া আর তেমন মালা গাঁথা সম্ভব হয় কৈ? তাই ত রমেনের নিজের কাছে নিজের প্রশ্ন, এ জীবন লইয়া সে কি করিবে? এ জীবনের অর্থ কি? গভীর প্রশ্ন। প্রথম যৌবনে, জীবনের চঞ্চল উন্মেষে, এ প্রশ্ন যে তার মনে উদিত হইত না, তা নয়। কিন্তু তখন এই প্রশ্ন তার কাছে লঘুরূপে দেখা দিয়াছে। বাঁচিয়া থাকিবার আনন্দে উহা তাকে আজকার মত নাড়া দেয় নাই। তা ছাড়া তখন আশা ছিল, জীবনের সার্থকতা একদিন সে বুঝিবে, কেন সে পৃথিবীতে আসিয়াছে তা পরিষ্কার হইবে। তখন যথেষ্ট সময় ছিল। কিন্তু সেই নিশ্চিন্ত নির্ভরতা আর নাই। তার জায়গায় দেখা দিয়াছে বিষাদ মাখা গাম্ভীর্য্য। এই জীবন লইয়া কি করিবে সে, কি করিবে? তার মনের অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর দিবার কেহ নাই। তার পরাজিত, অভিশপ্ত জীবন। অথচ কত আশ্চর্য্য

অভিজ্ঞতা না তার এই জীবনে হইয়াছে! জীবনের বন্ধুর পথে যাত্রা করিতে গিয়া পৃথিবীকে আবার তার নূতন করিয়া চিনিতে হইয়াছে। তাকে বুঝিতে হইয়াছে, কল্পলোকে জিনিষের যে দাম কষিয়া সে রাখিয়াছিল, বাস্তব তা আমল দেয় নাই। অর্থকে সে কোন দিন প্রাধান্য দিবে না, স্থির করিয়াছিল। আজ দেখিতেছে, অর্থই রাজা হইয়া বসিয়া আছে। অথচ সেই অর্থ উপার্জ্জনের পথ কত না বিঘ্নসঙ্কুল! তার পরিশ্রমের প্রকৃত দাম কেহ দিবে না। সে শ্রমে পরাঙ্মুখ নহে। সে জানে, সে নহে। যদিও সবাই তাকে অলস বলিয়া অভিহিত করে, তথাপি সে জানে শ্রম করিবার তার অদ্ভুত শক্তি আছে। এই শ্রমের পরিচয় সে বহু বার দিয়াছে। কিন্তু হায়! কে তার শ্রম উচিত মূল্যে কিনিবে? তার জীবনের ইহাই ত সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্য যে তার শ্রমের ক্রেতা নাই। এ জগতে মানুষের যোগ্যতার সত্য মাপকাঠি কেহ ব্যবহার করে না। কৃত্রিম মাপে মানুষকে ওজন করা হয়। কিন্তু সব মানুষ আর কিছু এক ছাঁচে গড়া নয়। তা হইলে সব মানুষকে এক মাপে ওজন করিবার কি হেতু থাকিতে পারে? সেই কষ্টিপাথরে রমেন আজ ছোট হইয়া গিয়াছে। ইহা দুর্দ্দৈব। সংসারে যারা বড় চাকরী করিতেছে বা অন্য উপায়ে বহু অর্থ অর্জ্জন করিতেছে, তারা আর কিছু রমেনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। তার মত ছেলেরাই জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়া থাকে। তা দৈব। তার মত লোকেরা ব্যবসা করিয়া লাখপতি হইয়াছে। ইহাও দৈব। আর্থিক দিক্ হইতে সফলতা লাভ করিবার জন্য যা দরকার দৈবক্রমে তা সে পায় নাই। সে না পাইয়াছে কারও সহায়তা, না কারও টাকা। তবু সে খাট নয়, ইহা সে মনে প্রাণে জানে। আর্থিক সফলতাকেই সমাজ একমাত্র সফলতা বলিয়া জ্ঞান করে। সেও করে। করে বলিয়াই নিজেকে সর্ব্বপ্রকারে পরাজিত বলিয়া মনে হয়। পরাজয়ের গ্লানি মুছাইবার পন্থা হয়ত আছে। কিন্তু তা সৎ নয়। সে পথে সে যাইতে চায় না। ইহা হয়ত তার দুর্ব্বলতা। কিন্তু ইহা তার স্বভাবও বটে। হয়ত ভগবান্ তাকে সংসারে সফলতা লাভ করিবার জন্য সৃষ্টি করেন নাই।

তারাভরা আকাশের নীচে রমেন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। তার মন অসীম দিগন্তে হারাইয়া গিয়াছে। সহস্রতম বার তার মনে হইল, জীবন কি অদ্ভুত। শুধু যে তাব জীবনের কোন অর্থ সে খুঁজিয়া পায় না, তা নয়। এই বিপুল পৃথিবী, নিরবধি কাল, কোটি কোটি প্রাণীর জীবজগৎ। বুদ্বুদের মত উদ্ভব হইতেছে ও লয় পাইতেছে। কি ইহার অর্থ? এত কোলাহল, এত বিপুল কর্ম্মপ্রচেষ্টা, দিকে দিকে জীবনের এই সম্প্রসারণ—রমেন এই সব কিছুর অর্থ খুঁজিয়া পায় না। শুধু তার নিজের জীবন যে তার কাছে অর্থহীন, তা নয়। এই সমগ্র সৃষ্টির সে কোন অর্থ, কোন সার্থকতা, খুঁজিযা পায় না। সে ভগবানে অবিশ্বাসী নহে। বরং সে যেন তাঁর উপর অতিমাত্রায় নিভর করিয়া থাকে। আগে মনে করিত, ঈশ্বরের কৃপায় তার পক্ষে এমন দৈব ঘটনা ঘটিবে যে, সে অনায়াসে একটা কিছু হইবে। একটা কিছু। কি, তা সে নিজে ভাল করিয়া জানিত না। আর আজ ত লক্ষ্য অনেক ছোট হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর ও দেবতা তার প্রতি প্রসন্ন হন নাই। অসহায় সে, কি করিবে? তার সহায়হীনতা ও পরাজয়ের ব্যথা সেই দেবতার কাছে নালিশ করা ছাড়া তার আর কি করিবার আছে? পরাজয়ে ও গ্লানিতে, সংগ্রামে ও দ্বন্দ্বে, সেই দেবতার নিকট বল ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করে। কিন্তু তাঁর উপর সম্পূর্ণ নিভর করিয়াও সৃষ্টি অর্থহীন থাকিয়া যায়। হাঁ, ভাল লাগে। সে স্বীকার করিবে, সহস্র কদর্য্যতা ও পঙ্কিলতার মধ্যেও ভগবানের সৃষ্টি সুন্দর। যে দিকে তাকায় তার দুচোখ জুড়াইয়া যায়। এই বিশ্বকে এক নিপুণ চিত্রকর কি সুন্দর করিয়া আঁকিয়াছেন ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহা সত্য কথা, অনেক তারাভরা নিশীথে উন্মুক্ত আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া রমেন নিজেকে অসীম শূন্যে হারাইয়া ফেলিয়াছে। ইহা সত্য কথা, সৃষ্টি-রহস্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে তার পরম বিস্ময় বোধ হইয়াছে। এত বড় পৃথিবী, সূর্য্য, গ্রহ, তারা এবং গ্রহ, উপগ্রহ-সমন্বিত বিশ্বভুবন বিধাতার সৃষ্টির কত ক্ষুদ্র অংশ। মানুষ আরও কত ছোট।

সেই মানুষের, রমেনের, এমনকি কমলার, সুখদুঃখ, আশাআকাঙ্ক্ষা,—কতটুকু তার দাম? আজ রমেন বহু প্রতিকূলতার সহিত যুঝিতেছে, জীবন-সংগ্রামে অহরহ লিপ্ত রহিয়াছে, কমলাকে ভালবাসিতেছে, চাকরী করিতেছে,—এই সকল ঘটনা তার পক্ষে যত বড় হোক্ সমস্ত বিশ্বভুবনে স্থান কোথায়? এ জগতে সে বা কমলা বা আর কেহ কতটুকু স্থান জুড়িয়া থাকিবার ক্ষমতা রাখে? তার হাসিকান্না, সুখদুঃখে দোলায়মান জীবন একান্তই তার। এ জীবন লইয়া কখনও সে সুখী, কখনও দুঃখী। এই সুখদুঃখও একান্তই তার। তার এই দাবী করিবার ত কিছুমাত্র অধিকার নাই, তার জীবনের জন্য এই বিশ্বসংসারের একটি বিন্দু মাত্র স্থানচ্যুত হইবে। বস্তুত, সংসারে কোন ব্যক্তি, বিষয় বা বস্তু তার জন্য তিলমাত্র লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না, তার জীবন-যাত্রার দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করে না। তার হাসিকান্না উঠাপড়া নিরপেক্ষ ভাবে, সংসার যেমন চলে তেমনই চলিতে থাকে। অথচ তার জীবনের স্বাদ ও রঙ্ অনুসারে এই সংসারের চলা বিভিন্ন রঙে অনুরঞ্জিত হইয়া দেখা দেয়। ঠিক কথা। জীবন-যুদ্ধে সে পরাজিত হইয়াছে, তাই না তার কাছে তার নিজের জীবন এবং সমগ্র বিশ্বজগৎ অর্থহীন? তাই না সে এমন সুন্দর, এমন মহান্ সৃষ্টির কোন সার্থকতা খুঁজিয়া পায় না। রহস্যভরা এই বিপুল সৃষ্টির কাছে তার সমগ্র অন্তরাত্মা স্তব্ধ হইয়া যায়। কিন্তু তার মনে না কি অনেক অশান্তি, অনেক প্রশ্ন, তাই সে জীবনকে দৃঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া এই রহস্যের সম্মুখীন হইতে পারে না। তার অন্তরে বেসুরা রাগিণী বাজিতে থাকে। চিত্ত হাহাকার করে।

প্রথম যখন কেরাণী জীবন আরম্ভ করে, তখন রমেন উহাকে চিরস্থায়ী অবলম্বন বলিয়া মনে করে নাই। বস্তুত, এই চাকরী তার পক্ষে প্রয়োজনীয় ও ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ স্বরূপ হইলেও সে ইহা খুসী মনে গ্রহণ করে নাই। বরং তার মনে হইয়াছিল, এই চাকরী দ্বারা সে নিজের অবমাননা করিতেছে। এই অপমান তখনকার মত সহ্য করিলেও সে ক্রমাগত আশা করিতেছিল,

ভাল একটা কিছু জুটিবেই। তখন এই চাকরী ছাড়িয়া দিতে আর কতক্ষণ? তারপর বৎসরের পর বৎসর অতীত হইয়াছে, কিন্তু নানা অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতে সে যে তিমিরে, সেই তিমিরেই রহিয়া গিয়াছে। চাকরী ছাড়িয়া দিবার কল্পনা যে কখনও তার মনে জাগে না, তা নয়। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। ভাবিয়া চিন্তিয়া কেহ নিজ জীবিকার সংস্থান ত্যাগ করিতে পারে না। হঠাৎ ছাড়িয়া দিলে তবেই ছাড়া হয়। তাদের অফিস সর্ব্বাপেক্ষা ধাক্কা খাইয়াছিল অসহযোগ আন্দোলনের সময়। সকল ছাড়িয়া দেশের কাজের জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িতে আর দশজনের মত সেও ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। হয়ত জীবনে সেই এক সুযোগ আসিয়াছিল। পথের সন্ধান মিলিয়াছিল। সে পথে চলিলে আজ সে দরিদ্র থাকিয়াও দশজনের একজন ও বরেণ্য নেতা হইত না, কে বলিতে পারে? কেহ কেহ ত ভারতীয় নেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতিদিন কাগজে কাহারও কাহারও কত সংবাদ, কত কথা, বাহির হয়। হাজার হাজার লোকের নিকট মানলাভ করার একটা মোহ আছে বৈ কি। দূর হইতে ইহাদের নাম পড়িয়া তার বক্ষ ভেদ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হয়, ইহা রমেন অস্বীকার করিতে পারিবে না। সে জানে না, কোন্ পথ তার পথ। সে জানে না, কংগ্রেসের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিলে তার মনের সুখশান্তি থাকিত কি না। আপনার জীবনে অসন্তুষ্ট থাকা যদি তার স্বভাব হয়, তা হইলে হয়ত সে ঐ পথেও শান্তি পাইত না। দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারিলে হয়ত সে জীবনের লক্ষ্য খুঁজিয়া পাইত। কিছুই বলা যায় না। এই মাত্র বলা যায় যে, তার পক্ষে অন্তরের অসীম ব্যাকুলতা সত্ত্বেও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। পরিবার আত্মীয় বন্ধুদের বাধা ছাড়া তার নিজের মনেও বিস্তর দ্বিধা ছিল। তাই সে ঝাপাইয়া পড়িতে পারে নাই। নিশ্চিত ছাড়িয়া অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবার সাহস তার হয় নাই। আজ তার এক একবার মনে হয়, সেই অনিশ্চিত পথে যাত্রা করিলে তাকে হয়ত

এত অশান্তি সহ্য করিতে হইত"না, জীবনের নানাবিধ প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করিয়া শক্তি ক্ষয় করিতে হইত না। কিন্তু তাতেই বা কি হইত? তাতেই কি জীবনের সার্থকতা তার নিকট প্রতিভাত হইয়া উঠিত? তা হইলেই কি তার মনে হইত যে, এই সৃষ্টি অর্থহীন নহে? সে কি সর্ব্বত্র নিজেকে পূর্ণ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইত? রমেন হয়ত কোনদিন জীবন-রহস্য আবিষ্কার করিতে পারিবে না; এবং তা আবিষ্কার না করিয়াই তাকে সর্ব্বদা জীবন-যাত্রার প্রচেষ্টায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে।

বড সাহেব রমেনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তার অফিসে ঢেউ উঠিল। সহকর্ম্মিগণ নানা জল্পনা-কল্পনায় ব্যাপৃত হইল। বড সাহেব ভূমিকা না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কলিকাতায় বদলি হইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছ?

'আজ্ঞে হাঁ।'

কিন্তু কেন?

রমেনকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাঁর দিকে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া পুনরপি বলিলেন, আমি জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলাম, কেন দরখাস্ত করিলে? এই সেদিন তোমায় অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ পদে বসাইয়াছি। ইহার মধ্যে তোমার অন্যত্র যাইবার ইচ্ছা কেন হইল?

সাহেবের কাছে রমেন এই 'কেনর' কি জবাব দিবে? সংক্ষেপে বলিল, 'নারায়ণগঞ্জ আমার কাছে অসহ্য লাগ্‌ছে।'

ঠিক যখন তোমার সাম্‌নে অসীম পদোন্নতির ব্যবস্থা উপস্থিত হইল!

'আমায় মাপ করুন। আমি বড়ই হতভাগ্য। তাই আমায় আপনার প্রশ্নোত্তরে হাঁ বল্‌তে হচ্ছে।'

সাহেব কিছুক্ষণ ভাবিলেন, তারপর সস্নেহে রমেনের পিঠে হাত রাখিয়া বলিলেন, রমেন, নিরাশ হইতে নাই। আমি জানি ও বুঝি, তোমায় অনেক সংগ্রাম করিতে হয়। কিন্তু তুমি পুরুষ মানুষ। বাধা জয় করিতে পার,

ভাল। না পার, বুকে ক্ষত লইয়া মরিবে, পিঠে নয়। তার চেয়ে গৌরবের আর কিছু নাই। কিন্তু তোমাকে আমরা আপাতত ছাড়িয়া দিতে পারি না। বরং আরও পদোন্নতির জন্য দরখাস্ত কর, আমরা বিবেচনা করিব। এখন এখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দি, কি বল?—এই বলিয়া রমেনের উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া তিনি তার বদলির দরখাস্তখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তারপর স্মিতহাস্যে বলিলেন, 'যাও।'

বড় সাহেবের কাণ্ড দেখিয়া রমেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। কলিকাতা-যাত্রা সম্বন্ধে সে যে সব রঙ্গীন স্বপ্ন দেখিয়াছিল, সেগুলি এক নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। তার নারায়ণগঞ্জ ছাড়িয়া যাওয়ার বড় প্রয়োজন ছিল। কমলার নিকট হইতে দূরে যাওয়া বড়ই বেদনাদায়ক। কমলা-হীন কলিকাতায় সে যে কি করিয়া দিন অতিবাহিত করিবে, তা সে নিজেই জানে না। তবু সে সেই অত্যন্ত ব্যথাময় পরিণতির জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল নিজের ও কমলার দিকে চাহিয়া। এক্ষণে তা ভূমিসাৎ হইয়া গেল। কিন্তু তাতে ক্ষুব্ধ হইলেও তেমন ক্ষুব্ধ হইল কি? নিজের অন্তরে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস কি ফেলে নাই? হয়ত ফেলিয়াছিল। কিন্তু সে সত্যই নারায়ণগঞ্জ ছাড়িয়া যাইতে ব্যাকুল হইয়াছিল। সেজন্য সে নিজের হৃদয়াবেগকে ক্ষমা করে নাই। এক্ষণে স্বয়ং বিধি বাম হইলে সে কি করিতে পারে? সে নিজের কাজে গিয়া বসিতে বসিতে ভাবিল, বিদেশী হইলেও ইহাদের ক্ষমতা ও অন্তর্দ্দৃষ্টি আছে; কিন্তু ইহাও না ভাবিয়া পারিল না যে, মাসে দুই হাজার টাকা করিয়া বেতন পাইলে কাহারও পক্ষে পিঠ চাপড়াইয়া বলা সহজ, জীবন-সংগ্রামে ভীত হইও না।

৮

সে এক শনিবার। তেমন শনিবার মানুষের জীবনে অনেকবার আসে না। এই শনিবারে রমেনের কলিকাতা বদলি হইবার জন্য দরখাস্তখানা ছিঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে। তারপর হইতে রমেনের মনে হইতেছে সে যেন

এত লঘু হইয়া গিয়াছে যে, বিহঙ্গমের মত আকাশে উড়িতে পারে। এই তুচ্ছতম ঘটনার কাছে তার জীবন-যাত্রার সংগ্রামও ছোট হইয়া গিয়াছে। সহকর্ম্মীদের বিদ্রূপ ও বিদ্বেষ এবং তার চাকরীস্থলের নিত্য প্রলোভন এখনকার মত সে ভুলিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি অফিস হইতে ফিরিয়া তার একবার ইচ্ছা হইল, কমলার সহিত কিছুক্ষণ গল্প করিয়া বাড়ী যায়। আবার ভাবিল, কিছুক্ষণ ঘুমাইয়া আসিয়া কমলার সহিত গল্প করিবে। দোটানায় পড়িয়া শেষ পর্য্যন্ত সে তার নিজের ঘরেই উপস্থিত হইল। বাড়ীতে ঢুকিয়া অবধি কারও সঙ্গে দেখা না হওয়ায় সে আরাম বোধ করিল। তার ঘুম পাইয়াছিল। সে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল। দেখিল, সে এমন এক অপরিচিত অথচ সুন্দর দেশে উপস্থিত হইয়াছে যেখানে তার মনে আর কোন দুঃখ, কোন ক্লেশ নাই। প্রতিদিনকার সহস্র সমস্যা আর তাকে সমাধান করিতে হয় না। সকল প্রশ্নের সুন্দর মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। সে সুখী হইয়াছে। এই সুখ, এই আনন্দ, আর সে নিজের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। চলিতে চলিতে পথে এক অপূর্ব্ব সুন্দরীর সঙ্গে তার দেখা। সে আসিয়া তার হাত ধরিল। আশ্চয্য এই, রমেন তাকে বাধা দিতে চাহিল, কিন্তু পারিল না।

রমেন বলিল, 'তুমি কে?'

মেয়েটি হাসিয়া উঠিল। এই গলার স্বর তার পরিচিত। তবু মনে করিতে পারিল না, কে এইভাবে হাসে। মেয়েটি হাসিতে হাসিতেই বলিল, 'মনে করে দেখ দেখি, আমায় চিন্‌তে পার কি না।'

রমেন অনেক চেষ্টা করিল, পারিল না।

মেয়েটি বলিল, 'আচ্ছা, আমার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখ।'

রমেন তার দিকে তাকাইতে গিয়াই দুই হাতে চোখ ঢাকিল। এতক্ষণ সে লক্ষ্য করে নাই। মেয়েটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ! ষোল সতের বা তার চেয়ে বেশী বয়সের কোন মেয়ে যে এ ভাবে বাহিরে আসিতে পারে, ইহা ভাবিতেও

রমেনের সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। মেয়েটি কিন্তু বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হল ?'

রমেন সেইরূপ অবস্থাতেই থাকিয়া বলিল, 'তুমি পালাও। তুমি আমার চোখের সাম্‌নে থেকে দূর হও।'

'কেন ?'

বেহায়াপনার একটা সীমা থাকা উচিত। এই সীমা যে লঙ্ঘন করে তাকে ক্ষমা করা উচিত নহে, তার সহিত কোন প্রকার ভদ্রতা রাখিবার দায়ও থাকে না। সুতরাং তার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য রমেন দৌড়াইতে লাগিল। কিন্তু মেয়েটি নাছোড়বান্দা। সেও তার পিছনে পিছনে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। রমেন বহুদিন দৌড়ায় না। অনভ্যাসে কতক্ষণ দৌড়ান যায় ? দৌড়াইতে দৌড়াইতে সে এক মনোরম দৃশ্যের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। সম্মুখে শান্ত নদী। ওপারে পাহাড়। কালো কালো পাথর ঝুলিয়া রহিয়াছে। কিন্তু সে দৃশ্য দেখিবার মত অবস্থা তার নয়। সে নিরুপায় হইয়া নদীর সাম্‌নে বালুকারাশির উপর লাফাইয়া পড়িল। তারপর আর এক দিক্ ধরিয়া দৌড় দিল। একে সে পরিশ্রান্ত, তায় বালুর উপর দৌড়। কাজেই সে বার বার পড়িয়া যাইতে লাগিল। আর মেয়েটি হাততালি দিয়া হাসিতে লাগিল। রমেন চাহিয়া দেখিল, মেয়েটি ঠিক তার পিছনেই আসিতেছে। 'কি আপদ !' বলিয়া রমেন সেই বালুকারাশির উপরে আবার দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল।

অমনি যেন এক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। এতক্ষণ প্রচণ্ড দুপুরের রৌদ্রে ছুটাছুটি করিয়া রমেন গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল। এখন চাঁদের আলোয় তীরভূমি প্লাবিত হইয়া গেল। নদীর জল চক্‌চক্ করিতে লাগিল। দূরের কালো পাহাড়ের গায়ে জ্যোৎস্না পড়ায় উহা আর কালো রহিল না। ঝির্ ঝির্ করিয়া বাতাস বহিয়া রমেনের দেহ শীতল করিয়া দিল। তার সকল শ্রান্তি এক মুহূর্ত্তে দূর হইয়া গেল। নদীর জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বুকে কালো পাহাড়ের ছায়া তার মনকে আকুল করিল।

রমেন অনুভব করিল, সেই মেয়েটি আসিয়া আবার তার পাশে বসিয়াছে এবং হাসিতেছে। মেয়েটি বলিল, 'মুখ থেকে হাত তোল। তাকাও। চারি দিক্ কি সুন্দর, দেখ।' এই বলিয়া হাত ছাড়াইবার জন্য তার হাতের উপর হাত রাখিল।

রমেন তার হাত ঠেলিয়া দিল। রাগ করিয়া বলিল, 'তুমি কেন আমার পিছনে পিছনে আস্‌ছ? তুমি যাও।'

মেয়েটি বলিল, 'আমি কি দোষ কর্‌লাম যে তুমি আমার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার কর্‌ছ? আমি না হয় তোমার কাছ থেকে সরে বস্‌লাম। আমাকে সহ্য কর্‌তে পার্‌ছ না? আচ্ছা, সরেই বস্‌লাম। কিন্তু এই বালুর উপরে তোমার যেমন বস্‌বার অধিকার আছে, আমারও তেমনই আছে।' তার করুণ কণ্ঠস্বর নিস্তব্ধ নদীতীরে জীবন্ত হইয়া উঠিল। ওপার হইতে প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

'হাঁ, তা তোমার আছে। কিন্তু আমি যেখানে যাই, তুমি সেখানে যাও কেন?'

'আমার খুসী। ভগবান্ আমাকে দুই পা দিয়েছেন যেদিকে ইচ্ছা চল্‌বার জন্য।'

রমেন আবার রাগ করিল: 'তোমার মত বেহায়া মেয়ে আমি আর দেখিনি। যাও কাপড় পরে এসগে।'

মেয়েটি হাসিয়াই বাঁচে না। কোথায় এই কথায় তার লজ্জার সীমা থাকিবে না, তা নয়, দিব্য খিল খিল করিয়া হাসিতেছে। রমেন ইহার কাণ্ড দেখিয়া অভিভূত হইল। কতক্ষণ পরে হাসি থামিলে রমেনের গা ঘেঁষিয়া বসিল: 'ও, এই কথা! আমি বলি, কি না কি গুরুতর বিষয়।'

রমেন সরিয়া গিয়া রুষ্টমুখে বলিল, 'যাও।' কিন্তু রমেন সরিয়া গেলে কি হইবে? মেয়েটি আবার তার কাছে আসিয়া বসিল। এইরূপে রমেন যতবার সরিয়া বসে, মেয়েটি ততবার কাছে আসিয়া বসে।

একেবারে মরিয়া গেল। তার মনে হইল, সে ছুটিয়া ঐ নদীর মধ্যে লাফাইয়া পড়ে।

মেয়েটি তেমনই আব্দারের স্বরে বলিল, 'কই, দিলে না! দাও।'

রমেন কাতরস্বরে বলিল, 'আমায় ক্ষমা কর।'

মেয়েটি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। মনে হইল যেন সেই হাসি ওপারের কালো পাহাড়ের গায়ে আছাড় খাইল। তারপর বলিল, 'নিজের দিকে না তাকিয়ে পরের দিকে তাকালে এমন দশাই হয়।'

সুতরাং মেয়েটি আবার তার কাছ ঘেঁষিয়া বসিলে সে তাকে বারণ করিতে পারিল না। সে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া রহিল, কিন্তু মুখে কিছু বলিতে পারিল না। নিজের সম্বন্ধে সচেতন হইয়া সে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। মেয়েটি সস্নেহে তার হাতে হাত রাখিয়া বলিল, 'রাগ করেছ?'

রমেন হাত টানিয়া লইয়া বলিল, 'হাঁ, করেছি।'

'কোরো না। লজ্জার কিছু নাই ত। এ রাজ্য পৃথিবীর মত নয়। এখানকার ছেলেমেয়েরা কাপড় পরতে জানে না। আরও অনেক কিছু জানে না। তুমি পৃথিবীর মানুষের মন নিয়ে এখানে এসেছ, তাই বিমনা হয়ে রয়েছ। এখানকার একজন হয়ে যাও, শান্তি পাবে।'

বস্তুত, রমেন দেখিল, সে তার নূতন জীবনে অল্পক্ষণের মধ্যে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। তারপর হঠাৎ যেন সব দৃশ্য বদলাইয়া গেল। সে দেখিল, সে তার শয্যার উপর শুইয়া আছে। তখন আর সে জ্যোৎস্না-প্লাবিত নদীতীরের মন নহে, নারায়ণগঞ্জ সহরের প্রতিদিনকার রমেন। আর সুসজ্জিতা শোভনা একটি মেয়ে তার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিতেছে, 'ভাল করে চেয়ে দেখ দেখি, আমাকে চিন্‌তে পার কি না।'

'কই, চিন্‌তে পারি না ত।'

'আরও ভাল করে দেখ।'

রমেন একাগ্রমনে তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কি যেন অস্পষ্ট

স্মৃতি তার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। বহুদিন বিস্মৃত প্রিয় স্মৃতির মত। ধীরে ধীরে ঝুঁকিয়া পড়া মুখটিরও যেন পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এ কি সেই মুখ? বহুবার দেখা বড় ভালবাসার সেই জনের মুখ? সেই মুখ, অথচ কোথায় যেন অমিলও রহিয়াছে। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, রমেন কতক আনন্দে, কতক বিস্ময়ে বলিল, 'তুমি কমলা?'

সেই মুহূর্ত্তে তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আর কি দৃশ্য তার চোখে পড়িল?

হাঁ, এই শনিবার। সকাল হইতে কমলার মন বড়ই উচাটন হইয়া আছে। রণেনের কাছে নিজের মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করা অবধি সে ছটফট্ করিয়া মরিতেছে। রমেন সকল কাজ ফেলিয়া কেন তার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে না? সে সমস্ত লজ্জাসরম বিস্মৃত হইয়া নিজের গভীর ভালবাসার কথা বলিতে পারে, আর রমেন কি তার একটুও প্রতিদান দিতে পারে না? তার চিত্ত যে আর বারণ মানে না। ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায়। রমেনের প্রশস্ত বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য তার অসীম বাসনা। দিন দিন তার মনে রমেনের প্রতি উগ্র ভালবাসা তাকে যেন বিহ্বল করিয়া তুলিতেছে। অথচ সে কি রমেনকে তার দিকে টানিতে পারিতেছে? কেন পারিতেছে না? রণেন কি তার কথা রমেনকে আজও বলে নাই? না, সে কথা শুনিয়াও রমেন নির্ব্বিকার রহিয়াছে? তার মনে কোন দাগ পড়ে নাই, এমন কি হইতে পারে? এই কথা জানিবার জন্য তার মন অস্থির হইয়া উঠিল। সকাল হইতে সকল কাজের মধ্যে কতবার যে ঘর ও বাহির করিল তার ঠিক নাই। তার মন হইতে যেন অন্য সমস্ত চিন্তা মুছিয়া গিয়াছে। অন্তত, আজিকার মত মুছিয়া গিয়াছে। সে বোধ করিল, তার সকল ব্যাকুলতা রমেনের জন্য। তার নিজের ঘরের জানালার সামনে দাঁড়াইলে ডাকিয়া রমেনের সহিত কথা কহা যায়। তা সে করিবে না। রমেন কেন আসে না? রমেন কি আসিতে পারে না? এতই তার অহংকার! কমলা নিজের সকল অহংকার চোখের জলে ডুবাইয়া দিয়াছে। তার সব মান-অভিমান বিসর্জ্জন দিয়াছে। সে এখন বুঝিয়াছে,

একমাত্র রমেনকেই সে ভালবাসে, আর কাহাকেও না। অন্তত, তার মনের ধারণা এই যে, রমেন ছাড়া অন্য কাহাকেও ভালবাসা তার পক্ষে সম্ভব নহে। কমলার অন্তরের ভালবাসা প্রকাশ করিবার জন্য হয়ত তাড়াতাড়ি করিবার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু তার যেন মনে হইতেছে, আর সময় নাই। আর অপেক্ষা করা চলে না। তাই সে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। দৃশ্য ও অদৃশ্য শত্রুরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে। ধনীর দুলাল নরেশ রূপ, ঐশ্বর্য্য ও ভালবাসা লইয়া তার পথ রোধ করিতেছে। নরেশ হয়ত তাকে ভালবাসে। হয়ত খুব ভালবাসে। নরেশের ভালবাসা পাওয়া যে কোন রমণীর পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়, ইহা সে অকপটে স্বীকার করে। সেই ভালবাসার সে প্রতিদান দিতে পারিবে না, ইহাই তার দুঃখ। সে নরেশের জন্য অবিমিশ্র দুঃখ ও করুণা অনুভব করে। নিজ হৃদয়ের গতি কেহ ত বুঝিতে পারে না, নিয়ন্ত্রণও করিতে পারে না। তার নিজ অন্তরের দাবীর কাছে সে নিরুপায়। সেই দাবী মানিতে হইলে রমেনকে বরণ না করিয়া তার উপায় নাই। একদিন সে বলিয়াছিল বটে যে বিবাহ সম্বন্ধে তার বাপ-মায়ের মতেই তার মত। রমেন তাকে বিবাহ করিতে চাহিলে তার বাপ-মার মত লইতে হইবে। সেদিন কি সে জানিত যে হৃদয়াবেগ এত অসংবরণীয়? সেদিন কি সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, রমেনকে তার এত প্রয়োজন হইবে? রমেন তার বাপ-মার পক্ষে স্পৃহনীয় হইবে কি না, সে প্রশ্ন পর্য্যন্ত সে এখন বিচার করিবার ধৈর্য্য রাখে না। সে ভাল করিয়াই জানে, তাঁরা দরিদ্র রমেনকে তার জন্য কখনও পছন্দ করিবেন না। বিশেষত নরেশের উপর যখন তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ, তখন তাঁদের পক্ষে রমেনকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া সম্ভব নহে। তাঁদের খুব বেশী দোষ দেওয়াও ত চলে না। সর্ব্বাংশে উপযুক্ত নরেশকে কেনই বা তাঁদের মনে না ধরিবে? তাই ভবিষ্যতের সুখ লক্ষ্য করিয়া তাঁরা নরেশকে কাম্য মনে করেন। নরেশ উপস্থিত না থাকিলেও, রমেনের যে কোন সুযোগ

ত, তা মনে হয় না। বহু দিন আগে সে-কথা কমলা স্বয়ং রমেনকে

বলিয়াছিল। তা কি সে ভুলিয়া গিয়াছে? না, ভুলে নাই। রমেনের সহিত তার যত কথা হইয়াছে সব সে মনের মধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। অবসর সময়ে, তার চোখের সাম্নে এক এক দিনের ছবি ভাসিয়া উঠে। (তার পক্ষে রমেনকে ভোলা যেমন অসম্ভব, তার কথা ভোলাও তেমনই অসম্ভব।) সে ত আর একদিনে আজিকার অবস্থায় উপনীত হয় নাই। রমেনের অবর্ণনীয় আকর্ষণের বিরুদ্ধে সে কি কম সংগ্রাম করিয়াছে? আজও করিতেছে। তার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে। অন্তর্য্যামী ভগবান্ জানেন, সে রমেনের কাছে কত দুর্ব্বল। বস্তুত, রমেন যদি সম্মুখে থাকিয়া তাকে মরিতে আদেশ করে, তা হইলে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই, যা তাকে রক্ষা করিতে পারিবে। রমেন কাছে থাকিলে সে যে বিশ্বচরাচর ভুলিয়া যায়। নিজেকে ভুলিয়া যায়। তার ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলাইতে না পারিলে হৃদয় শত ধিক্কারে পূর্ণ হয়। তাকে একটু খুসী করিতে পারিলে মনের মধ্যে আনন্দ জাগিয়া উঠে। রমেন কাছে না থাকিলে তবু তার স্বাভাবিকতা বজায় থাকে, সে নিজের নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে পারে। তার উপরে রমেনের এই অসাধারণ প্রভাবের কথা যখন তার কাছে ধরা পড়িল, তখন সে ভীত হইল। সাবধান হইতে চেষ্টা করিল। নিজেকে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু মনকে সে রোধ করিবে কি দিয়া? হৃদয়কে সে নিবৃত্ত করিবে কিরূপে? তার কুমারী হৃদয়ের সকল ভালবাসা অঞ্জলি অঞ্জলি করিয়া সে যে দেবতার পায়ে উপহার দিয়াছে, সে দেবতা বিমুখ হইলেও তার মুখ ফিরাইবার আর উপায় নাই। নিজেকে শাসন করিলে তার মন যে নিষিদ্ধ পথে আরও ছুটিয়া যায়। তার গভীর ভালবাসার কথা সে নিজের কাছেও লুকাইয়া রাখিতে চাহিয়াছিল। সে সংকল্প করিয়াছিল, রমেনকে গোপনে ভালবাসিবে, কাহাকেও জানিতে দিবে না। তাতে কাহারও ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না। তার বালিকা-হৃদয় রমেনের ভালবাসা লাভের স্পর্দ্ধা তখনও করে নাই। কিন্তু আজ অবস্থা বিপর্য্যয়ে বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নিজের হৃদয়ের সহিত একেবারে মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

চারিদিকে ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রের ব্যূহ ভেদ করিতে হইবে। আজ হোক্, কাল হোক্, তাকে তার হৃদয়ের কথা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশিত করিতে হইবে। বাতাসে যেন গুঞ্জন ভাসিয়া আসিতেছে। নরেশের সহিত তার বিবাহ দিবার জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে। নরেশ এত দিন তার মনোবাঞ্ছা জানায় নাই। জানাইলে এ বাড়ীতে আনন্দোৎসব পড়িয়া যাইত। নরেশের মনোবাঞ্ছা যে কি, তা অনুমান করা কঠিন নয়। এই ত সেদিন সে স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিয়াছে যে, তাকে পাইতে চায়। মানুষ আর ইহার চেয়ে স্পষ্টভাবে নিজের মনোভাব কেমন করিয়া প্রকাশ করিবে? আজ যা সে দয়া করিয়া কমলাকে জানাইয়াছে, তার পক্ষে তা কাল তার বাপ-মার কাছে বলা কিছু কঠিন ব্যাপার নহে। নরেশ ত আর কিছু কমলার মনের খবর রাখে না। কেই বা রাখে? সুতরাং তাকে দোষ দেওয়া যায় না। নিজের সম্বন্ধে নরেশের যত অহংকার থাকুক্, এ পর্য্যন্ত সে যথেষ্ট ভদ্র ও সংযত আচরণ করিয়াছে। তাকে বরং প্রশংসা করিতে হয়। বলিতে কি, নরেশ তার ব্যবহার দ্বারা কমলার বিরুদ্ধ মনোভাবকে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। এমন কি, কমলা ইতি-মধ্যেই তার জন্য একটা অনুকম্পা অনুভব করিতেছে। কমলাকে না পাইলে বেচারা যে আঘাত পাইবে, তা কমলা বুঝিতে পারিয়াছে। কিন্তু উপায় কি? নরেশকে আঘাত না দিয়া উপায় কি? কমলা তাকে বলে নাই, আহ্বান করে নাই, এই পথে এস। যেখানে হৃদয় নিয়া কথা, সেখানে হৃদয়ের দাবী সকলের উপরে। নরেশকে সে আঘাত হইতে বাঁচাইতে চায়। সম্ভব হইলে, বাঁচাইতে চায়। নরেশকে জীবনে সুখী দেখিতে পাইলে সে সন্তুষ্ট হইবে। আর কমলাকে না পাইলে নরেশের জীবন বিফল হইয়া যাইবে, এমন মনে করিবার কি কারণ আছে? কয়েক দিন হয়ত সে দুঃখ পাইবে, সেজন্য কমলা দুঃখিত, কিন্তু সে অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে নিশ্চয় তার বেশী দিন লাগিবে না। বাংলা দেশে কত ভাল ও সুন্দরী মেয়ে আছে। তাদের

কাহাকেও নরেশ বিবাহ করুক না। এমন মেয়ে নিশ্চয় মিলিবে যাকে বিবাহ করিলে সে সুখী হইবে। কমলার মনে এ অহংকার নাই যে, বাংলা দেশে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মেয়ে নাই বা আর কেহ নরেশকে সুখী করিতে পারিবে না। বরং সে একান্ত মনে কামনা করে, নরেশ যেন সুখী হয়। তার নিজের সুখী হইবার পক্ষে তার এই প্রার্থনা। বস্তুত, নরেশের পরম শুভার্থীদের মধ্যে সে নিশ্চয় একজন। চিরদিন তা'ই থাকিবে। তার বেশী নয়। তার বেশী কিছু হওয়ার হাত হইতে ভগবান্ তাকে রক্ষা করুন। তার নিজেরও ত সুখী হইবার অধিকার আছে। সেই অধিকারটুকু যেন তার নষ্ট না হয়।

নরেশের কথা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। নরেশ কি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী! ধনীর দুলাল বলিতে কি বুঝায়, কমলা তা আগে জানিত না। আজও যে ভাল করিয়া বুঝিয়াছে, তা নয়। নরেশের মোটর গাড়ী কি প্রকাণ্ড ও সুন্দর! তার সাজসজ্জা কিরূপ দামী আর কত বিচিত্র! বস্তুত, রাজপুত্র যদি কাহাকেও বলিতে হয়, তা হইলে নরেশকে বলা যায়। ইহাকে যে রমণী পতিরূপে পাইবে, তার সৌভাগ্যের অন্ত থাকিবে না। সুখস্বাচ্ছন্দ্য বলিতে যা বুঝায়, সে প্রচুর পরিমাণে তার অধিকারিণী হইবে। কমলা আজ যদি নরেশের সহিত পরিণীতা হয়, তা হইলে সমুদয় সমৃদ্ধি সে ভোগ করিতে পারিবে। একা। তার সৌভাগ্য দেখিয়া কত জন যে হিংসা করিবে, তার ঠিক নাই। সে এই কুসুমাস্তীর্ণ সুখের পথ ত্যাগ করিয়া দুঃখময় জীবন কেন বরণ করিয়া লইতে চায়? সত্যই কি চায়? এই সুখৈশ্বর্য্যপূর্ণ জীবনের প্রতি তার কি কোন লোভ নাই? নাই বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। সে রমেনকে কোন দিন কথা দেয় নাই যে, তাকে বিবাহ করিবে। রমেনও তার নিকট হইতে সেরূপ কোন প্রতিশ্রুতি আদায় করে নাই। পরন্তু রমেন সর্ব্বদা তার সহিত একটা দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছে। কমলারও ত সুখী হইবার অধিকার

আছে! কিন্তু সে কি ভাল করিয়া জানে কিসে সে সুখী হইবে? সে কি বলিতে পারে, নরেশকে বিবাহ না করা তার পক্ষে সুখাবহ হইবে? হৃদয়কে উপবাসী সে রাখিতে চায় না। নরেশের সহিত সে যুক্ত হইলে, তার হৃদয় উপবাসী থাকিবে, এমন কথা কে বলিল? কে বলিল, নরেশ হৃদয়-জয়ের ব্যাপারে রমেন অপেক্ষা ন্যূন? একমাত্র প্রেম বা হৃদয়াবেগ সুখের প্রদর্শক নাও হইতে পারে। কমলা ক্ষুদ্র জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেও জানে, ভালবাসার জনকে পাইয়াই সব রমণী সুখী হয় নাই, আবার ভালবাসার জনকে হারাইয়াও সকলের জীবন ব্যর্থ হইয়া যায় নাই। আর প্রিয়তমকে না পাইয়া যদিই জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়, তা হইলেই বা কি? ভালবাসায় নিজের ইচ্ছার পূরণ কি তার জীবনকে সর্ব্বাধিক সফল করিয়া তুলিবে? রমেনের সহিত বিবাহ হইলে কেহই বলিবে না তার জীবন সফলতার উচ্চতম শিখরে পৌঁছিয়াছে। নরেশের সহিত বিবাহ হইলে লোকে তা বলিবে। বস্তুত, সাধারণ লোকে ভালবাসার মর্য্যাদা বুঝে না। যদি একথা রাষ্ট্রও হইয়া যায়, কমলা ভালবাসিয়া রমেনকে, দরিদ্র অবজ্ঞাত রমেনকে, বিবাহ করিতেছে, তা হইলে তার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য সকলে দুঃখ প্রকাশ করিবে, উৎসাহ দিতে হাজারের মধ্যে একজন আসিবে না। ভালবাসা ভাল। কিন্তু উহা লইয়া বাড়াবাড়ি করা ভাল নহে। ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যকে কে না ভালবাসে? কমলার মনে ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যের জন্য লোভ নাই, ইহা সত্য কথা নহে। তার মনে যে কোন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় নাই, তা নয়। এক দিকে রমেন যেমন তাকে অবিরত প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতেছে, অন্য দিকে তেমনই প্রবলভাবে ঐশ্বর্য্য তাকে প্রলোভন দেখাইতেছে। সে রমেনের প্রেমে পাগলিনী হইয়া ছুটিয়া যাইতে পারে, সকল কিছু তুচ্ছ করিতে পারে। কিন্তু তার জীবনে এমন সঙ্কট মুহূর্ত্ত আসাও অসম্ভব নয়, যখন সে নিজেকে ভুলিয়া, রমেনকে ভুলিয়া, জীবনের পথ বক্রভাবে ঘুরাইয়া দিবে। সেই মুহূর্ত্তের জন্য তার আশঙ্কা ও উদ্বেগের

অন্ত নাই। তার জীবনে এক ভীষণ পরীক্ষা আসিয়াছে। এই অল্প বয়সে সে এমন এক সংগ্রামের সম্মুখীন হইয়াছে, যার তীব্রতার কথা সে আগে কোন দিন কল্পনাও করিতে পারে নাই। কমলা যেন আর সে কমলা নাই। তার মধ্যে একটা বৃহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। সে নিজের দিকে চাহিয়া নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া যায়। বাহির হইতে কমলার এই পরিবর্ত্তন ধরা পড়ে না। কারণ, এ যে অন্তর্লোকের পরিবর্ত্তন। প্রেমের গভীর উত্তাপে এবং অন্তরের অবিরত সংগ্রামে বালিকা কমলা আর বালিকা নাই, সে পূর্ণ যৌবনে আসিয়া পৌছিয়াছে। অল্পদিনের মধ্যে সে যা বুঝিয়াছে ও শিখিয়াছে, বহু নারী এক জন্মে তা পারে না। সেই কমলা মরিয়া গিয়াছে। নূতন কমলা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই জীবনেই কমলার জন্মান্তর ঘটিয়াছে। জীবনের মোহানায় দাঁড়াইয়া সে যেন দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। অসীম সমুদ্রে, জীবন সমুদ্রে, তার কি কূল মিলিবে?

তার এই মানসিক দ্বন্দ্ব এমন প্রকৃতির যে ইহাতে কারও সহায়তা পাওয়া বা চাওয়া সম্ভব নহে। পরন্তু সে এমন অবস্থা-বিপর্য্যয়ে পড়িয়াছে যে, তার সংগ্রাম তার পক্ষে আরও তীব্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি রমেনের প্রতি তার পরিবারের লোকেরা ক্রমে অত্যন্ত বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে। 'সম্প্রতি' অর্থ, নরেশের আগমন ও ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার চেষ্টার পর হইতে। হইতে পারে, রমেন নরেশের বন্ধু। কিন্তু তাই বলিয়া রমেন ত আর নরেশ নয়। দুজনকে ঠিক এক চোখে দেখা যায় না। আর নরেশের কাছে রমেন নিতান্ত ম্লান ও ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে। কোথায় রমেন আর কোথায় নরেশ! কমলার পিতামাতা স্পষ্টভাবেই উভয়ের সম্বন্ধে তুলনামূলক সমালোচনা করেন। বলা বাহুল্য, তাতে রমেনের ভাগ্যে যা জুটে, তা স্তুতি নিশ্চয়ই নয়। খুব সংক্ষেপে বলা যায়, রমেন অপদার্থ। সে সময় ও সুযোগ হেলায় হারাইয়া এখন সকলের কৃপার পাত্র হইয়াছে। রমেনের

মত দরিদ্র ঘরের ছেলের সহিত কমলাদের মত অভিজাতদের বেশী মিশিবার কোন প্রয়োজন নাই। এ বাড়ীতে রমেনের বার বার আসা অনভিপ্রেত। কমলার সহিত রমেনের মেশামেশিতে নরেশ কিছু মনে না করিতে পারে। কিন্তু যদি করে! তা হইলে তখন আর শোধরাইবার উপায় থাকিবে না। আর নাও যদি করে, তবু রমেনের বুঝা উচিত, এখন সময় আসিয়াছে তার কম করিয়া মিশিবার। রমেনের নিশ্চয় এইটুকু বুঝিবার বুদ্ধি আছে যে, তাঁরা নরেশের সহিত কমলার বিবাহের চেষ্টা করিতেছেন। তার এমন কোন কাজ করা উচিত নয়, যাতে সেই বিবাহে বাধা জন্মিতে পারে। বাংলা দেশে সুপাত্র পাওয়া আর কিছু সহজ কথা নয়। কমলা সৌভাগ্যবতী। তাই নরেশের মত পাত্র আসিয়া নিজে ধরা দিয়াছে। সত্য বটে, কমলার পিতা-মাতা নরেশকে কমলা সম্পর্কে একটু বেশী স্বাধীনতা দিয়াছেন। কিন্তু নরেশের মত পাত্র পাইবার জন্য তাঁরা পাঁচ জনের কাছে একটু নিন্দা ও গ্লানি সহ্য করিতে প্রস্তুত আছেন। নরেশকে তাঁরা বিশ্বাস করেন। আর তাঁদের মনে সংশয় নাই যে, নরেশ কমলাকে বিবাহ করিবে। নহিলে তাঁরা কি নরেশকে কমলার সহিত অমন ভাবে মিশিতে দিতেন? যখন নরেশের সহিত কমলার বিবাহ হইবে, তখন এই সব পর-চর্চ্চা বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু তাঁদের ঈপ্সীত পথে বাধা জন্মাইতেছে রমেন। কমলা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল, যে রমেনকে তাঁর পিতা-মাতা কত প্রশংসা করিতেন, এখন সেই রমেনের সম্বন্ধে শুধু অবজ্ঞাসূচক কথা বলেন। ইহা লইয়াই তাঁদের সহিত কমলার প্রথম মনান্তর সৃষ্টি হয়। রমেনের নামে বহু মিথ্যা নিন্দাবাদ অত্যন্ত ক্লিষ্টচিত্তে শুনিয়াও সে চুপ করিয়া থাকিত। কিন্তু প্রতিবার তার অন্তর শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইত। নিজ পিতা-মাতার এই অনুদার সংকীর্ণ মূর্ত্তি সে আর কোন দিন দেখে নাই। ইহার জন্য সে মনে যে কি পীড়া ও অশান্তি ভোগ করিত, বলা যায় না। রমেনকে মিথ্যা গ্লানি দিলে তার বুকে বাজে। অথচ প্রতিবাদ করিবার অধিকার তার কি আছে? রমেন ত তার কেউ নয়।

এই সব গালি ও কুকথা সে নিজে শুনিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু যে রমেনের পায়ে আঁচড় লাগিলে তার বুক ফাটিয়া যাইতে চায়, সেই রমেনকে অহরহ এত অপমান! অথচ মজা এই, রমেনকে মুখের উপর কোন কথা বলিবার সাহস কারও নাই। রমেন যেন তার সুন্দর ব্যবহার, শোভন কথাবার্তা দ্বারা সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিত। তার সাম্‌নে সকলে তার সহিত ভদ্র ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইত। হয়ত সেই জন্যই সে চলিয়া গেলে আরও বেশী আক্রোশের কারণ হইয়া পড়িত। তার উদ্দেশ্যে দ্বিগুণ তেজে মন্দ কথা বর্ষিত হইত। কিন্তু একদিন কমলার সহ্য করিবার সীমা অতিক্রান্ত হইল। রমেন সম্বন্ধে প্রযুক্ত বিশেষণগুলিতে সে মৃদুভাবে আপত্তি করিল। আর যায় কোথা? অত্যন্ত আদরের কমলা, বাপের চোখের মণি, মায়ের আঁচলের নিধি,—তারও নিস্তার নাই। রমেনের সমর্থন করিয়াছে কি কপালে তিরস্কার জুটিয়াছে। কিন্তু একবার মুখ খুলিয়া কমলার ভয় ভাঙ্গিয়া গেল। সে তার পিতা-মাতাকে এই কথাই বুঝাইতে চাহিল, দারিদ্র্য অপরাধ নহে। রমেন দরিদ্র বটে, কিন্তু তার মন উচ্চ। তার মহৎ চরিত্রকে অস্বীকার করিয়া আর কিছু তাকে খাট করা যায় না। তার পশ্চাতে তার নিন্দা করা বা তাকে লঘু করা দ্বারা তারা আর কিছু উন্নত পর্য্যায়ে আরোহণ করিবে না। বলা বাহুল্য, সেদিনকার কচি মেয়ের যুক্তিতর্ক অগ্নিতে ইন্ধন-স্বরূপ মাত্র হইল। তাতে রমেনের প্রতি বিরূপতা বাড়িল বৈ কমিল না। বরং কমলার উপর রমেনের অন্যায় প্রভাব আশঙ্কা করিয়া কমলার পিতা-মাতা শঙ্কিত হইলেন। যত শীঘ্র নরেশের সহিত কমলার বিবাহ হয় ততই মঙ্গল। না হওয়া পর্য্যন্ত রমেন ও কমলার মেলামেশার উপর তাঁরা তীব্র চোখ রাখিলেন এবং উহারা যাতে কিছুতেই একা না থাকে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিলেন। তার রমেনদের বাড়ী যাওয়াও তাঁরা পছন্দ করিতেন না। তবে রমেনদের স্বল্পায়তন গৃহে লোক অনেক। সেখানে পরস্পরকে তারা একা পাইবে না, এই ভাবিয়া তাঁরা কতকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন।

কমলার যেন বন্দী জীবন আরম্ভ হইয়াছে। তার সেই সহজ সরল জীবন আর নাই। যে কাজ করিতে যায় তার উপর জাগ্রত চক্ষু রহিয়াছে। সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই, তার স্নেহময় পিতা-মাতা তার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে, নালিশ করিবার কিই বা আছে? কমলার প্রতি তাঁদের ভালবাসা ত একটুও কমে নাই। তাঁরা তার সুখ চান। যা কিছু করিতেছেন, তার সুখের জন্য করিতেছেন। বেশী দোষ তাঁদের দেওয়া চলে না। তাঁদের দৃষ্টির সহিত নিজ দৃষ্টি মিলাইতে না পারাতেই কমলা এত দুঃখ পাইতেছে। তার কান্না যেন আর বিরাম মানিতে চায় না। তার ইচ্ছা করে, সে কোথাও পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করে। কোথায় থাকিত আজ নরেশ, রমেন উদ্যোগী হইয়া তাকে পরিচিত করিয়া না দিলে? নরেশের নাগাল কেহ পাইত না। পরন্তু কমলার সহিত নরেশের বিবাহের কথা ভাবা,—কারও পক্ষে সম্ভব হইত না। মাথায় আসিত না। আজ নরেশ ও রমেন সম্বন্ধে দুই রকম ব্যবস্থা করা হইতেছে। নরেশের সহিত মেশা সম্পর্কে তার অবাধ স্বাধীনতা। কোন জাগ্রত চক্ষু তাকে অনুসরণ করে না। কিন্তু রমেন ঘরে আসিলে আর রক্ষা নাই। পুলিশের মত তার উপর চোখ রাখা হইয়াছে। রমেনের পক্ষে ইহা অত্যন্ত অপমানকর। রমেন কি ইহা বুঝিতে পারে নাই? এই আচরণের উত্তরে রমেন যদি তাদের বাড়ীতে আর আগের মত না আসে, তা হইলে তাকে কি খুব বেশী দোষ দেওয়া যায়?

সে যেন বন্দিনী সীতা। সে রামের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তার রাম, তার রমেন, যদি আসিয়া তাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যায়, তা হইলে তার আর সুখের সীমা থাকিবে না। সে সেকালের সীতার মত তার রামের পিছনে পিছনে বনে যাইতেও প্রস্তুত আছে। ভালবাসার জনের জন্য সকল দুঃখ হাসিমুখে বরণ করা যায়। কিন্তু তার রাম কে? রামের মত সেই দুর্জ্জয় সাহস কি রমেনের আছে? রমেন কি তাকে এই কারাগার হইতে জোর করিয়া বাহিরে আনিতে পারে? যদি কেউ পারে, সে হয়ত

নরেশ। রমেন নয়। কারণ আজিকাল ধন ও ঐশ্বর্য্যের জোরই জোর। চরিত্রের জোরের কোন মূল্য নাই। রমেন সাহসী হইলে কমলার পক্ষে সাহস করা কঠিন নয়। আজও হয়ত সাহস ও অভিযানের যুগ শেষ হয় নাই। বিবাহের পূর্ব্বে সীতাকে অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। যা কিছু পরীক্ষা রামের হইয়াছিল। বহু পরীক্ষার পর রামের পক্ষে সীতাকে লাভ করা সম্ভব হয়। কিন্তু আজিকার যুগে বিবাহের পূর্ব্বে কমলাকে কি না সংগ্রাম ও পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইতেছে! রমেনের জীবনেও হয়ত সংগ্রামের অন্ত নাই। তথাপি রমেনের মধ্যে সেই সাহস, ভালবাসার জন্য সেই মরণ-পণ, দেখিতে চায়, যাতে তার নিজের কাছে নিজের মর্য্যাদা বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু তার মনের এই আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা কেহ বুঝে না। হয়ত কেহ বুঝে। তার দাদা ও বৌদির কাছে সে ত চিঠিতে নিজেকে ধরা দিয়াছে। তারা উপহাস করে নাই। পরন্তু বৌদি উৎসাহ দিয়াছে। সে লজ্জায় সব কথা লিখিতে পারে নাই। ভয়ে ভয়ে একটুখানি নিজেকে প্রকাশ করিয়াছিল। তার আশা ছিল, তার বৌদি ভালবাসিয়া বিবাহ করিয়াছে, সে ভালবাসার মর্য্যাদা বুঝিবে। নিরাশ হয় নাই। বৌদির উৎসাহ-বাণীর পিছনে দাদার সায় আছে, ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইহার পর তাদের কাছে সে লজ্জায় হয়ত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। বৌদি যে কত রকম ঠাট্টা করিবে, কে জানে? কিন্তু তারা তার ভালবাসার সমর্থন করিয়াছে। ভালবাসার জনটি কে, জানিলে সমর্থন করিবে কি? নরেশকে সমর্থন করা সহজ। নরেশের সহিত তার বিবাহের প্রস্তাব তারা সমর্থন করিয়াছে। কিন্তু তার দাদা ও বৌদির নিশ্চয় বোঝা উচিত, তার ভালবাসা নরেশের প্রতি ভালবাসা নয়। নরেশের প্রতি ভালবাসার কথা হইলে তার লিখিবার কোন প্রয়োজন থাকিত না। যার সহিত দুদিন বাদে বিবাহ হইবে তাকে পাইবার ও ভালবাসিবার জন্য কেহ ব্যাকুলতা প্রকাশ করে না। কে তার ভালবাসার জন, তা জানিবার জন্য অন্তত তার বৌদির

ঔৎসুক্য প্রকাশ করা উচিত ছিল। করিলেই যে সে নাম বলিয়া ফেলিত, তা নয়। কিন্তু বীণা সেই নামটি জানিতে চাহে নাই বলিয়া সে দুঃখিত। তবু দাদা ও বৌদিকে ধন্যবাদ যে, তারা তার ভালবাসার যথোচিত মর্য্যাদা রাখিয়াছে। তাদের উৎসাহ-বাণীর হয়ত তার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু হায়! তাতে তার বর্ত্তমান জটিল সমস্যার কোন সমাধান হইবার সম্ভাবনা নাই। তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে না।

তার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবার ও কড়া নজর রাখিবার আরও কারণ ঘটিয়াছে। কমলার মা কমলাকে বলেন, 'তুই এমন ব্যবস্থা কর্ যাতে রমেন আর আমাদের বাড়ীতে না আসে।' অর্থাৎ রমেনকে বলিয়া দাও সে যেন আর তাদের বাড়ীতে না আসে। কমলা দৃঢ়স্বরে আপত্তি জানাইয়া বলিয়াছে, তার দ্বারা এ কাজ সম্ভব হইবে না।

কেন হইবে না?

কারণ, এ কাজ চূড়ান্ত ইতরামি। বিনা দোষে একটা লোকের সঙ্গে এ রকম অভদ্র ব্যবহার করা যায় না।

ইতরামি! রমেনের সহিত তাদের কি সম্পর্ক যে ভদ্রতার ধার ধারিতে হইবে? আমার বাড়ী। আমি এখানে যা খুসী করিতে পারি। বাধা দিবার সাধ্য কার? আমি যদি মনে করি, রমেনের আসা উচিত নয়, তা হইলে আমি তা বলিব না কেন? কমলাকে বুঝাইয়া দেওয়া দরকার যে, তার নিজের স্বার্থের জন্য এখন রমেনের নিজ হইতে তার সহিত মেলামেশা ত্যাগ করা উচিত। রমেনের মত বুদ্ধিমান্ লোকের নিকট অন্তত এইটুকু সদ্বিবেচনা আশা করা গিয়াছিল। দেখা যাইতেছে, তা তার নাই। সুতরাং কমলাকে নিজেই নিষ্কণ্টক হইতে হইবে। কমলা ইচ্ছা করিলে তাকে মিষ্ট কথায় বিদায় দিতে পারে। হাঁ, রমেনকে বিদায় করিতে হইবে। মানুষের জীবনে এ রকম পরিচয় ত কত হয়! তাই বলিয়া প্রত্যেক পরিচিত ব্যক্তিকে আঁকড়াইয়া থাকিতে হইবে?

কমলার স্বার্থ! স্বার্থটা কি তা মনে করিতে কমলার মুখ লাল হইয়া গেল। কিন্তু সে তার জেদ্ ছাড়িল না। সে রমেনকে বিদায় দিতে প্রবলভাবে অস্বীকার করিল। ইহার পূর্ব্বে সে কখনও ভাবিতে পারে নাই, এমন তেজের সহিত পিতা-মাতার কোন কথার প্রতিবাদ করিতে পারিবে। তাঁরাও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

কিন্তু বলা বাহুল্য মাত্র, ফল ভাল হইল না। না তার পক্ষে, না রমেনের পক্ষে। রমেনকে এই কথা বুঝিবার জন্য প্রচুর অবসর দেওয়া হইল যে, এই পরিবারের মধ্যে তার গতিবিধি প্রত্যাশিত ত নয়ই, অনাকাঙ্ক্ষিত ও অশোভন। কমলার মনের ভাবটা কি, অর্থাৎ সে দুদিন আগেও অপরিচিত ও অপদার্থ রমেনের জন্য কেন এরূপ অপ্রত্যাশিত পক্ষপাতিতা দেখাইতেছে? তাঁদের অনবধানতার সুযোগ লইয়া রমেন কি কমলার সহিত মিশিতে গিয়া সীমা অতিক্রম করিয়াছে? রমেনের সম্বন্ধে তাঁদের বরাবর ভাল ধারণা ছিল। আজও আছে। কিন্তু কমলার আচরণে তাঁদের সেই ধারণা পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। রমেনকে তাঁরা এবং আর সকলে চিরকাল অপদার্থ ভাল মানুষ বলিয়া ভাবিয়াছিলেন। হয়ত সে তা নয়। হয়ত সে কপটাচারী। তারপর তাঁদের কন্যা কমলার উপর রমেন কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে, ইহা তাঁরা সহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁদের এখন বড় কর্ত্তব্য হইতেছে—কমলাকে সুখী করা, কমলাকে বিবাহ দেওয়া। সেই কর্ত্তব্যের নিকট অন্য সকল কর্ত্তব্য তুচ্ছ। আজ যদি সেই কর্ত্তব্য-সাধনে রমেন বাধা স্বরূপ হয়, তা হইলে নিশ্চয় তাকে ক্ষমা করা হইবে না। কমলার এক একবার জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, তাকে সুখী করা যদি উদ্দেশ্য হয়, তা হইলে তার প্রতি এরূপ নির্ম্মম ব্যবহার ও রমেনকে নিত্য গালাগালি কেন করা হইতেছে? ইহাতে তার যে পরম দুঃখ ও অশান্তি হয়, তা তাঁরা তার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়াও বুঝিতে পারেন না কেন? তার মঙ্গল করিতে হইবে বলিয়া কি জোর করিয়াই করিতে হইবে? এত কাল সে এক ভাবে মানুষ হইয়াছে।

পিতা-মাতার কাছে স্নেহ, আদর ও সদয় ব্যবহার ভিন্ন আর কিছুই পায় নাই। আজ তাঁরা রুদ্রমূর্ত্তি। এ মূর্ত্তি তার অভ্যস্ত নয়। ইহা সে সহ্য করিতে পারে না। সে লুকাইয়া লুকাইয়া চোখের জলে বুক ভাসাইয়া দেয়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, ঠাকুর, এ দুঃখের প্রতীকার কর।

কমলা যেন দুই অগ্নির মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে। নিজের গৃহে এক অগ্নি। আর রমেনদের গৃহে আর এক অগ্নি। নিজের পিতা-মাতাকে তার আজ অত্যন্ত পর মনে হইতেছে। ইহাদের সঙ্গ তার অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের হাত হইতে উদ্ধার পাইলে সে যেন বাঁচিয়া যায়। বাস্তবিক, এক এক সময় সে এই ভাবিয়া আশ্চয্য হয় যে, যে পরিবারে সে এত বড়টি হইয়াছে, তার প্রকৃত স্বরূপ যেন এতদিন চিনিতে পারে নাই। পিতা-মাতার অতিশয় স্নেহ-কোমল অন্তরের অন্তরালে যে এত কাঠিন্য লুক্কায়িত রহিয়াছে, কে জানিত? সে তাঁদের সন্তান হইয়া জন্মিয়াছে বলিয়াই কি তার সকল প্রকার স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছে? সে তার সকল কাজের ফলাফলের দায়িত্ব নিজে লইতে প্রস্তুত আছে। কোন দিন সে তার সুখদুঃখের জন্য কাহাকেও দায়ী করিবে না। কিন্তু স্বাধীনভাবে সে নিজ হৃদয়ের পথ অনুসরণ করিতে চায়। এই স্বাধীনতা তার একমাত্র কাম্য। মনকে বাধা দিলে মনের গতি আরও দুর্জ্জয় হইয়া উঠে, একথা কেন তাঁরা বুঝিতে পারেন না? যদি তার মন রমেনের দিকে ছুটিয়া গিয়া থাকে, তা হইলে কোন্ শক্তি দিয়া তা ফিরাইয়া আনা যায়? বরং বাধা পাইয়া কমলার মন আরও বেগে রমেনের দিকে ধাবিত হইতেছে। এ অবস্থায় তাকে বাধা দেওয়া, তাকে চোখে চোখে রাখা, পীড়নের নামান্তর মাত্র। বাহিরে—তার ভূস্বর্গে—রমেনের বাটীতে, তার ত পীড়নের অন্ত নাই। বেলা ও শীলার হাতে তাকে নিত্য কত লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়। আজকাল ও বাড়ীর হাওয়ায় যেন আগুন রহিয়াছে। ওদিকে পা বাড়াইতে মন সরে না। তাদের বাড়ীর হাওয়াতেও আগুন। তার পক্ষেই অসহ্য, রমেনের পক্ষে কিরূপে সহনীয় হইবে? রমেন

কি তাদের বাড়ীর দিকে পা বাড়াইতে উৎসাহ বোধ করিবে? কমলা যেন দুই দিকের আগুনে ঝল্‌সাইয়া উঠিতেছে।

কমলার মনে বড় জ্বালা। কিছুতেই এ জ্বালা নিবাইতে পারে না। রমেন পুরুষ মানুষ। তার জীবন ও কর্ম্মক্ষেত্র নিজ বাটীর সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। সে ইচ্ছা করিলেই ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু কমলার জুড়াইবার জায়গা কোথা? কোন্ প্রশস্ত বক্ষে আশ্রয় পাইবে বলিয়া কমলা এই যন্ত্রণা, এত ব্যথা বরণ করিয়া লইয়াছে? সে যে মরীচিকার পিছনে দৌড়াইতেছে না, তাই বা কে বলিবে? ভালবাসিয়া এত জ্বালা, কে জানিত? ভালবাসিয়া এত কাঁদিতে হয়, তাই বা কে জানিত? কমলা ভাবে, তার জীবনে এ কি দুর্দ্দিন আরম্ভ হইল? তার জীবন-বিধাতা এ কোন্ স্থানে তাকে লইয়া আসিলেন? তার জীবনের পথ ছিল সরল, ঋজু। মোড় ঘুরিতেই সেই ঋজুতা কোথায় অপসারিত হইয়া গেল। পথের বাঁকে এত গুপ্ত শত্রু লুকাইয়া ছিল, সরলা সংসার-অনভিজ্ঞা কমলা তা কেমন করিয়া জানিবে? ভাবী কালে দুঃখঝড়ঝঞ্ঝার সহিত হয়ত তার আরও পরিচয় হইবে। তখন কোন ঘটনাই হযত তার কাছে বিস্ময়কর মনে হইবে না। কিন্তু জীবনে এই প্রথম আঘাতে কমলার বিস্ময়ের আর অন্ত নাই। এ আঘাত বড় তীব্র করিয়া তার বুকে বাজিয়াছে। মনে হইতেছে, সে যেন ধরাশায়ী হইয়া যাইবে। নিরুপায় সে। কি করিতে পারে? এত বড় বিপুল পৃথিবীতে তার ভালবাসা ধূলায় লুটাইয়া দিতে কতক্ষণ লাগে? সে যত চোখের জল ফেলুক, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার তার নিজের কোন শক্তি নাই। হযত কারও নাই। কাল যদি নরেশের সহিত তার বিবাহের আয়োজন হয়, তা হইলে পৃথিবীর কোথাও পলাইয়া গিয়া সে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। তাকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করিতে হইবে। তার মতামতের, তার হৃদয়াবেগের কোন মূল্য নাই। এমন কি, এই নিষ্ঠুর জগতে তা প্রকাশ করিবার পথ পর্য্যন্ত তার পক্ষে বন্ধ। তার মনের কথা

কেহ তার কাছে জানিতে চায় না। সে হয়ত চিরজীবন চোখের জল ফেলিবে। অন্তত, সে মনে করিতেছে, ফেলিবে। কিন্তু সে কথা বিবেচনা করিতে কেহ প্রস্তুত নহে। বস্তুত, সে তার বাপ-মায়ের অত্যন্ত আদরিণী কন্যা হইয়াও তাঁদের সম্পত্তির সমান। তাঁরা তাকে নিজ সম্পত্তি বলিয়া মনে করেন। তার উপর তাঁদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। বিবাহের পর তাঁরা সেই অধিকার ত্যাগ করিবেন। তার আগে পর্য্যন্ত তাঁদের অধিকারে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। সেও না। বিবাহ ত সম্পত্তির অধিকার-সমর্পণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তিরূপে পরিগণিত। দেশে যত আন্দোলন হোক্, স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা যত জোরে বলা হোক্, এই দেশের সমস্ত নরনারী মনে প্রাণে জানে, নারী কারও না কারও সম্পত্তি, তার স্বাধীন কোন সত্তা নাই। সুতরাং কমলার সাধ্য কি, সে এই নাগপাশের বেষ্টনী অতিক্রম করিয়া যাইবে? সাধ্য কি, সে নিজের আলোয় পথ চলিবে? কিন্তু সহ্য হয় না। ক্ষুদ্র, অজ্ঞ কমলার মনেও বিদ্রোহ করিবার বাসনা জাগে। চারিদিকের এই কারা-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য তার মন ছট্‌ফট্ করে। সে যদি তার কোন সন্ধান জানিত! কেহ যদি তাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইত!

এই শনিবার। কমলা বোঝাপড়া করিতে চায়। বোঝাপড়া রমেনের সঙ্গে নয়, নিজের সঙ্গে। কিন্তু রমেনের মন জানিতে হইবে। সে আশা করিয়াছিল, অফিস্ ছুটির পর রমেন তাদের বাড়ী আসিবে। আজকাল রমেন বড় আসে না। তবু শনিবারের অবকাশে তার জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছিল। তার জানালা দিয়া দেখিল, রমেন ইতস্তত করিতেছে। কি ভাবিয়া তাদের বাড়ীর দিকে পদচালনা করিয়াও অবশেষে নিজের বাড়ীতে গিয়া ঢুকিল। তার ইচ্ছা করিতে লাগিল, সে রমেনকে ডাক দেয়। আগেকার দিনে সে কিছুমাত্র ইতস্তত না করিয়া রমেনকে নিজের ঘরে কত বার ডাকিয়া আনিয়াছে। আবার যখন ইচ্ছা হইয়াছে, তার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু

এখন আর সেদিন নাই। তার নিজের মনে কোন প্রকার সঙ্কোচ নাই। কিন্তু তাকে এখন প্রতি পদে সাবধান হইতে হয়। সে নিজের আচরণ অন্য সকলের কাছে লুকাইতে শিখিতেছে। সংসার-পথে সরলতা যখন মানুষকে বিপন্ন করে, তখন বক্রতা ও কপটতা না অবলম্বন করিয়া উপায় কি? রমেন নিজ বাড়ীর দিকে চলিয়া যাইবার পর কমলা নিজের মনে মনে কতক্ষণ কি ভাবিয়া লইল। না, তার দ্বিধা করিলে চলিবে না। দুই হাতে সবলে সে সকল দ্বিধা সঙ্কোচ দূরে ঠেলিয়া দিল। তারপর দ্রুতপদে রমেনদের বাড়ীতে গিয়া প্রবেশ করিল। সে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল যে, তার সহিত কারও সাক্ষাৎ হইল না। বেলা, শীলা, তাদের বাপ-মা এবং রণেন, কাহাকেও সে দেখিতে পাইল না। কোথায় গেল সব? আর, এক দিনেই সকলে কোথায় গেল? রমেনের ঘরে প্রবেশ করিতে তার বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল। তার পা যেন চলিতে চায় না। তবু সে অগ্রসর হইল। দরজা ভেঙ্গান ছিল। ঠেলা দিতে খুলিয়া গেল। ধীর কম্পিত পদে কমলা ঘরে প্রবেশ করিয়া নিঃশব্দে অর্গল বন্ধ করিয়া দিল। দেখিল, রমেন তার শয্যায় সুখ-শয়নে সুপ্ত। সে তাড়াতাড়ি গিয়া তাদের বাড়ীর দিক্‌কার জানালা বন্ধ করিয়া দিল, কিন্তু তাও নিঃশব্দে। সে চায় না, ওখান হইতে কেহ তার এই চুরি করিয়া আসা দেখিতে পায়। তা হইলে বিষম অনর্থ হইবে। সে আজ বিশেষ করিয়া রমেনের কাছে আসিয়াছে। একাকী ও অসহায়। অথচ রমেন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। রমেনের মুখের দিকে চাহিয়া মনে হইল, সে যেন তার নিদ্রা উপভোগ করিতেছে। কমলা রমেনের ঘুমন্ত মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তার বক্ষের মধ্যে কত যে বেদনার অশ্রু ঠেলিয়া উঠিতে চায়, কে বুঝিবে? নিষ্ঠুর রমেন। কমলাকে তার প্রয়োজন আছে কি না, সে কথা আজ পর্য্যন্ত জানায় নাই। কমলাই শুধু বোকার মত তাকে ভালবাসিয়া মরিতেছে। কমলার বুকে অভিমান পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল। কিন্তু অভিমান কাহার বিরুদ্ধে? ভাগ্য যদি তার প্রতি বিরূপ হয়, তা হইলে সে কি

করিতে পারে? ভাগ্যের বিরুদ্ধে আর কতদূর পর্য্যন্ত লড়াই করিতে পারা যায়? কিন্তু না, কমলা সহজে হার মানিবে না। শেষ পর্য্যন্ত যুঝিয়া দেখিবে। কমলা একদৃষ্টে রমেনের মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। কত দিনের কত কথা যে তার মনে হয়! কত কথা বলিতে গিয়া সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়াছে। রমেন! সেই রমেন! কমলা যদি কোথাও আশ্রয় পাইত! কোথাও জুড়াইবার স্থান পাইত! রমেনকে দেখিলেই যে তার বুকের মধ্যে কি এক আবেগ উপস্থিত হয়, তা সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কেন এই আবেগ? রমেনের এই প্রচণ্ড আকর্ষণ কিসের জন্য? তার জীবনে এই আকর্ষণ অনুভব করা অবধি তার মনের সকল সুখশান্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

রমেনের ঘুম ভাঙ্গিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া প্রথম কোন্ দৃশ্য তার চোখে পড়িল? সে স্বপ্ন দেখিতেছিল। স্বপ্নে সে দেখিল, কমলা তার দিকে ঝুঁকিয়া আছে। তার একাগ্র দৃষ্টি রমেনের মুখের উপর নিবদ্ধ। চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখে, কমলা তার দিকে সত্যই তাকাইয়া আছে। স্বপ্ন কখনও সত্য হয়? সে জাগিয়াছে অথবা এখনও ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখিতেছে? সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। তার ঘরে কমলার আগমন এমন কিছু অভাবনীয় ঘটনা নহে, যদিও ইদানীং তার যাতায়াত কম হইয়া গিয়াছে। তথাপি স্বপ্নের মধ্যে সে যে মূর্ত্তিতে কমলাকে দেখিয়াছে, ঠিক সেই মূর্ত্তিতে তাকে তার ঘরে এই মুহূর্ত্তে দেখিবে, সে ইহা আশা করে নাই। ঘটনার মিল দৈব হইলেও আশ্চর্য্য। তার ইচ্ছা করিল, চোখ ফিরাইয়া লইবে না, একদৃষ্টে কমলার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিবে। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। তারপরই উঠিয়া বসিয়া আলস্য ভাঙ্গিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, 'কমলা, তুমি! কতক্ষণ?' কমলার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, সত্যই তার আকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। ধীরে, অতি ধীরে, কোন চিত্রকর যেন কমলার রূপান্তর আনিতেছে। আজ আর কমলাকে বালিকা বলিবার কোন উপায় নাই। তার নিটোল শরীর লাবণ্যে ও সৌন্দর্য্যে টল্‌টল্ করিতেছে। কমলা

ফর্সা ছিল, কিন্তু তার গায়ের রঙ্ এমনাদন এত পরিষ্কার ছিল কি? তার আল্‌তাহীন পায়ে কে যেন আলগোছে পাংলা আল্‌তা পরাইয়া দিয়াছে। আশঙ্কা হয়, এখনই মেঝেতে পদচিহ্ন অঙ্কিত হইয়া যাইবে। তন্বী কমলা যেন আরও লম্বা হইয়াছে। তার সুগোল দুই বাহু, বুক, কাঁধ যেন কে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছে। গড়ন এখনও সমাপ্ত হয় নাই। চোখের মধ্যে ভাষা ফুটিয়া উঠিতে চায়। চোখের কিনারায় কিনারায় কত ইসারা! তরল দৃষ্টি গভীর হইয়া আসিয়াছে। চোখের কোলে ঈষৎ রেখা পড়িয়াছে। তাতে সুন্দর দুই চোখ আরও সুন্দর দেখায়। সমস্ত দেহে যেন তার অধীরতা, অথচ নিজেকে সংযত করিয়া রাখিয়াছে। রমেনের মনে হইল, সে কমলাকে এই মুহূর্ত্তে নূতন করিয়া আবিষ্কার করিল। কমলার মধ্যেকার এই নূতন সৌন্দর্য্য কেন এত দিন তার চোখে পড়ে নাই ভাবিয়া আশ্চয্য হইল। সে মনে মনে নিজের কাছে সহস্র বার স্বীকার করিল, কমলার এই রূপ মন মাতাইয়া দেয়। সুন্দরী কমলাকে সে যদি ভালবাসিতে পারিত, তা হইলে ধন্য হইয়া যাইত। কিন্তু ভালবাসিতে কি নিষেধ আছে? না, সে ভালবাসিতে পারে। কিন্তু শুধু ভালবাসিয়া কি লাভ? কমলাকে যখন সে পাইবে না, ইহা চূড়ান্তভাবে স্থির হইয়া গিয়াছে, তখন ভালবাসিয়া ও দুঃখ পাইয়া কি লাভ? সত্য বটে, নিজ অন্তরে সে কমলাকে ভালবাসে। অন্তর হইতে তা মুছিয়া ফেলা সম্ভব নহে। অন্তরলোকে কমলার বিসর্জ্জন হয় নাই। কিন্তু তাতে কারও কোন ক্ষতি নাই। কমলারও না। কমলা স্বচ্ছন্দে পরের ঘর করিতে যাইতে পারে। হয়ত দুদিন পরে সে যাইবেও। হয়ত আজই কমলার মুখ হইতে সে শুনিতে পাইবে যে, নরেশের সহিত তার বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে। শুনুক্ না। সে ত প্রস্তুত হইয়াই আছে। সে সব কিছুর জন্য প্রস্তুত। কমলা চলিয়া গেলে নিশ্চয় সে গভীর দুঃখ পাইবে, তার বুক ফাটিয়া যাইবে। কিন্তু সব কিছুই সে সহ্য করিবে। শুধু কমলা যখন কাছে আসে, তখন তার সমগ্র চিত্ত হাহাকার করিয়া উঠে। কত কাছে কমলা, কত সহজে বুকে

জড়াইয়া ধরা যায়! হাত বাড়াইলে তাকে স্পর্শ করা যায়। কাছে টানিয়া বুকে জড়াইতে গেলে, হয়ত কমলা, তার নিভৃত প্রিয়তমা কমলা, তাকে বাধা দিবে এবং ফলে হয়ত আর কোন দিন তার কাছে একা আসিবে না। কালকার ভাবনা কোন্ মূঢ় আজ ভাবে? আজিকার সুখের কাছে কালকার ভাবনা ভাবিবার প্রয়োজন কি? আজ যদি সে কমলাকে এত কাছে পাইয়াছে, তা হইলে নিজের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিলে ক্ষতি কি? আর কমলার জীবনে কি দুর্ব্বল মুহূর্ত্ত থাকিতে পারে না? এই মুহূর্ত্ত যে সেই দুর্ব্বল মুহূর্ত্ত নহে, তা কে বলিবে? কিন্তু হায় রমেন! কমলার দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের সুযোগ লইবার কোন উপায় নাই। একটি বালিকাকে তুমি কোন ক্রমেই বিভ্রান্ত করিতে পার না। তুমি তোমার পরিবারের সুখের বেদীমূলে নিজেকে বিসর্জ্জন দিয়াছ, একথা ভুলিলে চলিবে না। তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়াছ, তুমি কমলাকে বিবাহ করিবে না, তা কি ভুলিয়া গিয়াছ? না হয় প্রতিশ্রুতি নাই মানিলে। কিন্তু কমলাকে আশ্রয় ও সঙ্গতি দিবার মত ক্ষমতা তোমার আছে কি? কমলাকে আকর্ষণ করিলে তুমি নিজেও ডুবিবে, তাকেও ডুবাইবে। ক্ষণিকের মোহে পথ ভুলিও না। এই সুন্দর সরল জীবনটিকে স্পর্শ করিয়া অভিশপ্ত হইও না। রমেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। যেন একটা দুঃস্বপ্ন গা-ঝাড়া দিয়া ফেলিয়া দিতেছে।

কমলা সরিয়া গিয়া টেবিলের সাম্‌নে চেয়ারে বসিল। তারপর রমেনের দিকে ঘুরিয়া বলিল, 'হাঁ, আমি কমলা। বাপ্‌রে বাপ্, আধ ঘণ্টা এসে দাঁড়িয়ে আছি। ঘুম আর ভাঙ্গেই না।' রমেনের দীর্ঘনিঃশ্বাস কি কমলার বুকে বাজিল? না, রমেনের চোখে যে ক্ষুধা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তা বুঝিতে পারিয়া সে সরিয়া গেল? ভালই হইয়াছে, সে সরিয়া গিয়াছে। রমেন আত্ম-চেতনা ফিরিয়া পাইতেছে।

সুতরাং রমেন কোনরূপ বেয়াদপি না করিয়া শান্তস্বরে বলিল, 'আমায় ক্ষমা কর, কমলা। আমি এমন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম যে, টের পাই নি, তুমি এসেছ।'

কমলা হাসিল : 'এতে ক্ষমা কর্‌বার কি আছে ? ঘুমটা নিশ্চয় অপরাধ নয়। আর ঘুমের মধ্যে আমি আস্‌ব, এটা আপনার জান্‌বার কথা নয়। কিন্তু জান্‌বার কথা একটা আছে।'

'কি ?'

'স্বপ্নের ঘোরে আপনি, তুমি কমলা বলে, চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন কেন ? কিছু স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেন নিশ্চয়। স্বপ্নটা আমি শুন্‌তে পারি ?'

রমেন বিছানার উপর ভাল করিয়া উঠিয়া বসিল। বিদ্যুতের মত সমগ্র স্বপ্ন তার মনে ঝল্‌সিয়া উঠিল। কিন্তু বাহিরে ঠাণ্ডা আওয়াজে বলিল, 'চেঁচিয়ে উঠেছি না কি ? ভাগ্যে, কমলার নাম উচ্চারণ কর্‌বার সময় কমলা নিজে উপস্থিত ছিল।'

'ভাগ্য হয়ত, কিন্তু সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য তা ত জানেন না।'

'সৌভাগ্য নিশ্চয়। কমলা সৌভাগ্য ছাড়া কিছু আনে না।'

'সে-কমলা দেবতা।'

'দেবী কমলার চেয়ে মানবী কমলা কিছু কম যান, এখন পর্যন্ত প্রমাণ হয় নি।'

কমলা হাসিয়া উঠিল, 'কি যে বলেন ! দেবদেবীর সঙ্গে আমার তুলনা !'

'তুলনা ত দি নি।'

'তা হলেও একসঙ্গে নাম উচ্চারণ কর্‌তে নাই।'

'কেন, মহাভারত অশুদ্ধ হবে ?'

'মহাভারত কিসে অশুদ্ধ হয়, জানি না। কিন্তু দেবী কমলার সঙ্গে মানবী কমলার আস্‌মান জমিন তফাৎ। কে জানে, কমলা হয়ত চির-দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে !'

শেষের দিকে কমলার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল কি ? জল না আসুক্‌, কমলা কথাগুলি গভীরভাবে বলিয়াছিল ও মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল। ক্ষুদ্র কয়েকটি শব্দ। কিন্তু সেগুলি গিয়া তীরের মত রমেনের বুকে বিঁধিল।

সে কণ্ঠস্বরে মমতা ভরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন কমলা, একথা কেন বল্‌ছ? একথা বলা তোমার সাজে না। তোমার সুখ ও সৌভাগ্যের জন্য ত সবাই চেষ্টা কর্‌ছে। আর যদি বিশ্বাস কর, তা হলে বলি আমিও তোমার শুভার্থী। আমি তোমার চির-সৌভাগ্য চাই।'

হায়! রমেন কি সত্যই জানে না, কমলা কেন একথা বলিতেছে? রমেন কমলার শুভার্থী, একথা বিশ্বাস করা কমলার পক্ষে কঠিন নয়। কিন্তু ঐ কথায় তার হৃদয়ের জ্বালা প্রশমিত হইবার নহে। তবু সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া বিছানায় রমেনের পাশে বসিল। বলিল, 'কই, আপনার স্বপ্নের কথা ত বল্লেন না।'

রমেন একটু ভাবিয়া লইয়া বলিল, 'কিন্তু সেটা এমন স্বপ্ন যে তার সবটা তোমায় বলা যায় না। ইচ্ছা থাক্‌লেও বলা যায় না।'

'কেন?'

'লজ্জা করে।'

'স্বপ্ন স্বপ্ন, তা বল্‌তে আবার লজ্জা কি? আমায় বলুন না, আমি আমার সব স্বপ্ন অনর্গল বলে যেতে পারি। স্বপ্ন ত আর সত্য নয়।'

'ধর যদি স্বপ্ন সত্য হয়, তা হলে—'

'ভবিষ্যতে স্বপ্ন যদি সত্য হয়? তা হয় হবে। তাই বলে আজকে যা স্বপ্ন তা ত স্বপ্নই।'

রমেনের মুখে দুষ্ট হাসি দেখা দিল: 'ভবিষ্যতে কেন? আমার স্বপ্ন ত হাতে হাতে ফলেছে। আমায় অপেক্ষা কর্‌তে হয় নাই।'

'কি রকম?'

'রকম এই যে, তুমি বিশ্বাস কর্‌বে কি না সন্দেহ।'

'আপনি বলুন, আমি বিশ্বাস কর্‌ব।'

'আমি যদি বলি স্বপ্নে তোমায় দেখেছি, তা হলে বিশ্বাস করা শক্ত হবে না। কিন্তু যদি বলি স্বপ্ন ভাঙ্গবার আগের মুহূর্তে তোমায় যে ভাবে দেখেছি,

ভেঙ্গে যাবার পর তোমায় ঠিক-তাই মূর্ত্তিতে দেখ্‌লাম, তা হলে তোমার বিশ্বাস হবে কি ? না, মনে হবে, বানিয়ে বল্‌ছি ?'

'বিশ্বাস হবে। কিন্তু আমি আপনার স্বপ্নটা আগাগোড়া শুন্‌ব। আপনার স্বপ্নের মধ্যে আমি এলাম কি করে ?'

'আরে, স্বপ্ন যে আগাগোড়া তোমাকে নিয়ে। না, ঠিক তোমাকে নিয়ে নয়। যাকে নিয়েই হোক্‌, শেষ পর্য্যন্ত তুমি ছাড়া কেউ রইল না।'

'স্বপ্নটা শুন্‌তে আমার ভারী ইচ্ছা হচ্ছে। বলুন না আপনি।' কমলা মিনতি করিতে লাগিল।

রমেন সংক্ষেপে তার স্বপ্নের এইরূপ বর্ণনা করিল। সে যেন নূতন এক সহরে উপস্থিত হইয়াছে। সেখানে কাহাকেও চেনে না। চলিতে চলিতে সে এক বাজারে গিয়া উপস্থিত। বাজারে ভয়ানক ভীড়। ভীড় ঠেলিয়া ভিতরে যাইতে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ভীড শুধু নরনারীর নয়, সিংহ, বাঘ, গণ্ডার প্রভৃতি বন্য জন্তরাও বাজার করিতে আসিয়াছে। রমেন ত দেখিয়া স্তম্ভিত। সেখানকার লোকজনেরা পশুরাজের গা ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া চলিয়াছে, কারও মনে একটু ভয় নাই। কিন্তু সে না কি নেহাৎ বাংলা দেশ হইতে আসিয়াছে, সে পশুদের দেখিবামাত্র ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল। পশুদের দিকে পিছন ফিরিয়া সে পলায়ন করিবে, এমন সময় তার ভীত ভাবের সুযোগ লইয়া এক সিংহী তাকে তাড়া করিল। সে প্রাণভয়ে দৌড়াইতে লাগিল। কিন্তু দৌড়াইয়া যাইবে কোথায় ? সে যত দৌড়ায় সিংহীও তার পিছনে তত দৌড়ায়। শেষে তারা এক সুন্দর নদীতীরে গিয়া উপস্থিত হইল। ওপারে কালো পাহাড়। সে ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল। সিংহীও তার কাছে বসিল। তখন সে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, সিংহী ত নয়, এ যে কমলা। তাই জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কমলা !'

রমেনের গল্প শুনিয়া কমলা মুখে কাপড় চাপা দিয়া খুক্‌ খুক্‌ করিয়া হাসিতে লাগিল। রমেন বলিল, 'ও কি কমলা, হাসিটার গলা টিপে মারছ কেন ?'

'সব সময়ে মেয়েদের হাসা ভাল নয়'

'হাসি পেলেও হাসবে না ?'

'না।'

'তা হলে তুমি হাস্‌ছ কেন ? একেবারে না হাস্‌লেই ত পার্‌তে।'

'বাঃ, আপনি এমন অদ্ভুত স্বপ্ন দেখ্‌বেন, আর আমি হাস্‌তে পারব না ? আপনাকে সিংহীটা কি ভাবে তাড়া করেছিল ! যত মনে হয়—।' আবার হাসি। 'মাগো, শেষকালে আমাকে কি না সিংহী করে ফেল্লেন ! এ আপনার ভারী অন্যায়। দেবী মানবী কত কি বলে শেষে সিংহী।'

'তুমিই ত বলেছ স্বপ্ন স্বপ্ন, মানুষ ত আর নিজে ইচ্ছা করে স্বপ্ন দেখে না। তোমার রাগ করা উচিত নয়।'

'আমি রাগ করেছি, আপনাকে কে বল্ল ?'

'তোমার কথার ভাবে মনে হচ্ছে।'

'ছাই বুঝেছেন। আপনারা পুরুষ মানুষ। মেয়েদের রাগ অনুরাগ কিছুই বুঝ্‌তে পারেন না।'

'তা হবে। কিন্তু তোমরা মেয়েরা পুরুষ মানুষদের অনুরাগ বুঝ্‌তে পার কি ?'

'নিশ্চয় পারি।'

'তা হলে বল, আমি কার অনুরাগী।'

'ওঃ, আপনি কি চালাক ! আপনি নিশ্চয় ভেবেছেন, আমি বল্‌ব,—আমি জানি আপনি কমলার অনুরাগী।'

'তুমি কি বল্‌বে, তা আমি কি করে জান্‌ব ?'

'জান্‌তে না পারেন, ভাব্‌তে পারেন ত।'

'না, ভাবিও না।'

'ঈস্‌, ভারী সাধু পুরুষ !'

'আমি অসাধু, আশা করি, এ প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত আমার কাছ থেকে পাও নি।'

'আচ্ছা, আপনি এমন কেন [illegible] ? আমি কি সত্যি আপনাকে অসাধু বলেছি ? আপনাকে ঠাট্টা করলে আপনি গায়ে মাখেন ত আমায় কথা বন্ধ করতে হয়।' কমলা একেবারে রমেনের কাছ ঘেঁষিয়া অসহায়ের মত বসিল।

রমেন কমলার মাথায় হাত রাখিয়া বলিল, 'যদিও কথাটা আমিও ঠাট্টা করে বলেছি, আর তোমার তা নিয়ে কিছু মনে করা উচিত নয়, তবু কমলা, আমার মাঝে মাঝে জানা দরকার, আমি মাত্রা ছাডিয়ে যাচ্ছি কি না। জানা দরকার, আমি এমন কোন আচরণ তোমার প্রতি করছি না, যাতে পরে তার কোন কদর্থ হয়।'

যেন নিজেকে মাত্রার বর্ম্মে আঁটিয়া সুসজ্জিত সভ্য হইবার জন্যই রমেন জন্মগ্রহণ করিয়াছে ! মাগো, ভুল করিয়াও কি একটু এদিক ওদিক্ হইতে নাই ? তাব মনে পডিযা গেল, এই সেদিন আর একজন তার মাথায় হাত রাখিযাছিল এবং সে তৎক্ষণাৎ মাথা সরাইয়া লইয়াছিল। অথচ আজ ত তার মাথা সরাইয়া লইবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তার আরাম লাগিল। ঐ দুখানি হাত। ঐ ডান হাত। রমেনের দক্ষিণ বাহু কি যথেষ্ট সবল নয় ? শিরা উপশিরাময ঐ দক্ষিণ বাহু। উহা কি এ সংসারে তার নির্ভরস্থল হইতে পারে না ? মমতায় কমলা রমেনের হাতের উপর হাত রাখিল। ঠিক স্বপ্নে যেমন রাখিয়াছিল।

রমেনের স্বপ্ন মনে পড়িল। কমলার হাত কি ইঙ্গিতময় ? সেখানে কি কোন ভাষা ফুটিয়া উঠিল, যা রমেন ইচ্ছা করিলে পড়িতে পারে ? অথবা এ সকল কবি-কল্পনা। কিন্তু কমলাকে সহজেই ভোলান যায়। যে স্বপ্ন রমেন দেখে নাই, তাই সে বর্ণনা করিল। কমলা কিছুই বুঝিতে পারিল না। জীবনের পথে কোন প্রতারণাই হয়ত কমলা ধরিতে পারিবে না।

কমলা আস্তে আস্তে বলিল, 'আমার জন্য আপনার একটুও মায়াদয়া নাই।'

রমেন কমলার উপর পূর্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিল, 'একথা কেন বল্লে কমলা ?'

কমলা নিরুত্তর।

'বল, কেন বল্লে ?'

তথাপি কমলা কোন উত্তর দেয় না।

রমেন মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, 'তুমি যদি জবাব না দাও, তা হলে আমি আর কি করব ? আমি ত আর জোর করে তোমাকে কথা বলাতে পারি না। হয়ত তুমি বল্‌তে চাও না। কিন্তু একথা আর বোলো না। শুন্‌লে আমার কষ্ট হয়।'

'আপনার কষ্ট হয় বলে আমি সত্য কথা বল্‌তে পার্‌ব না ? কিন্তু কেন ? আমি যা বুঝ্‌ব, তা বল্‌বই। আর, কেউ কথা না বল্লেও তাকে কথা বলান যায়। আপনি সে সঙ্কেত জানেন না।'

'সত্যি আমি জানি না। আমায় শিখিয়ে দাও। এর পর দরকার হলেই তা কাজে লাগ্‌বে। তুমি যা বুঝ্‌বে নিশ্চয় তা বল্‌বে। তাতে বাধা দেবার আমার কোন অধিকার নাই। কিন্তু আমার সম্বন্ধে যদি কিছু ভাব, তা হলে আমার অন্তত এইটুকু অধিকার আছে যে, আমি তোমায় শুধ্‌রে দিতে পারি, এ তুমি স্বীকার কর ত ?'

'না, করি না। আমার সম্পর্কে আপনার কোন অধিকার নাই।' কমলা হাসিল। 'কথা বলাবার সঙ্কেত আমি নিশ্চয় শিখিয়ে দেব না।'

রমেন বক্ষে মৃদু করাঘাত করিয়া কৃত্রিম দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিল, 'হায়, আমার বেলা, সবই না। আমি নিতান্ত ভাগ্যহীন, তাই আমায় কমলাও কিছু দেবে না।'

'যেন কমলার কাছে কোন দিন কিছু চেয়েছেন !'

'তা, ঠিক চাইনি। বরং কমলাই একদিন চেয়েছিল।'

'কি ?'

'আমাদের ছাদে উড়ে আসা একটা সেমিজ।'

'ওঃ, আপনার সেই কথা মনে আছে !' কমলা আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, 'এখনও সে কথা মনে আছে ?'

'না থাক্‌বার ত কোন কারণ নাই।'

'আমি ত ভেবেছিলাম, আমার সেই বেয়াদপি ভুলে গেছেন।'

'বেয়াদপি ?'

'বেয়াদপি নয়! অজানা অচেনা এক ভদ্রলোককে ডেকে বলা, মশায় শুনুন ত, আমার সেমিজটা আপনাদের ছাদে উড়ে গেছে। এনে দিন ত। যেন ভদ্রলোক আমার চাকর। যেন আমার কথা শুন্‌বামাত্র দৌড়ে গিয়ে সেমিজটি এনে দিতে বাধ্য। আজ ত আমার সে কথা মনে পড়্‌লেও হাসি পায়।'

'আমার কিন্তু মনে কর্‌তে মজা লাগে। ভাগ্যে, সেদিন তুমি আমায় ডেকেছিলে—'

'তাতে কি হয়েছে ?'

'আমার সেদিন ভারী ভাল লেগেছিল। আজও লাগ্‌ছে।'

'সেদিন লাগ্‌তে পারে। কিন্তু আজ লাগ্‌বাব কি কারণ ?'

'সেদিন ভাল লাগার কারণ নিশ্চয় বুঝে নিয়েছ ?'

'নিশ্চয়।'

'কি ?'

'যে কমলার মত একটা সুন্দর মেয়ে নিজ থেকে আমার সঙ্গে আলাপ কর্‌ল।'

'সে কি কম কথা ? কিন্তু কমলা দেখ্‌ছি নিজের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বেশ সচেতন।'

'তা আজকালকার মেয়ে। চোখ বুজে ত চলি না।'

'সুন্দর মেয়ের সঙ্গে আলাপ কর্‌লে কি ভাল লাগে ?'

'সুন্দর মেয়েকে ভাল লাগ্‌লে তার আলাপ নিশ্চয় ভাল লাগে।'

'তা হলে সুন্দর মেয়েটিকে আমার ভাল লাগে এ তুমি ধরে নিচ্ছ।'

'ধরে নেওয়া গেল।'

'সেদিন না হয় ভাল লাগ্‌ল। আজ সে কথা মনে কর্‌তে ভাল লাগ্‌বে কেন ?'

'সেই ত প্রশ্ন।'

'প্রশ্ন মানে?'

'আমি যা জান্‌তে চাই, উল্টে তা আপনি আমায় যদি জিজ্ঞাসা করে বসেন, তা হলে বুঝ্‌তে হবে, জবাব দিবার ইচ্ছা ত নাই-ই, আবার আমাকে জব্দ করতে চান।'

'আমি?'

'আপনিই ত!'

'কি তুমি জান্‌তে চাও, বল, বল্‌ছি। দেখ্‌বে আমি তোমার মতন নয়। বিনা সঙ্কেতে আমার মুখ খুল্‌তে পারবে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।'

কমলা হাসিল: 'অত জারিজুরি শেষ পর্যন্ত টেঁকে কি না দেখা যাবে। কিন্তু মনে থাকে যেন যে কথা দেওয়া হয়েছে, আমি যা জান্‌তে চাইব, তাই বলা হবে। কথার খেলাপ যেন হয় না।'

'না, হবে না।'

'আমার জান্‌বার আছে অনেক। প্রথম নম্বর। স্বপ্নের মধ্যে আমাকে সিংহী করে ফেলেছিলেন অথবা সিংহীই শেষে কমলা হয়ে গেল, তাতে আমার আপ্‌শোষ নাই। অবশ্য যদি আমায় হরিণ দেখ্‌তেন, তা হলে বেশী খুসী হতাম। কিন্তু স্বপ্নের উপ্লব ত আপনার হাত নাই। কাজেই সেজন্য আপনি দায়ী নন। কিন্তু আপনার মনে আছে, আপনি বলেছিলেন স্বপ্নটা আমার কাছে বলতে লজ্জা করছে?'

কমলা কোন কথা সহজে ভুলিবার পাত্রী নয়। তা ছাড়া রমেনের গল্প বলার মধ্যেই কি উহার মরণ-বীজ লুকাইয়া ছিল? আপনার অজ্ঞাতসারে হয়ত সে এমন ভাবে স্বপ্ন-বর্ণনা করিয়াছে যে, উহাকে কাহিনী বলিয়া কমলার খট্‌কা লাগিতেছে। এই শান্ত দুপুরে নির্জ্জন গৃহে কমলার সহিত কথা বলিতে ভাল লাগিতেছে। হয়ত তারা অত্যন্ত বাজে কথা বলিতেছে। বাজে? অর্থহীন বুলি? তা হইবে। রমেন ইহা বরাবর লক্ষ্য করিয়াছে, কমলার সহিত

আলাপ করিবার জন্য কাজের কথা বা গভীর কথা প্রয়োজন হয় না। বস্তুত, বাজে কথা কত মধুর হইতে পারে, তা কমলার সহিত যে আলাপ করিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে। কমলার সহিত গল্প করিয়া খুসী হয় না, এমন লোক ত সে দেখিতে পায় না। সে জানে না, তার কথা কমলার ভাল লাগে কি না। হয়ত লাগে। নহিলে এই দুপুর রৌদ্রে তার পরিবারের নিকট গঞ্জনা সহিবার ভয় থাকা সত্ত্বেও সে তার কাছে আসিত না। সে ত জানিত না, বেলা শীলা বাড়ী নাই। তারা দৈবাৎ আজ অনুপস্থিত। সুতরাং তার সঙ্গলাভের জন্য কমলার এই আকর্ষণ রমেনকে খুসী করিবে না, এত বড় যোগী পুরুষ সে এখনও হয় নাই। অবশ্য সে এখন কমলার সহিত কথা বলিয়া যে সুখ অনুভব করিতেছে, তা পূর্ণভাবে উপভোগ করিতে পারিতেছে না। তার কেবলই আশঙ্কা হইতেছে, এই বুঝি বেলা ও শীলা তাদের উপর ঝড়ের মত আসিয়া পড়িল। সুতরাং কমলা যত সহজে তার সহিত কথা বলিতেছিল, সে তত সহজে তা পারিতেছিল না। আত্মবিস্মৃত হইয়া কমলা আলাপ করিতেছিল বটে, কিন্তু সত্যই কি কমলা শঙ্কাহীন চিত্তে আসিয়াছিল ? বেলা ও শীলার অপমানকে সে আজ গ্রাহ্য করিবে না। কিন্তু তার বাড়ীর লোকেরা যদি জানিতে পারে, সে আজ এই নির্জ্জন কক্ষে রমেনের সহিত আলাপ করিতেছে, তা হইলে তারা অনেক কিছু কল্পনা করিয়া লইবে এবং তাকে খাইয়া ফেলিবে। সময় নাই, হয়ত সময় নাই। সেজন্য কমলাকে সাবধানে অথচ নিশ্চিতভাবে তার লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইতে হইবে। আজ দেখিবে সে, তার দেবতা নিতান্ত পাষাণ দিয়া গড়া, না, তার দেহে রক্ত-মাংস আছে। পাষাণ-দেবতার দুয়ারে মাথা কুটিতে আর সে কোন দিন আসিবে না। অজানা ভয়ে, অকৃতকার্য্যতার আশঙ্কায়, তার চিত্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। এমন কি, এক একবার সে একথাও ভাবিতেছিল, প্রয়োজন নাই, সেই গভীর প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকিয়া যাউক, সে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইবে, কিন্তু তারপরেই মনে হইল, আজিকার মত

সুযোগ হয়ত সে এ জীবনে পাইবে না। এমন ভাবে একা রমেনকে পাইবে, সে ইহা কল্পনাও করিতে পারে নাই। তার জীবন-বিধাতা কি তাকে এইরূপে আনিয়া তার প্রতি কিছু ইঙ্গিত করিতেছেন না? কিন্তু হাজার হোক্, কমলা স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকের লজ্জাই ভূষণ। আজ সেই লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া মুখর হইতে হইবে, তার নিজ অনুরাগের কথা প্রকাশ করিতে হইবে, এ কি সহজ কাজ? আর সেই প্রগল্‌ভ আচরণ, সেই লজ্জাহীনতা, যদি রমেন ক্ষমা না করে, তা হইলে তার ত মরিবারও ঠাঁই থাকিবে না। রমেন নিজে তাকে নিজের অনুরাগ জানাইলে সব দিক্ দিয়া শোভন হইত। কেন রমেন জানায় না? আজিকার সুযোগে রমেন কি একবারও আত্মহারা হইতে পারে না? তার অটুট্ সংযমের বাঁধ একদিন মুহূর্ত্তের জন্য না হয় টুটিয়া গেল। কমলা জানে না, বুঝিতে পারে না, কি করিয়া সে রমেনের চিত্তের অর্গল খুলিয়া দিবে। সে শুধু তার ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে, রমেন যেন আজ ধরা দেয়, তাকে অপমান না করে। সে যেন ঠিক পথে তার লক্ষ্য অনুসরণ করে।

রমেনের কান বোধ হয় ঈষৎ লাল হইল। বলিল, 'হাঁ, মনে আছে।'

'আমি জান্‌তে চাই, আপনি কেন বলেছিলেন।'

'যদি বলি, বল্‌ব না?'

'তা হলে বুঝ্‌ব, আপনি মিথ্যাবাদী, কথা দিয়ে কথা রাখেন না।'

'যদি বলি, অম্‌নি দুষ্টুমি করেছি?'

'তা হলে বুঝ্‌ব, আমায় ফাঁকি দিচ্ছেন।'

'যদি বলি, যে গল্প বলেছি তা কাহিনী, আমি যা স্বপ্ন দেখেছি, তা নয়?'

'তা হলে বল্‌ব, আপনি আমায় ফাঁকি দিয়েছেন, মিথ্যা কথা বলেছেন।'

'হায়, আমার দশা শোচনীয়। আগে গেলেও বাঘে খায়, পিছনে গেলেও বাঘে খায়।'

কমলা হাসিতে লাগিল: 'বাঘ নয়, সিংহী।

'না, বাঘ।'

'না, সিংহী। আগে সিংহী নেই। পিছনে সিংহী তাড়া করেছিল। আপনিই বলেছেন।'

'হাঁ, বলেছি। কিন্তু বাঘও নয়, সিংহীও নয়—'

'কমলা ত নিশ্চয়।'

'কমলাও নয়।'

'বাঃ, কমলা নয়, হতে পারে না। ভাল করে মনে করে দেখুন।' কমলা ধমক দিল।

নিরুপায় ভাবে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে রমেন বলিল, 'তাইত, এই একটু আগে স্বপ্ন দেখ্‌লাম, আর এরই মধ্যে সব ভুল্‌তে আরম্ভ করেছি।'

'না, ভুল্‌লে চল্‌বে না। আপনার আবার সব মনে কর্‌তে হবে।'

'তোমার হুকুম?'

'আমার মিনতি। আমি কি আপনাকে হুকুম কর্‌তে পারি?'

'পার। তা—তা—পিছনে তাড়া করেছিল কমলা বটে, আবার কমলাও নয়। এবার সত্য বল্‌ছি।'

'সে কি রকম?'

'তা হলে আসল স্বপ্নটা তোমায় বল্‌তে হয়।—আমার কিন্তু দোষ ধর্‌তে পার্‌বে না। স্বপ্নটা আগাগোড়া শুন্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বে, কেন আমি বল্‌তে চাইনি। আমি এখনও শেষ বার সাবধান করে দিচ্ছি, ওটা শুন্‌বার লোভ ছাড়।'

'না, ছাড়্‌ব না।'

'যদি সেকাল হত, তা হলে বল্‌তাম, এই স্বপ্নের কথা তোমায় বল্‌তে নিষেধ আছে, বল্লে আমি পাথর হয়ে যাব। এ শুনেও কি তুমি স্বপ্ন শুন্‌বে?'

'এ ত আর সেকাল নয়। আর আপনি এ স্বপ্নে যাই দেখে থাকুন, বল্লে পাথর হবেন না নিশ্চয়। আর—আর—'

'আর কি ?'

'আর আমি ত আপনার স্ত্রী নই। সেকালে স্ত্রীরা জান্‌বার জন্য জেদ ধরত, আর স্বামীরা পাথর হয়ে যেত। আমি আপনার স্ত্রী ত নই।' কমলার সুন্দর গৌর মুখ টকটকে লাল হইয়া উঠিল। তথাপি সে কথাগুলি বলিল এবং হাসিয়া রমেনের চোখের দিকে তাকাইল।

উত্তরে রমেন কি বলিল ? না, তাড়াতাড়ি বলিল, 'আচ্ছা, স্বপ্নটা তোমায় বলি।' হায়, সে কি এইটুকু বলিতে পারিত না, 'আমার স্ত্রী হবার ইচ্ছা তোমার হয়, কমলা ?' কিছুই কঠিন কথা নয়। এবং যে-কমলা তার সম্মুখে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাকে প্রকৃত জবাব দিতে হইলে উহাই বলিতে হয়। বলিলে নিশ্চয় দোষ হইত না। কিন্তু রমেন এই ফাঁদ এড়াইয়া গেল। আপনার অজ্ঞাতে কমলার বুক হইতে গভীর দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইল।

কিন্তু রমেনের স্বপ্ন শুনিয়া কমলা চমৎকৃত হইল, দীর্ঘশ্বাসের কারণ আর রহিল না। তাকে দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, তার মুখে চোখে কে যেন কুঙ্কুম লেপিয়া দিয়াছে। স্বপ্নের কাহিনী বলিতে রমেনের যত না লজ্জা হইয়াছিল, কমলা তার চেয়ে ঢের বেশী লজ্জা পাইল। তবু ভাবিল কি, এই স্বপ্ন শুনিবার জন্য জেদ না করিলেও পারিত ? আশ্চর্য এই, স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বর্ণনার পর রমেনের মনটা খুসীতে ভরিয়া উঠিল। তার অন্তরে লজ্জার চেয়ে আনন্দ বেশী। অথচ এত আনন্দিত হইবার কোন কারণ ছিল না। এই কাহিনী কমলাকে বলিবার জন্য তার অন্তরে অন্তরে এত আগ্রহ ছিল, তা সে বুঝিতে পারে নাই। মানুষ সব সময় আপনার মন জানে না। এখন রমেনের মনে হইতে লাগিল, নদীতীরে যে অনাবৃত-দেহা তার গা ঘেঁষিয়া বসিয়াছিল, তার দিকে তাকাইতে না চাহিলেও তাকে সে বেশ ভাল করিয়া দেখিয়াছে এবং অনাবৃত-দেহা কমলার সহিত নিশ্চয় তার সাদৃশ্য থাকিবে। রমেন নিজেকে যতই সংযত করিয়া রাখুক, নারী-দেহের আবাহন তার পক্ষেও প্রবল, সে তা জানে। আজ এই মুহূর্তে তার

পক্ষে কমলার সহিত কোন বিসদৃশ আচরণ করা কিছুই অসম্ভব নয়। তারপর হয়ত সে চিরজীবন অনুতাপ করিবে। কিন্তু কোন একটা কাজ করিয়া অনুতাপ দ্বারা কি তা বিলীন করা যায়? যায় না। আর কমলা কি জানে না, এই ভাবে একা ঘরে রমেনের কাছে আসা বিপজ্জনক? যতই বালিকা ও সংসার-অনভিজ্ঞা হোক্, কমলার মন—নারীর মন। সেই মন দিয়া সে নিজের বিপদ্ বুঝিতে পারে না, রমেনের পক্ষে ইহা বিশ্বাস করা অসম্ভব। তারপর তার খেয়াল হইল, কমলা শুধু যে তাদের বাড়ীর দিকের জানালা বন্ধ করিয়া দিয়াছে, তা নয়, তার ঘরে প্রবেশ করিবার দরজাও অর্গলবদ্ধ। তার বেশ মনে আছে, সে যখন শোয়, তখন দ্বার বন্ধ করে নাই, ভেজাইয়া রাখিয়াছিল মাত্র। ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, ইহা সাবধানতা মাত্র। অন্য কেহ এ ঘরে হঠাৎ না আসিয়া পড়ে। কিন্তু এমন কি হইতে পারে না, কমলার এ সব আচরণের পশ্চাতে একটি গোপন অভিসন্ধি রহিয়াছে? এমন কি হইতে পারে না, কমলা আজিকার এই পরম সুযোগে, এই একান্ত নিভৃত কক্ষে, রমেনের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ ধরা দিতে চায়? সত্য হোক্, মিথ্যা হোক্, কমলা তার উপর অগাধ আস্থা রাখিয়াই ক্ষান্ত থাকে নাই, সে হয়ত চাহিয়াছে, রমেন আজ তার নিজের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবে, সুন্দরী কমলার এই দুর্জ্জয় আকর্ষণ উপেক্ষা করিতে পারিবে না। সত্য বটে, এ পর্য্যন্ত কমলার আচরণ অশোভন হয় নাই। তার ব্যবহারে নিন্দনীয় কিছু নাই। সেও কমলার সহিত সস্নেহ ব্যবহার করিয়াছে, কিন্তু কোন প্রকার অন্যায় সুযোগ গ্রহণের কল্পনা করে নাই। আজিকার মত রমেন আত্মবিস্মৃত হইতে পারিত। তা, সময় এখনও বহিয়া যায় নাই। ঐ ত কমলা, তার পাশেই বসিয়া আছে। কমলাকে সে কোন দিন পাইবে, এমন ত আশা করিতে পারে না। তার গৃহ কমলার পদধ্বনিতে রণিত হইয়া উঠিবে না। এই অবস্থার জন্য সে প্রস্তুত হইয়া আছে। সুতরাং আজ যদি সে একদিনের জন্যও কমলাকে অধিকার করিয়া লয়, তা হইলে কি

হয়? কমলা হয়ত আপত্তি করিবে, অথবা করিবে না। আজিকার অবিবেচনার ফলে হয়ত রাগ করিয়া চিরদিনের জন্য রমেনের সংসর্গ ত্যাগ করিবে। তা রমেনের পক্ষে অসীম দুঃখ ও বেদনাদায়ক হইবে। কিন্তু সেই দুঃখও আজিকার অপরিমেয় আনন্দের স্মৃতিকে ম্লান করিতে পারিবে না, মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না। রমেন ভবিষ্যতের কথা আর কত ভাবিয়া চলিবে? আজ যা পাওযা যায়, তা কেন লইবে না? নিজেকে কেন সর্ব্বদা সর্ব্ব প্রকাবে বঞ্চিত করিয়া রাখিবে? যদি সত্যই কমলা আজ ধরা দিতে আসিয়া থাকে, তা হইলে ত তিথি ও বায়ু অনুকূল। মানুষের জীবনে এমন এক এক মুহূর্ত্ত আসে, যখন তার নিকট যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়। সে প্রার্থীকে কোনরূপে বিমুখ করে না। কিন্তু সেই মুহূর্ত্ত অতীত হইয়া গেলে সে সম্বিৎ ফিবিয়া পায়, তখন তার নিকট হইতে কিছু আশা করা যায় না। কে বলিবে, কমলার সেই মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয় নাই, যখন সে অন্নপূর্ণা হইয়া বসিয়া আছে, আর তার নিকট রমেন যা চাহিবে তা পাইবে? শুধু চাহিবাব অপেক্ষা। রমেন কিছুই না চাহিয়া কি সময় বৃথা বহিয়া যাইতে দিবে? সেই সময় যা মানুষের জীবনে বহু বার আসে না! সেই আস্বাদ যা সহজে মেলে না! রমেনের মনে এক দিকে প্রলোভন উগ্র হইয়া উঠে। তার ইচ্ছা করে, সবল বাহুদ্বয়ে কমলাকে বন্দী করিয়া রাখে। মাত্র ঐ কথা দ্বারা তার মনের ভাবকে প্রকাশ করা যায়! কারণ, কত রকম সম্ভাবনা আছে, তা আবিষ্কার-সাপেক্ষ। রমণীর দেহ লইয়া যারা কারবার করে, তারা হয়ত চুডান্ত করিয়া জানে, কি করিতে হয বা হয় না। রমেন সেরূপ কারবারী নয়। সুতরাং একটি রমণীর প্রতি রন্ধ্রে তার জন্য অসহ্য বিস্ময় সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। কমলা ও তার অস্তিত্ব তার পক্ষে পরম আনন্দময় ও বিস্ময়কর ঘটনা। কিন্তু তার এই প্রবল মনোবেগ অন্য দিকে তার সুখস্বপ্নকে টুটাইয়া দেয়। তার ভদ্র ও শান্ত মন ছি ছি করিয়া উঠে। সে আত্মধিক্কারে পর্ণ হইয়া যায়। এই মহূর্ত্ত। কমলা

তার কাছে বসিয়া আছে। তার সঙ্গে গল্প করিতেছে। হয়ত কমলার ঐ বক্ষে তার জন্য ভালবাসা রহিয়াছে। রমেনের বুকে আকণ্ঠ ভালবাসার তৃষা। তার ভালবাসার পাত্রী কমলা সম্মুখে। সম্মুখে কোন বাধা নাই। সে ও কমলা। পরস্পরের সঙ্গ পূর্ণভাবে উপভোগ করিতেছে। এমন রমণীয়, কল্পনা-মনোহর মুহূর্ত্ত। কি আনন্দ! কি বিস্ময়! চারি দিকের সহস্র সংগ্রাম সে ভুলিয়া গিয়াছে। তথাপি এই মুহূর্ত্ত বহিয়া যাইবে। এইরূপ আরও অনেক মুহূর্ত্ত। এই মরা মুহূর্ত্তগুলির জন্য সে অশেষ শোক করিবে, তা সে জানে। কিন্তু কমলাকে এই মুহূর্ত্তে না পাইয়া তার চিত্ত যতই হাহাকার করিয়া উঠুক্, তার প্রধান বাধা সে নিজে,—তার শিক্ষিত অন্তঃকরণ। তার মনের ভীষণ দ্বন্দ্বে সে দোল খাইতেছে। মধুর প্রলোভন! জয়ী হইবে কি?

রমেন তার স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলিতেছিল। তার কাহিনী যেন দুই জনকেই অন্য এক লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে। তাবা কি বডই কাছাকাছি আসিযা পডিয়াছে? রমেন ধীরে ধীরে কমলার ফুলের মত নরম হাত নিজ ডান মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিল। অন্যমনস্ক ভাবে নহে। কমলা বাধা দিল না। হাত সরাইয়া লইল না। অথচ তখনও দুজনের লজ্জার ঘোর কাটে নাই। কিছুক্ষণ পরে রমেন বলিল, 'দেখ, স্বপ্নের উপর মানুষের কোন হাত নাই। আশা করি, তুমি রাগ কর্‌বে না।'

'রাগ!' কমলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। 'আমি ত বলি, কি সুন্দব স্বপ্ন। আমি স্বপ্ন দেখি। প্রায়ই। কিন্তু এত সুন্দর স্বপ্ন দেখা আমাব ভাগ্যে হয় না।'

'স্বপ্নটা খুব সুন্দর হত নিশ্চয়, যদি—'

'যদি কি?'

'একটু অসম্ভব ও বিশ্রী দৃশ্য ওর মধ্যে না থাক্‌ত।'

কমলা হাসিল: 'বুঝেছি। কিন্তু আপনি যে রাজ্যে গিয়েছিলেন, সে রাজ্যে বিনা আবরণে আমাদের মানিয়েছিল। আমাদের বল্‌ছি বলে রাগ করে

বস্‌বেন না ত? আপনিই বলেছেন, স্বপ্নের সেই মেয়েটিই আমি। অবশ্য, দৌড়ে আমি আপনার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারব কি না, জানি না। কিন্তু আমি শুধু ভাব্‌ছি, আপনার স্বপ্নের মধ্যে আমি কি করে বল্লাম যে, আপনি ছাড়া এখন আমার আর কেউ নাই, আর আপনি আমায় ছেড়ে গেলে ঐ নদীব জলে ডুবে মরব।'

'ভুল হচ্ছে কিন্তু তোমার।'

'মোটেই না। আপনার কাছে এবার যেমন শুনেছি তাই বলেছি। তবে এবারও যদি আপনি ফাঁকি দিযে থাকেন, তা হলে আলাদা কথা। তার আমি আর কি করতে পারি?'

'না ফাঁকি দিনি। কিন্তু যা বলেছি তা বল্‌তে পাবনি।'

'যেমন?'

'আমার স্বপ্নের কমলাব কথাগুলি ঠিক বলেছ। কিন্তু সেই কমলা কি আমাকে আপ্‌নি করে বলেছে?'

'না, সে তুমি করে বলেছে।'

'তা হলে?'

'আপনি কি চান? আপনি কি চান, আমিও আপনাকে তুমি বলি?'

'সে কথা কি তুমি আজও বোঝনি? আমি ত কতবার তোমায় বলেছি।'

'বলেছেন। কিন্তু কেন?' এক ঝট্‌কায় রমেনের শক্ত মুঠি হইতে হাত ছাড়াইয়া লইযা কমলা শক্ত হইযা বসিল। তার উন্নত গ্রীবা বাঁকাইয়া নাসিকা স্ফুরিত করিয়া কমলা তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করিল, 'কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কেন?'

এই সামান্য কথায কমলা বিচলিত হইবে, রমেন মনে করিতে পারে নাই। কমলা তাকে মধ্যম পুরুষের মিষ্ট সম্বোধনটি করিবে, এ তার অনেক দিনের সাধ। সাধ মাত্র। এইরূপ অনুরোধ পূর্ব্বে সে কয়েক বার করিয়াছে। কিন্তু কমলা কোনদিন কোন প্রকার উষ্মা প্রকাশ করে নাই। আজ এই উষ্মা কেন? কমলার সহিত তার একটুখানি হৃদ্যতা হইয়াছে, ইহা কমলা নিশ্চয় স্বীকার

করিবে। সেই হৃদ্যতার দাবীতে সে এমন কিছু বলে নাই যা কমলার পক্ষে অপমানকর। সে ইচ্ছা করিলে এ অনুরোধ নাও রাখিতে পারে। কিন্তু ইহাতে রাগ করিবার কিছু নাই।

কমলা দাঁতে দাঁত ঘসিয়া বলিল, 'আপনাকে আমি তুমি করে বল্‌তে যাব কেন? ওঃ, আপনি ভেবেছেন আপনার চেয়ে আত্মীয় আমার কেউ নাই, না? আপনি ভেবেছেন, আপনার ইঙ্গিত আমি বুঝি না। কথায় বার্ত্তায় স্বপ্নচ্ছলে আপনার সেই এক কথাই বার বার শুন্‌ছি। কমলাকে অত বোকা ভাব্‌বেন না। আপনার উদ্দেশ্য আমি জানি। ভীরু, কাপুরুষ কোথাকার! আপনাকে আমি একদিন সাবধান করে দিনি যে, আমাকে কোন দিন লোভ কর্‌বেন না? মনেও স্থান দেবেন না যে, আমায় বিয়ে করতে পার্‌বেন।'

এই বলিয়া হঠাৎ উঠিয়া বেগে দরজার নিকট গেল এবং খিল খুলিয়া দৌড়িয়া নিজের ঘরে গিয়া তবে থামিল। রমেন একেবারে হতভম্ব। সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই, আজিকার মিলনের এইরূপ পরিণতি হইবে। সে ভীরু! সে কাপুরুষ! অন্যে যা খুসী বলুক্। কিন্তু কমলাও এই কথা বলিবে? এই পৃথিবীতে তা হইলে তার একটিও সান্ত্বনার জায়গা থাকে না। কমলার নিকট এরূপ ব্যবহার সে আশা করে নাই। সে ত তাকে ডাকিয়া আনে নাই। কমলা নিজে আসিয়াছে। কই, তাকে বিবাহ করিবার জন্য সে সচেষ্ট হইবে, এমন কোন ভাব তার কথায় প্রকাশ পাইয়াছে কি? বিবিধ সংগ্রামে তার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হইয়া আছে। কিন্তু কমলার মত মধুরস্বভাবা নারী যে তাকে এতখানি অপমান করিল, ইহা তার হৃদয়ে গভীর করিয়া বাজিল। এই ব্যথা সে কিছুতেই মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিল না। তার মনে হয়ত কমলার জন্য প্রলোভন হেতু দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল। পরে সে কি করিত, তা নিজেই নিশ্চয় করিয়া জানে না। কিন্তু কমলার চলিয়া যাইবার আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে বাক্যে বা আচরণে কোন প্রকার বেয়াদপি করে নাই। এরূপ অপমান করিয়া হঠাৎ চলিয়া যাইবার কোন কারণ উপস্থিত

হয় নাই। তবু কমলা তাকে চাবুক মারিয়া গেল। কেন গেল, সেই জানে। অথবা সেও হয়ত জানে না। লোকে কথায় বলে, নারী-চরিত্র দুর্জ্ঞেয়। এখন কমলাতে নারীত্বের সকল লক্ষণ প্রকট হইয়া উঠিতেছে। তার বহু আচরণ ক্রমে ক্রমে নারীজনোচিত অর্থাৎ দুর্জ্ঞেয় হইবে। তা হোক্। কিন্তু তাই বলিয়া রমেনের নামে মিথ্যা অপবাদ দিবার তার কোন অধিকার নাই। তার প্রতি লোভ হযত রমেনের হইয়াছে, নিজের কাছে রমেন স্বীকার করিবে, লোভ হইয়াছে, এমন কি সে মনে করিয়াছে, কমলা তাকে প্রশ্রয় দিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে সকল বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। রমেন হয়ত কমলাকে চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করিয়া দিত। তার সংযম শেষ পর্য্যন্ত বাধাস্বরূপ হইত না, চিত্তাবেগ জয়লাভ করিত, এরূপ সন্দেহ তার মনে আছে। মনে মনে সে দোষী। কিন্তু মনের কথা মনেই ছিল, তার আভাসমাত্র প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই কমলা রূঢ়ভাবে তাকে আঘাত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। একবার তার মনে হইয়াছিল, বোধ হয় ইহা কমলার ভাণ, কমলা দুষ্টামি করিতেছে, পরক্ষণে আসিয়া উচ্ছ্বসিত হাস্যে তাকে অভিভূত করিয়া ফেলিবে। এমন কি, হতভম্ব ভাবে রমেন কতক্ষণ তার ফিরিয়া আসার জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু কমলা ফিরিল না। তখন তার মনে সন্দেহ রহিল না যে, উহা ঠাট্টা নহে। তা ছাড়া কমলার তখনকার সেই স্ফুরিত-অধর স্ফুরিত-নাসা উন্নত-গ্রীব রূপ ভুল বুঝিবার অবকাশ দেয় না, সে ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গিয়াছে। কেন এই ক্রোধ? আশ্চর্য্য এই, এতখানি সাহস ও সংযম দেখাইয়াও সে ভীরু ও কাপুরুষ উপাধি লাভ করিল।

হাঁ, এই শনিবার। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দুপুর গড়াইয়া বিকালে পরিণত হইয়াছে, আর রমেন তার নিজ ঘরে বসিয়া কমলার অদ্ভুত আচরণের কথা ভাবিতেছে। কিন্তু কমলার উপর রাগ হইলেও শেষ পর্য্যন্ত তাকে প্রতিকূল বিচার দ্বারা মনে মনে লাঞ্ছিত করিতে পারিল না। কমলার রাগের একটা কারণ নিশ্চয় আছে। সে তা জানে না, এই মাত্র। কমলা যে তাকে বুঝাইবার

কোন সুযোগ না দিয়া চলিয়া আসিয়াছে, ইহাই দুঃখের বিষয়। আজ দিনটা আরম্ভ হইয়াছিল ভাল ভাবে। ভাল ভাবে পরিণতিও হইতেছিল। হঠাৎ মাঝপথে থামিয়া গেল। এখন সমস্ত দিনটাই তার কাছে বিস্বাদ· লাগিতেছে। কমলা যদি আদৌ না আসিত, তা হইলে আজিকার দিন আর এত সম্ভাবনাময়, এত উজ্জ্বল-সুন্দর থাকিত না সত্য, কিন্তু উহার বেদনাও বুকে এত বাজিত না। কমলা যেন ইচ্ছাপূর্ব্বক রমেনকে আঘাত করিয়াছে। সে তার তূণ হইতে এমন তীর নিক্ষেপ করিয়াছে, যা অব্যর্থ সন্ধানে রমেনের বুকে গিয়া বিঁধিয়াছে। ছোট কটি কথা! কিন্তু কি তাদের তেজ! কমলা অব্যর্থ-সন্ধানী।

আর এই শনিবার বিকাল বেলায কমলা কি করিতেছিল? নিজের ঘবে দরজা বন্ধ করিয়া অজস্র ধারায কাঁদিতেছিল। তার কান্না আর কিছুতেই বারণ মানে না। আজিকার সুন্দর দিনটির সকল বৃহৎ সম্ভাবনা সে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া আসিয়াছে। এমন দিন জীবনে আর আসিবে কি না সে জানে না। বৃথা মুহূর্ত্তগুলি। অথচ প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত কত উজ্জ্বল ও মধুব স্বপ্ন দ্বাবা ভরিয়া লইয়া আসা যাইত! এমন একটি দুপুরকে হত্যা করাব চেয়ে বড অপবাধ আর কি হইতে পারে? এই দুপুবকে কে হত্যা করিল? কমলা আজ ধৈর্য্য হারাইয়া কেন এমন কাজ করিতে গেল? কমলার ধৈর্য্যেরও ত একটা সীমা আছে। রমেন এমন দুর্ভেদ্য বর্ম্ম আঁটিয়া বসিযা আছে যে, তার মর্ম্ম স্পর্শ করার চেষ্টা বৃথা। এমন দুর্লভ সুযোগ পাইয়াও রমেন কি একদিনের জন্য নিজেকে ভুলিতে পারিল না? স্রোতের মুখে ভাসিয়া যাইবার সুযোগ কয়জন পায়? সেই সুযোগ মূর্খ ও মূঢ রমেন হেলায় হারাইল। কমলা আর কি করিতে পারে? শেষ পর্য্যন্তও রমেনেব হাতে অস্ত্র ছিল। কমলা যখন পলাইয়া আসিতেছিল, তখন সে ত ছুটিয়া গিয়া তাকে জডাইয়া ধরিয়া লইয়া আসিতে পারিত। যে কোন রকম ইঙ্গিত বুঝিতে চেষ্টা করিবে না, স্পষ্ট না হইলে কোন ভাবের নিকট ধরা দিবে না, তার হৃদয় পাথরে গড়া

নয়, তা কে বলিবে? কমলা অনেক কিছু আশা করিয়াছিল, কিন্তু তার কোন আশা পূর্ণ হয় নাই। অনেক আশা করিয়াছিল সে, কিন্তু ভাল করিয়া বলিতে পারে কি, সে কি চাহিয়াছিল, কিসে তার অন্তরের জ্বালা নির্ব্বাপিত হইত? বোধ হয়, পারে না। অনিশ্চিত আনন্দের আকাঙ্ক্ষা মাত্র তার হৃদয়ে জাগিয়াছিল। রমেন তাকে নিরাশ করিবে না। আজ একটা বোঝা-পড়া হইয়া যাইবে। কোন্ পথে হইবে, তা সে নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও হইবে। কিন্তু তার কোন আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না। এই সুন্দর শনিবার ব্যর্থ হইয়া গেল।

কমলা রমেনকে আঘাত করিয়াছে। ইচ্ছাপূর্ব্বক করিয়াছে। যে লোকের সহজে ঘুম ভাঙ্গে না, চেতনা হয় না, তাকে আঘাত করা ছাড়া উপায় কি? এই আঘাতে রমেনের বুকে যত বাজিয়াছে, নিশ্চয় বাজিয়াছে, এখন আঘাতের বেদনা তার নিজের বুকে তার অনেকগুণ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে। সমস্ত ঘটনা মনে করিয়া সে বার বার নিজেকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, সে রমেনকে এমন আঘাত কি করিয়া করিতে পারিল? যার পায়ে কাঁটা বিঁধিলে তার বুকে বাজে, তাকে ইচ্ছা করিয়া কটু কথা কেন বলিল? কমলা নিজেও ভাল করিয়া জানে না, কেন সে এরূপ করিয়াছে। যদিও সে চৈতন্য হারায় নাই, তথাপি তার মুখ যেন তার কোন শাসন না মানিয়াই কতকগুলি ভীষণ কথা উচ্চারণ করিয়াছে। আজিকার এই শনিবার! ইহাকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য কমলা রমেনকে নিজ হাতে শাস্তি দিয়া আসিয়াছে। তবে আর তার এই কান্না কেন? শোক কিসের? কমলা তা বুঝাইয়া বলিতে পারিবে না। কমলার কান্না আজ আর কিছুতেই বাধা মানিতে চায় না। পুঞ্জীভূত অশ্রুর আকারে তার অভিমান গলিয়া বাহির হইতেছে।

সন্ধ্যা বেলা, জলঝড়ের অবসান হইয়াছে। কমলাকে অত্যন্ত বিষণ্ন দেখাইতেছিল। আপাদমস্তক সুবেশে সজ্জিতা কমলা উদ্বিগ্ন মুখে রমেনের ঘরের দিকে তাকাইতেছিল। রমেন ঘরে ছিল না। রণেনকে হাতছানি

দিয়া ডাকিল। রণেন নিতান্ত বাধ্য ভৃত্য। আসিলে কমলা বলিল, 'আমার জন্য কষ্ট করে একটা কাজ কর্‌তে হবে, ভাই!'

রণেন উৎসাহের সহিত বলিল, 'কি কাজ? হুকুম কর।'

'কই, বৌদি ত বল্লে না।'

'তা সত্যিকারের বৌদি না হলে ডেকে আর কি সুখ, বল।'

'তা ঠিক। তোমার সত্যিকারের বৌদি হবার সম্ভাবনা আমার ছিল। কিন্তু তুমি সব মাটি করেছ।'

'আমি?'

'তুমিই ত। সেদিন তোমায় দূতীয়ালির জন্য লাগালাম। আর তুমি কিছুই কর্‌লে না। তুমি কিছু কর্‌বে না জান্‌লে, তোমার কাছে কে অত মনের কথা বল্‌তে যেত? আমি অন্য একজন পাকা লোক লাগালে বেশী ফল হত।'

'আমি কাঁচা লোক না কি?'

'নিশ্চয়। বয়স ত মোটে কুড়ি বছ্‌র। এখনও নাবালক। ছেলেমানুষ বৈ কি।'

'আর মহাশয়া কি আমার চেয়ে বয়সে ছোট হয়ে বুড় মানুষ না কি?'

'চুপ্‌। আঠার পেরিয়ে গেছি। আমি সাবালিকা। সাবালিকা হিসাবে সমস্ত নাবালকদের উপরে কর্ত্তৃত্ব কর্‌বার পরোয়ানা পেয়েছি।'

'ভাল। কিন্তু পরোয়ানা কে দিল?'

'তোমার দাদা।'

রণেন হাসিয়া অস্থির: 'দাদা মস্ত পরোয়ানা দেনেওয়ালা লোক বটে—'

কমলাও হাসিল: 'তোমরা তাঁকে মান না বটে, কিন্তু আমি মানি।'

'বাইরে দূরে মানা না মানায় কি আসে যায়? আমাদের এই ঘরে দাদার বউ হয়ে এসে মান, তবেই বুঝি।'

'তোমার দাদার বউ হওয়া হয়ত, ভাই, এ জন্মে আর ঘট্‌ল না। আর তা তোমার জন্য।'

রণেন অপরাধ কবুল করিল। বলিল, 'আজকাল দাদার মন-মেজাজ ভাল নয়। কাজেই আমি দাদার সঙ্গে কোন রকম কথা বল্‌বার সুযোগ পাই নি। কিন্তু আমি ভুলিনি, জেন। আর তুমি ঠাট্টাই কর, আর যাই কর, আমি আর একবার ঘট্‌কালি করব, কপালে যাই জুটুক্।'

কমলা অন্যমনস্ক হইয়া গেল। 'কোরো। তোমাব জন্য রাঙ্গা বউ এনে দেব। এখন আর একটা দূতীয়ালি কর দেখি।'

'শুধু হুকুমেব অপেক্ষা। হুকুম দাও, বান্দা ছুট্‌বে।'

'তুমি নরেশ বাবুর বাড়ী চেন?'

'চিনি।'

'তা হলে আমার এই চিঠিখানা তাঁর হাতে পৌছে দাও। পার্‌বে?'

রণেনের মুখে কালো ছায়া পড়িল। প্রস্তাবটা তার ভাল লাগিল না। কমলা নরেশকে কেন চিঠি লিখিতেছে? কি লিখিয়াছে? জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার তার নাই। মুখ গম্ভীব হইয়া গেল। আর যে নরেশকে সে দুচোখে দেখিতে পারে না, তার কাছে তাকে পাঠাইবার অদ্ভুত খেয়াল কমলার কেন? জিজ্ঞাসা করিল, 'চিঠি খুব জরুরী? অন্য কাউকে দিয়ে পাঠালে হয় না?'

'জরুরী। খুব জরুরী। এখনই তাঁর হাতে পৌছান দরকার। ডাকে পাঠাতে পারি। কিন্তু দেরী হয়ে যাবে। দেরী আমার সইছে না। তুমি ছাড়া বিশ্বাসী লোক কোথায় পাই যার হাতে আমি নিশ্চিন্ত মনে এটা পাঠাতে পারি? লক্ষ্মীটি, দিয়ে এস। জবাব আন্‌তে হবে না। শুধু চিঠিটা হাতে দিয়ে চলে এস।'

রণেন হাত বাডাইয়া বলিল, 'আচ্ছা, দাও।' বলিয়া চিঠি পকেটে পূরিয়া অদৃশ্য হইল। চিঠিতে এইমাত্র লেখা ছিল: কমলা নরেশকে কিছুতেই বিবাহ করিতে পারিবে না, কিছুতেই না। এজন্য সে যেন তাকে ক্ষমা করে।

পত্রের বিষয়-বস্তু ত আর রণেন জানে না। যাইতে যাইতে তার কেবলই মনে হইতে লাগিল, নরেশের ধন ও ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধা কমলা কি তবে রমেনকে লইয়া এতদিন খেলা করিতেছে? কমলার সম্বন্ধে সে যা ভাবে তা কি সত্য নয়?

নরেশদের বাড়ী পৌঁছিয়া চাকর-দরোয়ানদের কাছে রণেন শুনিল, বাবু বাড়ী নাই, নারায়ণগঞ্জের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। নরেশের বাহিরে যাওয়ার কথা রণেন এই প্রথম শুনিল। সে আশ্চর্য্য হইল, কিন্তু মনে মনে এক অদ্ভুত স্বস্তি বোধ করিল। তারপর চিঠি ফিরাইয়া আনিয়া কমলার হাতে দিল।

'কি হল ?'

'বাড়ী নেই।'

'তার মানে ?'

'তার মানে, বাইরে গেছেন। চিঠি তাঁর হাতে দেবার হুকুম ছিল, অন্য কাউকে না। তাই ফিরিয়ে এনেছি।'

'বেশ করেছ।' তারপর যেন আপন মনে বলিল, 'কিন্তু নরেশ বাবু বাড়ী থাক্‌বেন না, আমি কি করে জান্‌ব ? আমাকে আগে কিছু বলেন নি ত।'

কমলার চিন্তিত মুখ দেখিয়া রণেন আরও অপ্রসন্ন হইল। তা হইলে কমলার সহিত নরেশের হৃদ্যতা এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, নরেশের কার্য্য-তালিকা কমলা পূর্ব্বাহ্নেই জানিতে পারে। কমলার কথাগুলি রণেনের নিকট তিক্ত বোধ হইল। সে অন্য দিনের মত কমলার সহিত গল্প করিবার কিছু-মাত্র আগ্রহ না দেখাইয়া চলিয়া গেল।

কমলা হাসিল মাত্র। যেন মেঘ কাটিয়া সূর্য্যোদয় হইল। পর মুহূর্ত্তে সে মুষ্টিবদ্ধ চিঠিখানা ছিঁড়িয়া শত টুক্‌রা করিয়া ছড়াইয়া দিল।

৯

নরেশ জন্মাবধি বিপুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছিল। সে শৈশবে পিতৃহীন হইলেও তার সম্পত্তি লইয়া বিপদে পড়ে নাই। তার প্রথম কারণ, তার পিতা যে সকল কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাদের অধিকাংশ বিশ্বাসী। মনিবের অনিষ্ট করিয়া কেহ নিজ সমৃদ্ধি-বৃদ্ধির কথা ভাবে না। সচরাচর এইরূপ ভাগ্য সকলের হয় না। দ্বিতীয় কারণ, অল্প বয়স হইতে

জমিদারি বুঝিবার অসাধারণ ক্ষমতা নরেশের জন্মিয়াছিল। ছেলে বেলা হইতে পিতা তাকে এমন অনেক বিষয় বুঝাইতে প্রয়াস পাইতেন, যা সাবালকদেরও বুঝিতে কষ্ট হয়। এখন সে তার বিষয়-সম্পত্তির কথা নিজে এত ভাল বুঝে যে, তার হুকুম প্রায়ই বদ্‌লাইতে হয় না। বস্তুত, কর্ম্মচারীদের সেই চালায়, কর্ম্মচারীরা তাকে চালাইতে পারে না। ফলে, প্রত্যেক কর্ম্মচারীর সকল রকম কাজের কৈফিয়ৎ সে নেয়। প্রয়োজন হইলে কোন সমস্যার মীমাংসার জন্য ঘটনাস্থলে সে নিজে গিয়া উপস্থিত হয়। তার একবারও মনে হয় না যে, প্রজাদের কাছে দর্শন দিলে তার সম্মান বা প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হইবে। পরন্তু প্রজারাও তাকে দেখিয়া খুসী হয়। তার জমিদারির সর্ব্বত্র কঠোর শৃঙ্খলা বর্ত্তমান। তার নগদ অর্থও যথাবিধি খাটিতেছে। সকল দিকে চোখ রাখায় ও নিজে তদারক করায় একটা ফল এই হইয়াছে যে, উত্তরাধিকার সূত্রে নরেশ যা পাইয়াছিল, তা বহুগুণ বাড়িতেছে। একবারে আর কিছু বাড়িয়া যাইতেছে না। ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে। সুতরাং একথা বলা চলে না, নরেশ নিজে কিছুই উপার্জ্জন করে না, পবগাছার মত বসিয়া বসিয়া শুধু পিতৃ পিতামহের অর্জ্জিত বিত্ত ভোগ করে। অবশ্য আজিকার দিনের কঠোর জীবন-সংগ্রামের কথা নরেশের নিকট অবিদিত নয়। তার অপেক্ষা বহুগুণে যোগ্য ব্যক্তিও যে সুযোগ ও সুবিধার অভাবে তাদের অন্তর্নিহিত গুণ প্রকটিত করিতে পারিতেছে না, ইহা সে জানে। সুযোগ ও সুবিধার অভাবে, দারিদ্র্যের কঠোর পীড়নে, কত লোকের জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, ইহা নরেশ বুঝিতে পারে। এই সব যোগ্য লোকদের জন্য তার নিভৃত অন্তরে হয়ত একটুখানি মমতাও সঞ্চিত হইয়া আছে। কিন্তু সে ইহাদের জন্য কি করিতে পারে? তার সমুদয় অর্থ নিঃশেষ করিয়া দিলেও সে কয়জনকে নিজের পায়ে দাঁড় করাইয়া দিতে সমর্থ হইবে? আর সে নিজের অর্থ নিঃশেষ করিতে চায় না। কোন মহত্তম কাজের জন্যও নহে। তার অর্থ ও সম্পত্তি তারই ভোগের জন্য। আগে সে ভোগ করিবে, তারপর অন্য কথা। আগে সে উহা ক্রমাগত

াড়াইবে, তারপর অন্য কথা। সে যদি দরিদ্র হইয়া জন্মিত, তা হইলে াজ সামান্য জীবিকা সংগ্রহের জন্য তাকে কত না ছুটাছুটি করিতে হইত! স প্রাপ্ত অর্থ ও সম্পত্তি যতই বৃদ্ধি করুক্ না, দারিদ্র্যের অগ্নিজ্বালে থাকিয়া সে হয়ত সামান্য সঞ্চয়ের কথাও ভাবিতে পারিত না। ভগবান্‌কে ধন্যবাদ, সে ধনী হইয়া জন্মিয়াছে, দারিদ্র্যের ক্লেশ কোন দিন জানিতে পারে নাই। ধনী হইয়া জন্মান ত সৌভাগ্য নিশ্চয়ই, পুণ্যের ফল৫ বটে। পূর্ব্ব জন্মের পুণ্যের ফল। নরেশ পূর্ব্ব জন্মে নিশ্চয় পুণ্য করিয়াছিল, তাই তার পক্ষে ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ সম্ভবপর হইয়াছে।

ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ এবং উত্তরোত্তর ধনের ও ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধিকরণ সে মোটেই অপরাধ বলিয়া মনে করে না। সংসারের বিচারে ধনের স্থান সকলের উপরে। ইহা ভাল কি মন্দ, ন্যায় কি অন্যায়, তা বিচার করিয়া তার লাভ কি? ঈশ্বর তাকে ধন দিয়াছেন, হাঁ ঈশ্বরই ত দিয়াছেন, তার জন্য সমাজে যদি তার বিশেষ স্থান হয়, তা হইলে সে তা রক্ষা করিতে এবং আরও উন্নত করিতে কেন চেষ্টা করিবে না? ধনী বলিয়া সে কোন দিন লজ্জাও অনুভব করে না। ধনমদমত্ততা তার আছে কি না সে জানে না। দশজনের সহিত ব্যবহারে সে যথাসাধ্য সদালাপী ও বিনয়ী। তথাপি যদি অনেকে তার সহিত দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলে অথবা তাকে অহংকারী বলিয়া মনে করে, তা হইলে সে দোষ নিশ্চয় তার নয়। বস্তুত, সে শুধু ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করে নাই, ধনীর মন লইয়াও জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সে কৃপণ নহে। নারায়ণগঞ্জের মত সহরেও সে যে বাটীতে বাস করে তা প্রাসাদ বলিলেও চলে। কিবা কারুসজ্জায় কিবা লোকজনে, কোথাও তার কার্পণ্য নাই। নিজের জন্য সে প্রচুর খরচ করে। প্রত্যেক জিনিষ সে চূড়ান্ত করিয়া উপভোগ করে। কিন্তু তাই বলিয়া সে বেহিসাবী নয়। তার দ্বারা এমন খরচ হইবার সম্ভাবনা নাই যা অপূরণীয়। সে খেয়াল রাখে, যা খরচ করিতেছে তা যেন আবার উপার্জ্জন করিয়া আনিতে পারে।

হাঁ, নরেশের ধনের নেশা আছে। সে ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা ভালবাসে। তার আত্ম-চেতনা অত্যন্ত প্রবল। সম্প্রতি সে কমলাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। হয়ত খুব ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। এমন কি, তাকে বিবাহ করিতে পর্য্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছে। কিন্তু কমলাকে ভালবাসিয়াছে বলিয়া যে, সে নিজ কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়াছে তা নয়। তার ভালবাসা অন্য সব কাজের সহিত তাল রাখিয়া চলে। এমন নহে যে, তাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। অসম্ভব। সে যত তীব্রভাবে ভালবাসুক্, কমলাকে তার জীবনের পক্ষে যত প্রয়োজন মনে হউক্, সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিবে না, তার সমগ্র জীবনের যাত্রাপথে কমলা একটি বিন্দুমাত্র, সহস্র বিন্দুর একটি বিন্দু। তার নিরলস কর্ম্মময় জীবন সে বিন্দু বিন্দু করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। জীবনের উপভোগ্য সকল জিনিষই সে ভোগ করিয়াছে। কমলাকেও ভোগ করিতে চায়। হয়ত কমলার প্রতি ঝোঁকের মাত্রাটা একটু বেশী হইয়াছে, নহিলে বিবাহ করিতে চাহিত না। কিন্তু তাই বলিয়া কমলাও তাকে তার কর্ত্তব্যের পথ হইতে এক চুল ভ্রষ্ট করিতে পারিবে না। তার জীবন-সংগ্রাম যতই সহজ হোক্, তার অবসর যতই অপরিমিত থাকুক্, কমলার জন্য তার লক্ষ্য বা আদর্শ ছোট হইবার নহে। এক মানুষের সংস্পর্শ অন্য মানুষকে কিছু না কিছু রূপান্তরিত করেই। সুতরাং কমলার সংস্পর্শ নরেশের চিত্তে কোন ঢেউ তোলে নাই, একথা নরেশ বলিবে না। নরেশ সানন্দে স্বীকার করিবে, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সে এত কাল যে সব ধারণা পোষণ করিয়া আসিয়াছে, তার কোন কোনটার ভিত্তি শিথিল হইয়া গিয়াছে। কমলার মত অষ্টাদশবর্ষীয়া বালিকার পক্ষে ইহা কম শ্লাঘার কথা নহে। কমলাকে সে ভালবাসিয়াছে, ইহাও সে অস্বীকার করিবে না। কমলাকে স্ত্রীরূপে পাইয়া সে নানা সুখের অধিকারী হইবে বলিয়া কল্পনা করিয়াছে। এ সব তার ধনবত্তার সহিত থাপ খায়। তার লক্ষ টাকা আয় শুনিয়া কমলা এক দিন মন্তব্য করিয়াছিল, এক জন লোকের এত টাকার অধিকারী হওয়া অন্যায়,

এবং নিজের প্রয়োজন মত বহু অর্থ রাখিয়াও বহু অর্থ বিলাইয়া দেওয়া যায়,— দেওয়া উচিত। সে কথা মনে পড়িলে নরেশ কৌতুক অনুভব করে। আচ্ছা, কমলা যখন তার গৃহের গৃহিণী পদে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন দেখা যাইবে, সে কি করে। তার শৃঙ্খলাপরায়ণ জীবনের কোনখানে যে কমলা খেয়াল মত কিছু করিতে পারিবে না, তা সে নিশ্চিত জানে। তা ছাড়া কমলা যখন নিজে অতুল ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতার অধিকারিণী হইবে, তখন কি আর তার মনে থাকিবে, সে কোন্ দিন নরেশকে কি বলিয়াছিল? সম্পত্তি বিলাইয়া দাও! নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য তখন কমলার আরও অর্থ, অলঙ্কার ও সাজসজ্জার প্রয়োজন না হইলেই বাঁচি। ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতার প্রলোভন কে জয় করিতে পারে? কমলা ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতার স্বাদ বুঝিতে পারিলে এক নবতর লোকে জন্মগ্রহণ করিবে। যেদিন সে নরেশের বর্ত্তমান জীবনকে বুঝিবে সেদিন ইহাকে ভালবাসিবে। বস্তুত, নরেশ কমলার পক্ষে অন্য কোনরূপ পরিণতি কল্পনা করিতে পারে না। আজ তার কমলাকে খুব প্রয়োজন। কিন্তু তারপর একদিন কমলা তার অন্য সমস্ত প্রয়োজনের সহিত এক পর্য্যায়ে বসিবে। সে নিজে যা করুক্, কমলা নিজ মহিমায় দীপ্তি পাইবে। নরেশও কমলার পক্ষে সমুদয় প্রয়োজনের একটিমাত্র হইবে। ইহাই ত স্বাভাবিক পরিণতি। ইহার জন্য কেহই দুঃখ করে না। এই সংসার-পথে আজ যা না পাইলে জীবন ব্যর্থ বলিয়া মনে হয়, কাল হয়ত তা না হইলেও চলে এবং বেশ ভালভাবেই চলে। সেই অনাগত কালের কথা চিন্তা করিয়া নরেশ একটুও বিচলিত হয় না। কারণ, এক দিন তার চুলে পাক ধরিবে, তার চর্ম্ম লোল হইয়া যাইবে। সান্ত্বনা এই যে, কমলা, আজিকার সুন্দরী কমলা, সেদিন বৃদ্ধা হইবে। বিপুল পৃথিবীতে অনন্ত সময়ে তা আর কত বড ঘটনা? সেই ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া নরেশের মনে ভয় হয় না। যা হইবার তা হইবে। তা লইয়া আজ মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান-নিষ্ঠ নরেশ বর্ত্তমানকে গড়িয়া তুলিতে চায়। তার

বুদ্ধি ও শক্তি জড় করিয়া, সে তিল তিল করিয়া, তার জীবন ও পরে কমলার জীবন গড়িয়া তুলিতে চায়। তার মত কমলাও বুঝিবে, জীবনকে উপভোগ করা একটা মস্ত জিনিষ। কমলা দরিদ্রের কন্যা নয়। তার রক্তের মধ্যে আভিজাত্যের অহংকার নিশ্চয় লুকাইয়া আছে। সেই জন্যই ত তার পক্ষে নরেশের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক হইয়াছে। আর সেইজন্যই সে নরেশের ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা নিজ বলে ও নিজের মত করিয়া উপভোগ করিতে পারিবে। ভগবান্‌কে ধন্যবাদ, কমলা এমন ঘরে জন্মিয়াছে, যেখানে ধনসম্পদ্‌কে তুচ্ছ করা হয় না।

আরও একটা কথা মনে করিয়া নরেশ কৌতুক অনুভব করে। সে একদিন রমেনকে বলিয়াছিল, শাড়ী, বাড়ী, গাড়ী, গয়না,—এই কয়টি জিনিষ প্রত্যেক স্ত্রীলোকের লক্ষ্য। ভাল খাওয়া, ভাল পরা, ভাল বাড়ীতে থাকা, আর কিছু অপরাধ নহে। কৃপণের জীবন নরেশের আদর্শ নয়। সুতরাং বাঁচিতে হইলে শুধু বাঁচিয়া থাকায় কোন গৌরব নাই। তার যখন এমন গুণ নাই, যা দ্বারা সে অমর হইতে পারে অথবা দশজনের নিকট নাম করিতে পারে, তখন তাকে তার ঐশ্বর্য্য ও আনুষঙ্গিক ক্ষমতা মূলধনরূপে কাজে খাটাইতে হইবে। সে যে ভাল খায়, ভাল পরে, ভাল বাড়ীতে থাকে, ভাল গাড়ীতে চড়ে, তার শত পরিচয় বিচ্ছুরিত করিতে হইবে। তার মনের এই প্রকার বাসনা,—সুতরাং কমলার ঐ সকল জিনিষের প্রতি লোভ হইলে তাকে বেশী দোষ দেওয়া যায় না। কমলা ত স্ত্রীলোক মাত্র। বুদ্ধিহীন বলিয়া ইহাদের খ্যাতি। কমলা সুন্দরী হইতে পারে, হয়ত অন্য অনেক স্ত্রীলোক অপেক্ষা তার বুদ্ধিও প্রখর, কিন্তু তাই বলিয়া কমলা যে কোন প্রকারে কখনও পুরুষ মানুষের সমকক্ষ হইবে, ইহা কল্পনা করা যাইতে পারে না। সেই কমলার মনে নিজ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রলোভন অন্য সব কিছু ছাপাইয়া উঠিলে সে মোটেই অসন্তুষ্ট হইবে না! বরং তাই আশা করিবে।

নরেশের সেই সাধের বাগান। সেখানে পায়চারি করিতে করিতে সে

নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুখ-স্বপ্ন দেখিতে ভালবাসে। ভবিষ্যৎ মানে অদূর ভবিষ্যৎ। খুব দূর ভবিষ্যতে কি হইবে, সে বাঁচিয়া থাকিবে কি না, এ সব কথা সে বড় বেশী আমল দেয় না। তার চিন্তার সাথী সিগারেট। ভগবান্ তাকে সুখী হইবার জন্য প্রচুর উপকরণ দিয়া পাঠাইয়াছেন। না, তাঁর বিরুদ্ধে তার কোন নালিশ নাই। আর তার সম্মুখে কোন কঠিন সমস্যা বা প্রশ্ন নাই। না তার নিজ জীবনে, না বিষয়-পরিচালনায়। একটি স্ত্রীর অভাবে তার গৃহ শূন্য ছিল। যতই বলা হোক্ না কেন, যে পর্য্যন্ত কোন রমণী বৈধপত্নীরূপে ঘর আলো না করে, সে পর্য্যন্ত শূন্যতা ঘোচে না। মনেরও না, ঘরেরও না। স্ত্রী-সংগ্রহের জন্য উৎকট আগ্রহ সে কোনদিন অনুভব করে নাই। এক শ্রেণীর লোক আছে, তারা স্ত্রীলোকের জন্য পাগল। অদৃষ্টের উপহাস এমন, তাদের স্ত্রীলাভ ত দূরে থাক্, রমণী-সঙ্গ পর্য্যন্ত দুর্ঘট হইয়া উঠে। নরেশ সেই শ্রেণীর লোক নয়। না, আজ কমলার জন্য তার যত ভালবাসা জন্মিযা থাকুক্, সম্ভবত সে ভালবাসা এমন নয় যে, কমলাকে না পাইলে সে মরিয়া যাইবে। কোন স্ত্রীলোককে না পাইলেই সে মরিয়া যাইবে না। কমলাকে ভাল লাগিয়াছে। পাইতে ইচ্ছা হয়। নিজের অন্তর বিশ্লেষণ করিয়া সে এই পয্যন্ত আবিষ্কার করিয়াছে। ব্যস্, এই পর্য্যন্ত। কমলাকে না পাইলে কিছু দিন তাকে দুঃসহ বেদনা ভোগ করিতে হইবে বৈ কি। তা স্বাভাবিক। কিন্তু সে বেদনা সে চিরজীবন বহিয়া বেডাইবে না, ইহা নিশ্চয়। প্রয়োজন বুঝিলে সে ভাল না বাসিয়াও বিবাহ করিতে পারে, যেমন হাজার হাজার লোক করিতেছে। কিন্তু কমলা নাকি তার মনকে সজোরে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে এবং এক দিন তাকে বিবাহও করিতে হইবে, সুতরাং অন্য সকলকে বাদ দিয়া সে কমলাকে কেনই বা বিবাহ না করিবে? প্রথমে সে বিবাহ করিবে বলিয়া অগ্রসর হয় নাই। নাই বা হইল। সে ত আর কাহারও হাত হইতে কমলাকে ছিনাইয়া লইতেছে না। রমেনের হাত হইতেও না। রমেনের মনে হয়ত অনুরাগ বা আকর্ষণ হইয়াছিল। বেচারা রমেন! কিন্তু আজ তিন বৎসরের অধিক

কাল সে কত না সুযোগ পাইয়াছে। সে ইচ্ছা করিলে বিবাহের প্রস্তাব করিতে পারিত। মধ্যপথে নরেশকে ডাকিয়া আনিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। নরেশ সাধিয়া নিজেকে উহাদের মাঝখানে আনে নাই। কোন সময়েই যে তার মনে রমেন সম্বন্ধে আশঙ্কা উদিত হয় না, তা নয়।

নরেশ মন স্থির করিয়াছে,—সে কমলাকে বিবাহ করিবে। এ বিবাহ তার মুখের কথার উপর নির্ভর করিতেছে। কমলার পিতা-মাতা এমন ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে, নরেশ দয়া করিয়া কমলাকে বিবাহ করিলে তাঁরা কৃতার্থ হইবেন। হয়ত কমলাও। কিন্তু তাঁদের দিক্ হইতে তাঁরা কোন প্রস্তাব উপস্থিত করেন নাই। তাঁরা মানী লোক। তাঁদের মনে হয়ত শঙ্কা আছে, প্রস্তাব উপস্থিত করিলে নরেশ যদি তা মঞ্জুর না করে? তা হইলে তাঁরা অপমানিত বোধ করিবেন। কিন্তু নিজেদেরকে অপমানের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত কেহ কি এমন ভাবে মেয়েকে বাঘের হাতে ছাড়িয়া দেয়? স্ত্রীলোক সম্পর্কে নরেশ বাঘ ছাড়া আর কি? নিরপেক্ষ সমালোচনা করিতে হইলে তাঁদের এই রুচির সে প্রশংসা করিতে পারে না। বলিতে কি, তাঁদের এই আচরণে খুসী ও কৃতজ্ঞ বোধ করা দূরে থাকুক্, মনে মনে অবজ্ঞা বোধ করিয়াছে। সুন্দরী কমলা প্রলোভনের অতীত নহে। তবু কমলাকে প্রশংসা করিতে হয়। এখন পর্য্যন্ত সে নিজেকে যথেষ্ট সাবধানে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তার চিত্তের খবর নরেশ রাখে না। কিন্তু তার শোভন ও শালীন ব্যবহার দ্বারা কমলা নরেশকে অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছে। জমিদারের গৃহিণীর এইরূপ হওয়াই উচিত। নরেশ যদি জোর করে, তা হইলে শেষ পর্য্যন্ত কমলা নিজেকে রক্ষা করিতে পারিবে কি না, নরেশ জানে না। আর বিবাহ মানিয়া লইলে, তার আত্মরক্ষার এত প্রয়োজনই বা কি থাকে? নরেশ ত এক রকম জানাইয়া দিয়াছে যে, সে তাকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যগ্র। কমলা যতই সরলা হোক্, নিশ্চয় এত কাঁচা নয় যে, তার কথা বুঝিতে পারে নাই। আর বেশী দেরী না করিয়া তাকে একদিন কমলার বাপ-মার

কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিতে হইবে। তার ইচ্ছা ছিল, তার হইয়া রমেন এই প্রস্তাব করে। রমেন প্রতিবেশী, পরিচিতও বটে। কিন্তু রমেন কিছুতেই রাজী হইল না। সে যে সকল কারণ দেখায়, তার কোনটা বিশ্বাস্য নহে। অন্তত নরেশের মনে হইয়াছে, সে মিথ্যা ওজর দেখাইয়াছে। রমেন যদি তার জন্য এই কাজটা করিতে না পারে, তা হইলে অবশ্য নরেশের কিছুই বলিবার নাই। সে আব কিছু জোর করিয়া রমেনকে দিয়া কিছু করাইয়া লইতে পারে না। রমেন কেন পিছপাও হইল, রমেনই জানে।

কিন্তু রমেনকে অনুরোধ করিবার পর অনেক দিন গত হইযাছে। ইহাব মধ্যে নরেশ তার বিবাহের প্রস্তাব করে নাই। কেন করে নাই? সে জানে, বিবাহেব প্রস্তাব যা, বিবাহও তা। জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হইতে চলিয়াছে। আষাঢ় মাসের মধ্যেই বিবাহ হইযা যাইবে। আয়োজন কবিতে আর কত সময় লাগে? তাব কর্ম্মচাবীরা দিনরাত খাটিয়া দুদিনে সব ঠিক করিয়া ফেলিবে। কমলার বাপকে সেজন্য বিন্দু মাত্র মাথা ঘামাইতে হইবে না। নরেশের বিবাহ! ভাবিতে নরেশের অদ্ভুত লাগে। ভালও লাগে। তার দৃঢ় চরিত্র নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তিত হইবে না। কিন্তু জীবন-যাত্রার মোড ফিরিবে। একক জীবন, আর স্ত্রী লইয়া জীবন,—দুয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক। অভ্যস্ত জীবন-যাত্রা ছাডিযা অনভ্যস্ত জীবন আবম্ভ করিতে হইবে। একটুখানি ভাবিতে হয বৈ কি। কমলা অবশ্য কোন কালেই তার উপর প্রভুত্ব করিতে পারিবে না, তার বশ্যতা স্বীকার করিযা লইতে হইবে। সে আপনা হইতেই লইবে। কিন্তু তথাপি বিবাহের পর কমলা কোন্ মূর্ত্তিতে দেখা দিবে, সে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। অনেক স্ত্রীলোক বিবাহের পর সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায়, ইহা সে শুনিয়াছে এবং দেখিয়াছে। কমলাকে দেখিবার সুযোগ তার হইয়াছে। মিশিবারও। না মিশিয়া কাহাকেও বিবাহ করাই ত ছিল তার ইচ্ছা। দৈবাৎ সে কমলার সহিত মিশিতে পারিয়াছে। তাকে বুঝিতে শিখিয়াছে। কিন্তু সত্যই কি

সে কমলাকে জানে ? কতটুকু জানে সে ? কমলা তার কাছে আসিয়া বসে, গল্প করে, সে তার সুন্দর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হয়, ঐ পর্য্যন্ত। ইহার বেশী সে জানে না। কমলাকে সে বহু বার দেখিয়াছে, ভাল করিয়া দেখিয়াছে, তবু বলিতে পারে না, কমলা বদ্‌রাগী কি না, বলিতে পারে না, তার হিংসক স্বভাব কি না। আরও অনেক কিছু বলিতে পারে না। সে মোটা কি রোগা, লম্বা কি বেঁটে, ফরসা কি কালো, তা বলিতে পারা কঠিন নয়। তার অন্তরলোকের খবর জানিবার জন্যও সে ব্যস্ত নয়। কিন্তু তার প্রকৃতি, মতিগতি, স্বভাব,—সে কিছুই জানিতে পারে নাই। কমলার সহিত যতই মিশুক্, হয়ত কোন দিন জানিতে পারিবে না। উপায় নাই। নরেশের সহিত কমলার যত বার দেখা হইবে, সে পোষাকী বেশে উপস্থিত হইবে। যেমন নরেশ নিজে পোষাকী বেশে উপস্থিত হয়। আবরণ আর কিছুতেই উন্মোচিত হয় না। সুতরাং বিবাহ ব্যাপারে আন্দাজে ঢিল মারিতে হয়। বিবাহ যখন করিবে, তখন আর এ বিষযে বিবেচনা করিবার কি আছে ? তবু বিবাহ-প্রস্তাবে সে যে দেরী করিতেছে, তা হয়ত বিবাহ-পূর্ব্ব অবস্থাটা আরও কিছু কাল উপভোগ করিবার জন্য। অথবা কমলার নিকটে তাব হৃদয় কিছু চাহিতেছে। কে বলিবে ?

কমলার সহিত নরেশের প্রায় প্রত্যহ দেখা হয়। অত্যন্ত বাজে কথায় সময় কাটিয়া যায। কি করিয়া যে যায়, তা নরেশ ভাবিয়া পায় না। সে অবশ্য গম্ভীর প্রকৃতির নয, হাসিতে খুসীতে উজ্জ্বল হইয়া আছে। গম্ভীরভাবে কোন বিষয় লইয়া অনেকক্ষণ ভাবা, তার ধাতে পোষায় না। ভগবান্ তাকে সুখী হইবার জন্য এত প্রচুর উপকরণ দিয়া পাঠাইয়াছেন, আর সে কি নিজেব নির্ব্বুদ্ধিতা দ্বারা অসুখ সৃষ্টি করিবে ? জগতে দুঃখ-কষ্ট, দারিদ্র্য-অভাব আছে, কিন্তু সেজন্য সে দায়ী নয়। সেজন্য সে নিজের সুখ ও তৃপ্তি উপেক্ষা করিতে পারে না। কমলার সঙ্গ তার ভাল লাগে। কাজেই প্রতিদিন কমলার নিকট আসা সে স্বাভাবিক মনে করে। ইতিমধ্যে সে কমলাকে

বহুবিধ উপহার দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। কমলার মন ভুলাইবার জন্য যে কিছু দিয়াছে, তা নয়। দিলে কোন ক্ষতি হয় না, বরং তৃপ্তি পায়, এই জন্য দিয়াছে। বাজারে নূতন ধরণের শাড়ী উঠিলে আর কথা নাই। কমলার জন্য কিনিয়া আনিয়াছে। কমলা বাপের অত্যন্ত আদরিণী। তার শাড়ী, জামা ও অন্য দ্রব্য প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে আছে। নরেশ সে কথা জানে। কমলাও তাকে বহুবার নিষেধ করিয়াছে। তার জন্য কোন উপহার আনিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কার কথা কে শোনে? নরেশ বলিয়াছে, তার কমলার জন্য কিছু কিনিতে ভাল লাগে, আনন্দ হয়, কমলা তাকে সেই সুখ হইতে কেন বঞ্চিত করিতে চায়? বস্তুত, নরেশের এই উপহার অহংকার-প্রসূত নহে। সে একথা মনে করে না, এই ভাবে কমলার ভালবাসা কিনিতেছে। কোন প্রকার প্রতিদান বা প্রত্যাশা ইহার মধ্যে নাই। আর দুদিন বাদে যাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিবে, তার কাছে আবার কি প্রত্যাশা করিবে? কমলা এই সকল উপহার অত্যন্ত ক্লিষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিত। মনে মনে অস্থির হইয়া যাইত। নরেশের দেওয়া জিনিষ সে ক্বচিৎ ব্যবহার করিত। ইহা লক্ষ্য করিয়া নরেশ কমলাকে প্রায়ই অনুযোগ করিত। কমলা কোন না কোন ছুতায প্রশ্ন এড়াইয়া যাইত বটে, কিন্তু নরেশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাছে তা ধরা পড়িয়া যাইত। বিষয়টা অতি সামান্য। কিন্তু তবু সেই কথা মনে করিয়া কষ্ট হয়। কমলা যতই কুসুম-কোমলা হোক্, তার জেদ আছে, আর তা কোন কোন আচরণে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সে জন্যই বা ভাবনা কি?

নরেশ একদিন মনে মনে সত্যই ব্যথা পাইয়াছিল। সেই দিনই সে তার মনের ভাব কমলাকে প্রথম জানায়। অর্থাৎ বলে যে, সে তাকে বিবাহ করিতে পারিলে সুখী হইবে। কবিত্বপূর্ণ কথা তার মুখ দিয়া বাহির হয় না। তবু সেদিন যে সে কেমন করিয়া কমলাকে 'হৃদয়ের রাণী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল, ভাবিলে এখন হাসি পায়। বোধ হয়, জীবনের কোন

কোন মুহূর্ত্তে মানুষ অজ্ঞাতসারেও নিজেকে ব্যক্ত করে। সে আগে হইতে ভাবিয়া চিন্তিয়া আসে নাই। হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়াছে। কমলার দিক্ হইতে কোন সাড়া আসে নাই। কমলা নিশ্চয় প্রস্তুত ছিল না। আর প্রস্তুত থাকিলেও কোন মেয়ের পক্ষে, কমলার পক্ষে, উত্তর দেওয়া সহজ না হইতে পারে। তা ছাড়া কমলা হঠাৎ কোন উত্তর না দিয়া ভালই করিয়াছে। দুঃখ সেজন্য নয়। দুঃখ এই জন্য যে, কমলা তার সহিত বড়ই পরের ন্যায় ব্যবহার করে। এতদিনের পরিচয়ের পর কমলা কি তার সহিত আরও একটু ঘনিষ্ঠ ব্যবহার করিতে পারে না? তার নিকট হইতে বন্ধুর মত ব্যবহার পাওয়ার আশা করা কি নরেশের পক্ষে অন্যায়? কমলার সহিত অবাধে মিশিবার সুযোগ সে সর্ব্বদাই পায়। কমলার বাপ-মা তাকে সর্ব্বত্র অবাধ গতিবিধির অধিকার দিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত নরেশ সেই অধিকারের কোনপ্রকার অসদ্ব্যবহার করে নাই। সে যে বিশ্বাসের অযোগ্য নয়, কমলা তার বহু প্রমাণ পাইয়াছে। তথাপি কমলা যেন তাকে আমল দিতে চায় না। ইহা কমলার নারী-সুলভ লজ্জাবশত হইতে পারে, অথবা তার মনে আর কারও প্রতি অনুরাগবশত হইতে পারে। নরেশ আর কিছু চাহিতেছে না যে, কমলা তার প্রতি অসীম অনুরাগ দেখাক্। কিন্তু নরেশের প্রতি কমলার মনে কোন বিতৃষ্ণা থাকিলে, নরেশ নিশ্চয় অগ্রসর হইবে না। কমলার সহিত নরেশ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কত রকমে যে রমেনের কথা পাড়িয়াছে, তার ঠিক নাই। কিন্তু রমেনের জন্য কমলার কোন দুর্ব্বলতা আছে কি না, তা আজও সে বুঝিতে পারে না। কমলা হয়ত নিজের মনের গোপন কথা চাপিয়া রাখিতে ওস্তাদ। কিন্তু তার প্রতি কমলার ব্যবহার বিশ্লেষণ করিলে, নরেশের মনে হয় না, কমলা তার প্রতি বিরূপ। বরং তার সম্বন্ধে কমলার মনে যে অসীম ঔৎসুক্য রহিয়াছে, তা প্রকাশ হইয়া পড়ে। সে কয়েকবার কমলাকে তার নিজ বাড়ীতে আনিবার চেষ্টা করিয়াছে, আর কমলা প্রতিবার প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

তার বাপ-মায়ের সে বিষয়ে মত থাকিলেও সে রাজী হয় নাই। এমন কি, নরেশের সহিত এ পর্য্যন্ত কোন দিন মোটরে চড়িয়াও বাহিরে যাইতে রাজী হয় নাই। কমলা বড় কুণো। বড় সেকেলে। আজকালকার মেয়েদের মত সাহস তার নাই। আজকালকার মেয়ে বলিয়া সে স্পর্দ্ধা করে। হাঁ, পোষাক পরিচ্ছদে সে আজকালকার মেয়ে। কিন্তু স্বভাবে সে নম্র ও লাজুক। নরেশ স্বীকার করিবে, সহুরে চটপটে মেয়ের একটা আকর্ষণ আছে, কিন্তু কমলার এই স্নিগ্ধ কমনীয়তার আকর্ষণ অপূর্ব্ব। কমলা শালীনতা রক্ষায় প্রাণপণে যত্নশীলা, অথচ বৃথা লজ্জাশীলা নয়। তার সহিত কত সহজে আলাপ ও গল্প করে। তার গল্পের মধ্যে প্রাণ আছে। সে নরেশকে আদর-যত্ন করে, সৌজন্য দেখায়। বস্তুত, নরেশের প্রতি কমলার ব্যবহার নিখুঁত। ইদানীং বরং রমেন সেখানে কোন আমল পায় না বলিয়া মনে হয়। নরেশ কমলাদের বাড়ীতে রমেনকে ক্বচিৎ দেখিতে পায়, সে ডাকিতে আসিলেও রমেন যায় না। কমলা সম্বন্ধে রমেনের ঔৎসুক্য কমিয়া গিয়াছে কি না, সে জানে না। এক কালে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে নরেশের মত বদলাইবার উদ্দেশে কমলার বিষয়ে রমেন কত কথাই না বলিত! মনে হইত, উভয়ের মধ্যে গভীর ঐক্য ও হৃদ্যতা রহিয়াছে। তা কি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে? আর এই অনৈক্যের হেতু কি সে নিজে? জানিয়া শুনিয়া সে কিছু করে নাই। তবে প্রতিযোগিতায় যদি সে রমেনের উপর জয়লাভ করে, তা হইলে কারও কিছু বলিবার নাই। এ ত উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা। রমেন বহু অসুবিধা লইয়া প্রতিযোগিতা করিয়া থাকিবে, কিন্তু সেজন্য ত আর সে দায়ী নয়। রমেনও নিশ্চয় তাকে দায়ী করিবে না। প্রতিযোগিতার কথা মনে পড়িতেই নরেশের হাসি পাইল। সে যে কি ভাবিতেছে! কমলাকে কে তার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে? রমেন নয় কি? তার বরং রমেনের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করা উচিত। বিবাহ সে করিতই, কিন্তু কমলাকে নয়। কমলাকে ত রমেন আনিয়া দিয়াছে, এবং তাকে

পূর্ণ অনুমতি দিয়াছে, তার মন জয় করিয়া লও। সেটা বড় কঠিন কাজ। কমলা তার সম্বন্ধে নিরুৎসুক না হইতে পারে, কিন্তু কমলার মন সে জয় করিতে পারে নাই। না, সে নিজের কাছে নিজে স্বীকার করিবে, সে কমলাকে তেমন ভাবে জয় করিতে পারে নাই। তার পুরুষের অহংকার প্রতিহত হইয়াছে। সে আশা করিতেছে, প্রতিদিন আশা করিতেছে, কমলা বিজিত হইবে। হয়ত বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন না করিবার কারণ এই। এক দিকে তার মন কমলাকে পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে, দেরী সহ্য করিতে চায় না, অন্য দিকে সে ভাবিতেছে, যদি অপেক্ষা করার ফলে কমলাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা যায়, তা হইলে অপেক্ষা করিতে দোষ কি? শেষ পর্য্যন্ত একটা পথ তাকে অবলম্বন করিতেই হইবে। কমলার চিত্ত-জয়ের জন্য সে আর কিছু অনন্ত কাল ধরিয়া অপেক্ষা করিবে না। কিছু কাল অপেক্ষা করিবার পর তাকে বিবাহ-প্রস্তাব আনিতেই হইবে। বিবাহেব পর কমলার চিত্ত-জয়ের চেষ্টা না হয় করা যাইবে। কুমারী কমলার চেযে স্ত্রী কমলাকে আয়ত্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইতে পারে।

সুন্দর গ্রীষ্ম-সন্ধ্যা। নরেশ ধূমপান করিতে করিতে বাগানে পায়চারি করিতেছিল। সারাদিন প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পর সন্ধ্যার মধুর হাওয়া মনকে যে কি আবেশে আবিষ্ট করে বলা যায় না। ঝড়বৃষ্টি না থাকিলে নিত্য এইরূপ সন্ধ্যাকে উপভোগ করা নরেশের অন্যতম বিলাসিতা। নরেশ হয়ত সেদিনের কথাও ভাবিতেছে, যেদিন কমলার রাঙ্গা পায়ের স্পর্শে তার সাধের বাগানখানা রণিত হইয়া উঠিবে। সেই মৃদু মধুর পদধ্বনি সে এখন কান পাতিয়া শুনিতে পায়। কিন্তু তার কল্পনা ও বিলাসিতায় বাধা জন্মিল। বেহারা এক জরুরী পত্র লইয়া আসিয়াছে। ভাওয়ালে তার যে সম্পত্তি আছে, তার নায়েব চিঠি লিখিয়াছে। লিখিয়াছে, এখানে ছোট-খাট প্রজা-বিদ্রোহ হইবার আশঙ্কা আছে। কে বা কাহারা কিছু দিন যাবৎ

প্রজাদের মধ্যে জমিদারের বিরুদ্ধে নানাবিধ প্রচার-কার্য্য চালাইয়া আসিতেছে। নানা প্রকার ইস্তাহার বিলি হইয়াছে। গ্রামের দু একজন মাতব্বর, যারা পড়িতে জানে, তারা আর সকলকে পড়িয়া শুনাইয়াছে ও বুঝাইয়া দিয়াছে। ইস্তাহারের নকল দেওয়া হইল। হুজুর তা হইতেই সম্যক্ অবগত হইবেন। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া পূর্ব্বাহ্নে পুলিশকে খবর দেওয়া হইয়াছে। এখন হুকুমের অপেক্ষা। নায়েব জানিতে চায়, পুলিশের সাহায্য লইয়া প্রজা দমন করিবে কি না। ইহাও জানাইয়াছে যে, এখন দমন না করিলে, ইহা ক্রমেই প্রবল আকার ধারণ করিবে। প্রজাদের সত্যকার অভিযোগ যে কি, তা সে বুঝিতে পারে নাই। এবার ফসল খুব ভাল হইয়াছে। কোথাও অন্নাভাব বা অর্থাভাব নাই। প্রজারা তার কাছে খাজনা-হ্রাসের কোন প্রকার সুপারিশ এ পর্য্যন্ত করে নাই। তথাপি তারা জোট বাঁধিয়া স্থির করিয়াছে, খাজনা দিবে না। তাদের কথা হইতে উহার কারণ সে নির্ণয় করিতে পারে না। চারিদিকে গরম গরম বক্তৃতা দ্বারা জমিদারের বিরুদ্ধে নানা প্রচার-কার্য্য চলিতেছে। প্রচারকেরা বেপরোয়া লোক। হাতে লাঠি বা কোন প্রকার অস্ত্রশস্ত্র নাই। সর্ব্বাঙ্গ শুভ্র পরিচ্ছদে আবৃত। ইহারা সাদা ফৌজ নামে অভিহিত। অধিকাংশ শিক্ষিত লোক। বাহির হইতে আসিয়াছে। লোকেরা ইহাদের দেবতার মত মান্য করে এবং ইহাদের কথা শুনিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত। ভয় দেখাইয়া বা লাঠি চালাইয়া সাদা ফৌজের কাহাকেও নিবারণ করা যায় না, পরন্তু তাদের বাধা দিবার জন্য চেষ্টা মাত্র করিলে প্রজারা আবালবৃদ্ধবনিতা ক্ষেপিয়া উঠে। নায়েবের হয়রানির একশেষ হইতেছে। এই অদ্ভুত শত্রুকে যে কি করিয়া বিতাড়িত করা যায়, তা ভাবিয়া সে কূল পাইতেছে না। নায়েব তার দীর্ঘ পত্রের এক স্থানে লিখিয়াছে, 'আমি মাতব্বর গোছের কয়েক জন প্রজাকে হুজুরের অত্রস্থ কাছারি বাড়ীতে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কি চাও? খাজনা মাপ করাইতে চাও? তা হইলে এই সব আন্দোলন না করিয়া

হুজুরের বরাবর আর্জি পেশ কর না। আমি তোমাদের কথা দিতেছি, তোমাদের আর্জি যথোচিত বিবেচনা করা হইবে। ইহার উত্তরে তারা যা বলে, তা যেমন অদ্ভুত তেমনই অসঙ্গত। তারা বলে, হুজুরের প্রতি তারা অতিশয় ভক্তিমান্। তারা জানে, হুজুরের রাজত্বে বাস করা আর রাম রাজত্বে বাস করা, একই কথা। এবার সোনার ফসল হইয়াছে। সুতরাং খাজনা-হ্রাসের কথা উঠিতেই পারে না। আর খাজনা-হ্রাস দ্বারা প্রজাকুলের কখনও স্থায়ী উন্নতি হয না। তারা এমন কিছু চায যাতে প্রজাসাধারণের স্থায়ী উন্নতি হইবে। হুজুর বাহাদুর তাদের অনুরোধ অনুসারে কাজ করিলে ইহলোকে তাঁর অক্ষয় কীর্ত্তি থাকিয়া যাইবে। এ পর্য্যন্ত কেহ যা করিতে পারে নাই, তিনি তা করিয়া অক্ষয় পুণ্য ও অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিবেন। হুজুর বুদ্ধিমান্ ও প্রজাদের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট। সেইজন্য তাঁর নিকট তারা আবেদন করিতেছে। তাদের আবেদনের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই: বর্ত্তমানে এই অঞ্চল হইতে জমিদার কি পরিমাণ রাজস্ব আদায় করেন, তা তারা জানে না। প্রতি বৎসর তারা এই পরিমাণটা জানিতে চায়। আর তারা চায় যে, জমিদার তাঁর লাভের সমস্তটা গ্রহণ করিবেন না। ভাবিয়া দেখিতে গেলে জমি হুজুরের নামে হইলেও তিনি আর নিজে কিছু চাষবাস করিতে পারেন না। এবার ভাল ফসল ফলিয়াছে। কিন্তু তাতে কৃতিত্ব কাহার? হুজুরের না প্রজাবৃন্দের? নিশ্চয় প্রজাদের। কারণ, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া তারাই ফসল ফলাইয়াছে। তারা এমন দাবী করিতেছে না যে, সমুদয় ফসল বা মুনাফা তাদের দেওয়া হউক। তা দাবী করিলে খুব বেশী অন্যায় হয় না। কিন্তু হুজুরের ন্যায়পরতার কথা বিবেচনা করিয়া তারা তা করিতেছে না। তারা চায়, সমুদয় লাভের অর্দ্ধাংশ তাদের দেওয়া হউক। এই অর্দ্ধাংশ পাইলে তাদের যে কিরূপ উপকার হইবে তা বলা যায় না। দশ বৎসরের মধ্যে হুজুরের এলাকাস্থ ভাওয়াল

জমিদারি একেবারে স্বাস্থ্যে, শিক্ষায়, সম্পদে দেশের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে। এইরূপে লব্ধ অর্দ্ধাংশ যাতে অপব্যয়ে নষ্ট না হইতে পারে, তজ্জন্য তারা যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। সাদা ফৌজের লোকেরা সে ভার লইয়াছে। অর্থ হুজুরের নিকট গচ্ছিত থাকিবে, কিন্তু প্রজাদের নামে। বিভিন্ন গ্রামের প্রজাদের অভাব-অভিযোগ জানান হইবে, ঐগুলি দূর করিতে আন্দাজ কত ব্যয় হইবে, তার তালিকাও পাঠান হইবে। তারপর বিভিন্ন গ্রামে সাদা ফৌজের লোকেরা জনহিতকর নানা কাজে লাগিয়া যাইবে এবং খরচের জন্য বিল হুজুরের বরাবর প্রেরণ করিবে। হুজুর সদর হইতে সেই সব ব্যয় মঞ্জুর করিতে আজ্ঞা দিবেন। এইরূপে তাঁর নিজের লাভও থাকিবে, প্রজাদেরও কল্যাণ হইবে।'

সঙ্গে যে ইস্তাহারটি ছিল তাতে এইরূপ লেখা: 'চাষী ভাই, তোমরা জাগো। তোমরা তোমাদের অধিকার দাবী কর। শত শত বৎসরের অত্যাচার ও নির্য্যাতন তোমরা সহ্য করিয়াছ। আজ মাথা তুলিয়া দাঁড়াও। আজ মুক্তকণ্ঠে বল, মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকার তোমাদের জন্যও রহিয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া তোমাদের ছেলেরা ও মেয়েরা কোন প্রকার শিক্ষা পায় না, তোমাদের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে সকলে উদাসীন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যা উপার্জ্জন কর, তার অধিকাংশ অন্যে উপভোগ করে। তোমরা শুধু দিন দিন অভাব, দারিদ্র্য, পীড়া ও অন্ধকারের মধ্যে নিজেদের ডুবাইয়া রাখিতেছ। কিন্তু মানুষের মত বাঁচিবার অধিকার তোমাদেরও আছে। ভাল খাইবার, ভাল পরিবার, ভাল ঘরে থাকিবার, তোমাদের জন্মগত অধিকার রহিয়াছে। তোমরা সেই জন্ম-অধিকার কেন ত্যাগ করিবে? নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষার পক্ষে যতটা দরকার ততটা অর্থ তোমাদের হাতে থাকা চাই, অথবা এইগুলি সুবিধামত পাইবার জন্য বন্দোবস্ত চাই। গ্রামের পুকুর, রাস্তাঘাট, পাঠশালার মেরামত বা সংস্কার দরকার। তোমরা এখন যেমন খাট বরাবর সেইরূপ খাটিবে। সোনার

ফসলের জন্য যারা চেষ্টা করিবে না, যারা নিজেরা অলস থাকিয়া পরের পরিশ্রমের ফল ভোগ করিতে চাহিবে, তাদিগকে নিশ্চয় ক্ষমা করা হইবে না, তাড়াইয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু সোনার ফসল ফলাইবার বিনিময়ে তোমাদের চিরন্তন দাবী সমাজকে মানিয়া লইতে হইবে। তোমরা জমিদারদের বিরোধী নও। বরং জমিদারি প্রথা রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ করিবে। কিন্তু বর্ত্তমান জমিদারি প্রথাকে সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত করিতে হইবে। জমি হইতে নিট্ যা লাভ হয়, তার অর্দ্ধেক জমিদার ও অর্দ্ধেক প্রজা পাইবে। উপরন্তু জমিদারের অর্থে দেশে ইস্কুল, ডাক্তারখানা স্থাপিত হইবে, পুকুর ও রাস্তাঘাটের সংস্কার হইবে এবং অন্যান্য হিতকর কাজের অনুষ্ঠান হইবে। চাষী ভাই, যে জমিদার এই পথে চলিবে না, তাকে বিলোপ করিতে হইবে। আমরা সাদা ফৌজ। আমাদের পোষাক যেমন সাদা, মনও তেমন সাদা। পৃথিবীতে আমরা শান্তিকামী, শান্তি-প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী। জমিদার বা কোন শ্রেণীর লোকের প্রতি আমাদের বিদ্বেষ নাই। কিন্তু শান্তি-প্রয়াসী বলিয়া আমরা অন্যায়ের সমর্থক নহি। আমরা শপথ করিয়াছি, লক্ষ লক্ষ চাষী ভগিনী ও ভাইয়ের প্রতি যে সামাজিক অন্যায় করা হইয়াছে, যার ফলে তারা আজ সমাজের নিম্নস্তরে পড়িয়া রহিয়াছে, নিত্য নানা প্রকারে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতেছে, তার প্রতিবিধান করিতে হইবে। উঠ চাষী ভাই, এ বিষয়ে তোমরা সচেতন হও। ভীরুতাই পাপ। ভীরুতা দূর করিয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াও। তা হইলে তোমাদের জন্মগত অধিকার তোমরা লাভ করিতে পারিবে। জমিদারদেরও আমরা ডাক দিয়া বলিতেছি, তোমরা সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ, তোমরা এ বিষয়ে পথ দেখাও। তোমরা দেশকে উন্নতির উচ্চশিখরে লইয়া গিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হও।'—সাদা ফৌজ।

সাদা ফৌজ দলের কথা নরেশ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও শুনে নাই। কিরূপে এই দলের উৎপত্তি হইল, কাহারা যোগ দিয়াছে, কেমন করিয়া তারা

সঙ্ঘবদ্ধ হইল, তা সে জানে না। বাংলা দেশের সর্ব্বত্র ইহারা ছড়াইয়া পড়িয়াছে কি না, তাও শোনে নাই। নায়েব নিজের কাজের কথাটুকু লিখিয়াছে। তার চিঠি হইতে ইহাদের সম্বন্ধে কোন কৌতূহল চরিতার্থ হইবার উপায় নাই। নরেশ নিজেকে অগ্রসরতম জমিদারদের মধ্যে একজন বলিয়া মনে করিত। তার এলাকায় যদি সাদা ফৌজের এরূপ দৌরাত্ম্য হইয়া থাকে, তা হইলে অন্যত্র তা কত গুণ হইয়াছে অথবা আদৌ হয় নাই, কে বলিবে? খবরের কাগজগুলি ত এ বিষয়ে একেবারে চুপচাপ। সাদা ফৌজ যতই শান্তিকামী হোক্ এবং যতই জমিদারদের প্রতি শুভেচ্ছা জানাক, তাদের শত্রু বলিয়া মনে না করিয়া নরেশের উপায় নাই। যারা সোজাসুজি জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করিতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে আইনের শরণ লওয়া যায়। কিন্তু ইহারা সূক্ষ্ম চাল চালিয়াছে। প্রজাদের হিতৈষী সাজিয়া ক্ষেপাইয়া বেড়াইতেছে। ইহারা যে নিজ স্বার্থ ও প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য এরূপ করিতেছে না, তার প্রমাণ কি? আর সত্য সত্য কৃষক-সাধারণের জন্যও যদি ইহারা অবতীর্ণ হইয়া থাকে, তা হইলে ইহাদিগকে এই অধিকার কে দিল? প্রজায়-জমিদারে বোঝাপড়া হইতে পাবে। জমিদারের কাছে প্রজারা অনেক প্রকার আব্দার করিতে পারে। নরেশ প্রজাদের সকল রকম আব্দার নিজে শোনে এবং শুনিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে। কিন্তু ইহার মধ্যে তৃতীয় পক্ষের কোন প্রয়োজন নাই। প্রজাকে সে তার লাভের অর্দ্ধাংশ দিবে অথবা সমস্তটা দিবে, তা সে বুঝিবে। এ বিষয়ে অন্যের হস্তক্ষেপ সে সহ্য করিবে না। পুলিশের সাহায্য লইবার সে ঘোর বিরোধী। 'বলং বলং বাহুবলং'। কলে বলে কৌশলে প্রজা শান্ত করিতে সে জানে। এ ক্ষেত্রেও সে নায়েবকে লিখিয়া দিল, সে যেন চিন্তা না করে, সে শীঘ্রই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইবে। পুলিশের সাহায্য লইবার বা সাদা ফৌজদের ঘাঁটাইবার কোন প্রয়োজন নাই। সে উপস্থিত হইয়া অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবে।

ভাওয়ালের কাছারি বাটীতে স্বয়ং জমিদার পদার্পণ করিবেন। সেইরূপ উৎসব-আয়োজন হইতেছে। সদর হইতে কর্ম্মচারীরা তদারক করিতেছে যেন তাঁর উপযুক্ত অভ্যর্থনায় কোন প্রকার ক্রটি না হয়। নরেশ কোন কালে নিঃশব্দে আসিবার পক্ষপাতী নয়। নজরানার সে বিরুদ্ধে। কিন্তু সে আসিয়াছে, ইহা প্রজাদিগকে ভাল করিয়া জানাইবার উপদেশ তার দেওয়া আছে। সুতরাং সে আসিবার পূর্ব্বে ঢ্যাড়া পিটাইযা জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে, নরেশ আসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে কাছারি বাড়ীর প্রাঙ্গনে ও বাহিরে লোক জমিতে আরম্ভ করিয়াছে। দূর দূরান্তব হইতেও প্রজারা পায়ে হাঁটিযা আসিয়াছে। অধিকাংশ চাষী তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আনিয়াছে। নরেশকে প্রজারা কোন দিন চোখে দেখে নাই, তা নয়। কিন্তু এই বার বহু দিন পরে আসিতেছে। সদরে গিয়া ত আর হুজুরকে সর্ব্বদা দেখা যায় না। সুতরাং এই সুযোগ আবালবৃদ্ধবনিতা ছাড়িয়া দিতে রাজি নয়। জমিদার আসিতেছেন! তাদের নিত্য একঘেয়ে জীবনে এই সংবাদটার গুরুত্ব কত! এমন জমিদার নয়, যাঁর আগমনে প্রজারা প্রমাদ গণিবে,—ভাবিয়া পাইবে না, কিরূপে নজর বা অন্য উৎকোচ সংগ্রহ করিবে। চাষীরা কেহই যে কিছু আনে নাই, তা নয়। যে যা পারিয়াছে, আনিয়াছে। আরও আসিবে। সমস্ত একপাশে স্তূপীকৃত করা হইতেছে। লোকেরা আসিয়া জড় হইয়া দেখিতেছে, কাছারি বাড়ী কি ভাবে সাজান হইতেছে। ইহারা সাধারণত শান্ত। বেশী গোলমাল করে না। ইহাদের নানা মন্তব্যসমন্বিত একটা গুঞ্জনধ্বনি উঠিতেছে। ধ্বনি গোলমালে পরিণত হইতে চলিলে উপস্থিত কোন কর্ম্মচারীর ধমকে তা আবার নামিয়া যাইতেছে। ব্যস্তসমস্ত ভাবে চারিদিকে লোকজন ছুটাছুটি করিতেছে। সকলের মুখ গম্ভীর। বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। যে কোন মুহূর্ত্তে নরেশ আসিয়া পড়িতে পারে। সে জন্য সকলে নির্দ্দিষ্ট সরকারী পোষাক পরিয়া তৈরী হইয়া আছে। নরেশ ঢাকা হইতে ঘোড়ায় চড়িয়া আসিবে। তার মত ঘোড়সওয়ার এ অঞ্চলে

মেলা ভার। কিন্তু সন্ধ্যা হইবার পূর্ব্বে তাকে দেখিবার জন্য রাস্তায় রাস্তায় এত লোক জমিয়াছে যে, নরেশের পক্ষে কাছারি বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছিতে কিছু দেরী হইবে। অবশেষে দেখা গেল, ঘোড়ায় চড়িয়া নরেশ আসিতেছে। তার সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজা। কিন্তু মুখে প্রসন্ন হাসি। প্রজারা সর্ব্বত্র আভূমি নত হইয়া প্রণাম করিল। কাছারি বাড়ী পৌছিতে লোকে লোকারণ্য। জমিদার বাহাদুরের মুখ দেখিবার জন্য ঠেলাঠেলি। জমিদারের পাইকেরা কষ্টে লোক ঠেলিয়া রাখিতেছে। কর্ম্মচারীরা শশব্যস্ত। আসিয়া সকলে একে একে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। শুধু যারা ব্রাহ্মণ তারা হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। নরেশ যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া বসিলে কেহ ডাব নিয়া আসিল, কেহ পাখার বাতাস করিতে লাগিল, কেহ জুতা খুলিয়া দিল, কেহ শুধু হাত জোড় করিয়া আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। উপস্থিত প্রজাবৃন্দ তার আকৃতি, তার পোষাক-পরিচ্ছদ, সব কিছু সম্বন্ধে মৃদু স্বরে নিজেদের মধ্যে প্রশংসা ও বিস্ময়সূচক মন্তব্য করিতেছিল। নিজেদের শ্রদ্ধা জানাইবার ভাষা তারা খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

অন্য দিকে, ভাওয়াল জমিদারির এক স্থলে বহু লোক, আবালবৃদ্ধবনিতা, জড় হইয়াছে। সাদা ফৌজের কয়েক জন বক্তা হাত মুখ নাড়িয়া একে একে বক্তৃতা করিতেছে, আর সকলে নিবিষ্ট মনে তা শুনিতেছে। বক্তাগণের মূল কথা নিম্নরূপঃ 'জমিদার আজ সন্ধ্যাকালে নিজে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ভালই হইয়াছে। নরেশের মত জমিদার দেশে বেশী থাকিলে, দেশের শ্রী ফিরিয়া যাইত। তিনি দূর হইতে প্রজাদের অভাব-অভিযোগ পরের মুখে শুনিয়া প্রতীকারের ব্যবস্থা করেন না। নিজে উপস্থিত থাকিয়া শুনে ও অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করে। ইহা সকল জমিদারের অনুসরণ করা উচিত। আর এখানে জমিদারের আগমন ভীতির কারণ না হইয়া আনন্দের কারণ হইয়াছে। কেন না, নজর বা জবর-দস্তি উপহার সম্বন্ধে নরেশের প্রবল নিষেধ আছে। প্রজারা স্বচ্ছন্দমনে ও

প্রফুল্লচিত্তে তাদের জমিদারকে দেখিতে যাইতেছে, লুকাইয়া থাকিতেছে না। জমিদারের ত এই রকমই হওয়া উচিত। সাদা ফৌজের আশা আছে, নরেশের মত বুদ্ধিমান্ ও উদার-হৃদয় জমিদার সহজেই তাদের পরামর্শ মত কাজ করিয়া ও প্রজাদের সুখ-কল্যাণ বহুল পরিমাণে বাড়াইয়া নিজের কীর্ত্তি আরও উজ্জ্বল করিবে।

'লাঙ্গল দিয়া জমি চষে কে? নিশ্চয়ই জমিদার নয়। আজ যদি নরেশের জমিদারির কয়েক হাজার চাষী বলিয়া বসে, আমরা আর ইঁহার জমি চাষ করিব না, তা হইলে কি হয়? তা হইলে জমিদারের ঘরে ক ছটাক ধান উঠে? জমিদার বলিতে পারেন, যাক্ না চলিয়া; আমার জমি যারা চাষ করে, তারা চলিযা গেলেও আমার ভয় পাইবার কারণ নাই। আমি অন্য স্থান হইতে হাজার হাজার চাষী আনাইয়া আমার জমি চাষ করাইয়া লইব। আমায় কে নিবারণ করিবে? চাষীর উত্তর এই, হাজার হাজার চাষী পাওয়া অত সহজ নয়। প্রায় সকল চাষীই কাজে নিযুক্ত থাকে। তারা আর কিছু কাজ ছাড়িয়া দলে দলে আসিবে না। তারপর হাজার হাজার চাষী ইচ্ছা করিলেও আসিতে পারিবে না। কারণ, চাষীরা ঋণগ্রস্ত। জমিদার, মহাজন বা প্রতিবেশীর কাছে ঋণ লয় নাই এমন চাষী মেলা ভার। ইহা কি সত্য নয়? দেখিতেছি, মাথা নাড়িয়া সকলে এ কথা মানিয়া লইতেছে। সুতরাং চাষী পাওয়া সহজ নয়। একে চাষী ঋণগ্রস্ত, তায় অন্যত্র তার কাজ পাইবার সম্ভাবনা কম; চাষী কিরূপে কাজ বন্ধ করিবে? কাজ না করিলে ফসল পাওয়া যাইবে না, এ কথার অর্থই বা কি? অর্থ আছে। এটা কল্পনা। চাষীর অভাবে জমিদারের কি অবস্থা হয় তা বুঝাইবার জন্য এই কল্পনা। জমিদারের অর্থ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাসিতার উপকরণ,—এক কথায় তাঁর ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতার মূলে ধান, আর ধানের মূলে চাষী। চাষী মোটা টাকা খাজনা দেয। সে টাকা এত বেশী যে, তা হইতে রাজস্ব দিয়াও জমিদারের হাতে প্রচুর অর্থ থাকে। এই অর্থ

হইতেই তাঁর ঐশ্বর্য্য ও প্রতিপত্তি। সাধারণত, ইহার কোন অংশ চাষীরা পায় না। এ পর্য্যন্ত ইহা জমিদারেরা নির্ব্বিবাদে ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

'এখন দেখা যাক্, চাষীরা কি পায়? চাষীরা যা পায়, তাতে হয়ত কোন প্রকারে মোটা ভাত, মোট কাপড়ের ব্যবস্থা হইয়া যাইত। কিন্তু চাষীরা ঋণগ্রস্ত। কারও কারও ঋণের পরিমাণ এত বেশী যে, তারা যা পায় তা ঋণশোধেই যায়,—নিজেদের জন্য আবার নূতন করিয়া ঋণ করিতে হয়। দ্বিতীয়ত, চাষীর পরিবারে ব্যারাম-পীড়া আছে, বিবাহ-মৃত্যু আছে। এই সব দফায় কিছু না কিছু খরচ করিতে হয়। তৃতীয়ত, সব বৎসর আর কিছু ভাল ফসল হয় না। দুর্ব্বৎসরে চাষীকে প্রায়ই ভুগিতে হয়। সুতরাং চাষীরা যে চিরদিন দুঃখ ও অভাবের মধ্যে থাকিবে, তাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? সুতরাং দাঁড়াইল এই, জমিদারকে শোধ করিয়া চাষীর যা থাকে, তা তার মোটা ভাত-কাপড়ের জন্যও যথেষ্ট নয়; অথচ জমিতে যা উৎপাদিত হয়, তা তারই শ্রমের ফল, এবং এই শ্রমের ফল পূরাপূরি ভোগ করেন জমিদার। জমিদার বাবুগিরি এবং উৎসব চালান, আর চাষী হাহাকার করিয়া মরে।

'চাষীর দাবী এই, সে মানুষের মত বাঁচিতে চায়। তার ভাত, কাপড় ও আশ্রয়ের যথোচিত বন্দোবস্ত হওয়া দরকার। দুর্ব্বৎসরের জন্য তার সর্ব্বদা কিছু সংস্থান প্রয়োজন। প্রত্যেক চাষীর ঋণ অল্প অল্প করিয়া যাতে শোধ হয়, সেজন্য ব্যবস্থা দরকার। চাষীর এই সামান্য অথচ অত্যাবশ্যক দাবী কটি মিটাইবার জন্য চাষী যা পায় তার চেয়ে বেশী পাইবার তার ক্ষমতা চাই। কিন্তু ইহাই কি যথেষ্ট? না। লক্ষ লক্ষ চাষী পশুর মত জীবন যাপন করে। শুধু ডাল ভাত, কাপড়, আশ্রয় পাইলে, দুর্দ্দিনের সংস্থান থাকিলে এবং ঋণ শোধ হইলে, চাষী পশু-জীবনের উপরে উঠিতে পারিবে না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আমোদ-প্রমোদ এবং জীবনের অন্যান্য ভাল জিনিষ তারা উপভোগ করিবার দাবী করে। এ দাবী অন্যায় নয়। দাবীর পূরণ ব্যতীত

তাদের মানুষ বলিয়া পরিচয় দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তা হইলে চাষীরাই বা কেন মানুষের মত বাঁচিবে না? সকলের আগে এই দাবী প্রত্যেক জমিদারকে মানিয়া লইতে হইবে।

'বাস্তবিক পক্ষে, জমিদারে ও প্রজায় কোন বিরোধ নাই। জমিদার ও প্রজার স্বার্থ বিপরীত নয়, এক। প্রজার কল্যাণ হইলে জমিদারের লাভ। সন্তুষ্ট, শিক্ষিত ও উন্নত চাষী স্বভাবত জমির যেরূপ উন্নতি করিতে সমর্থ, আজকের চাষী সেরূপ সমর্থ নয়। জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইবার সঙ্কেত সে জানে না। আমাদের দেশে এখন যত ফসল হয়, তার বহু গুণ হইতে পারে,—তা সে জানে না। কিন্তু এজন্য তাকে দোষ দেওয়া বৃথা। সে চাষবাসে মান্ধাতার আমলের প্রণালী অনুসরণ করিতেছে। এই সবই পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। হৃষ্টপুষ্ট ও সুখী ও শিক্ষিত চাষী হাতিয়ার, পুষ্ট বলদ ও নূতন অভিজ্ঞতার দ্বারা একেবারে যুগান্তর আনিতে পারে। স্বর্ণযুগ। আর তার ফল কি হইবে? ফল হইবে এই যে, জমিদার তাঁর খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, অথচ চাষীও আগের চেয়ে বহুগুণ বেশী ফসল পাইবে। সুতরাং লাভ উভয় পক্ষের। চাষীর সমস্যার সমাধান হইবে, জমিদারের মুনাফা বাড়িবে।

'জমিদারেরা চেষ্টা করিলে এই স্বর্ণযুগ অতি সহজে আনিতে পারেন। আপাতত তাদের কিছু ক্ষতি হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান স্বার্থত্যাগের পরিবর্ত্তে ভবিষ্যতে তাঁরা যা পাইবেন, তার দাম অনেক। প্রতি বৎসর জমিদারের মুনাফার অনেকখানি অপব্যয় হয়। কারণ, জমিদার তাঁর বিলাসিতায় ও অন্য প্রকারে কত না খরচ করেন। প্রথমত জমিদার যদি তাঁর সমুদয় ব্যয় এমনভাবে করিতেন যে, তাতে তাঁর প্রজারা উপকৃত হইত, তা হইলে বলিবার কিছু থাকিত না। জমিদার ত তাঁর নিজ এলাকার মধ্যে অর্থ ব্যয় করেন না। পরন্তু তিনি এমন স্থানে অর্থ ব্যয় করেন, যেখানে চাষী নাই এবং সেই অর্থ ব্যয় করিয়া এমন সকল জিনিষ কেনেন যে, তার কোন অংশ

চাষীরা পায় না। চাষীরা ধান জন্মায়। তাদের অন্য সমুদয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য বাহির হইতে কিনিতে হয়, নিজেরা উৎপাদন করে না। ধান ছাড়া অন্য জিনিষ বেচিলে যে লাভ হয়, তা চাষীদের কপালে জোটে না। সুতরাং জমিদার যত ব্যয় করুন, তা আর যার হাতে পড়ুক্, চাষীর হাতে পড়ে না। সুতরাং সোজাসুজি চাষীর হাতে কিছু তুলিয়া না দিলে তার তা পাইবার সম্ভাবনা নাই। সেই জন্য আমরা জমিদারকে বলি, আপনি আমাদের পক্ষে প্রয়োজন। আপনি আমাদের বাঁচান। চাষীদের বাঁচান। শেষ পর্য্যন্ত আপনার যে মুনাফা থাকে, তার অর্দ্ধাংশ চাষীদের দিন। চাষীদের দিন—এর অর্থ এই যে, তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ঋণ-লাঘবের ব্যবস্থা করুন।

'এই অঞ্চলের যিনি জমিদার, তিনি সহজেই আমাদের কথা বুঝিবেন। তুর্ভাগ্যবশত তিনি না বুঝিলে, আমাদের এজন্য ঘোরতর আন্দোলন করিতে হইবে। চাষী ভাইরা তাদের জন্মগত দাবীর পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত আন্দোলন করিবে এবং নিশ্চয় জয়যুক্ত হইবে।'

সব বক্তা আর কিছু একরূপ নয়। কেহ শান্তভাবে বলিতেছে, কেহ বা উগ্রভাবে নিজের মনের কথা প্রকাশ করিতেছে। আকাশে সাদা নিশান পত্ পত্ করিয়া উড়িতেছে। তাতে কিছু লেখা নাই। কেহ কোনরূপ জয়ধ্বনি দিতেছে না। তবু উৎসাহের আর অন্ত নাই। আবালবৃদ্ধবনিতা চিত্রাপিতবৎ সাদা ফৌজের কথা শোনে আর বলাবলি করে, ইহারা ত ঠিক কথাই বলিতেছে। কথাগুলি তীরের মত গিয়া তাদের বুকে বিঁধিতেছে। অথচ জমিদারের বিরুদ্ধে তাদের মনে কোন বিদ্রোহের ভাব জাগে না। জমিদারকে মান্য করা উচিত, বিশেষত নরেশের মত জমিদারকে,—এই শিক্ষা তারা পাইতেছে। এখন সমস্যা এই, কি করিয়া তাঁকে সাদা ফৌজের লোকদের কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যায়। নরেশ যদি বুঝেন, তা হইলে সব দিকে মঙ্গল।

নরেশকে বুঝাইবার লোকের অভাব ছিল না। সাদা ফৌজের বক্তৃতার

মর্ম্ম যথাসময়ে তার কানে গিয়া পৌছিয়াছে। সেদিনকার মত সে কিছুই বলিল না। ভাওয়াল সম্পত্তি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ সমস্ত বিবরণ জানিয়া লইল। প্রশ্নের পর প্রশ্নে আমলাদের ব্যস্ত করিয়া তুলিল। কোন কাজে সন্তোষ, কোনটায় বা অসন্তোষ প্রকাশ করিল। তারপর হুকুম দিল, কাল সকালে গ্রামের মাতব্বর কয়েক জনকে যেন ডাকিয়া কাছারি ঘরে লইয়া আসা হয়। তারপর সাদা ফৌজের সহিত সে কথা বলিতে চাহে। হউক তারা ভয়ানক লোক। হাঁ, সে একা সকলের সঙ্গে দেখা করিবে। আমলাদের সে সময়ে উপস্থিত থাকিবার দরকার নাই। শুধু বাহিরে শান্ত্রীরা পাহারা দিবে, কিন্তু কাহাকেও বাধা দিবে না।

পরদিন সকাল বেলা। জবাকুসুমসঙ্কাশ সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিগন্তে মাত্র উঁকি মারিয়াছেন। কাছারি ঘরের সম্মুখস্থ বিস্তীর্ণ প্রান্তর আলোয় আলোময় হইয়া গিয়াছে। গ্রীষ্ম-প্রভাতে প্রকৃতির এমন এক রমণীয় শোভা হইয়াছে যে, চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু ফেরান যায় না। কোন্ ঋতুতেই বা প্রকৃতি ঐশ্বর্য্যহীনা? আপনার অজ্ঞাতে নরেশের একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। গত রাত্রে তার সুনিদ্রা হইয়াছে। মন প্রফুল্ল। তবু নিঃশ্বাস পড়িল। এই বিশ্ব প্রকৃতি, একান্ত বাধ্য ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারিগণ, আর সে কাজের জন্য আসিয়াছে,—সবই তার কাছে অদ্ভুত লাগিল। কিসের পিছনে নরেশ এমন করিয়া দৌড়িতেছে? কি পাইলে তার জীবন ধন্য হইয়া যায়? তা সে নিজেই জানে না। তার একবার মনে হইল, তার জীবন-যাত্রার, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-আশা-আকাঙ্ক্ষার যেন কোন অর্থ নাই। তার ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিষ। গভীরতর কোন জিনিষ না পাইয়াই সে সংসারে ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছে। কিন্তু পরক্ষণেই সে মনের এই দুর্ব্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল। তার ঘরে আট দশজন মাতব্বর প্রজা আসিয়া আভূমি প্রণাম করিতেছে। নরেশ উঠিয়া সকলকে সাদর সম্ভাষণ করিল, 'এস, এস।' সে বুঝিতে পারিল, বাহিরে এক দিকে তার নিজের কর্ম্মচারীরা,

অন্য দিকে ভাওয়ালের বিস্তর প্রজা, আসিযা জমায়েত হইয়া ফিস্ ফিস্ করিতেছে। কৌতূহলের আর অন্ত নাই। এই অভিনয়ে নরেশের মনে মনে হাসি পাইল।

সে নিজের আসনে উপবেশন করিয়া দেখিতে পাইল, দলের মধ্যে একজন ভদ্রযুবা রহিয়াছে, অর্থাৎ তার বেশভূষা ও আচার ব্যবহার বলিয়া দিতেছে, সে চাষীদের একজন নয়। বয়স বছর পঁচিশ হইবে৭ নরেশ তার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিযা বলিল, 'সাদা ফৌজ দলের ? তা হলে একটু বাইরে দাড়াও। আমি একটু পরে সাদা ফৌজেব লোকদেব ডেকে পাঠাব। তখন তুমিও এসো। এখন যাও। আমি আগে এদের সঙ্গে কথা বলে নি।"

অন্যেরা বলিল, 'না হুজুর, ইনি সাদা ফৌজের নন, আপনার একজন প্রজা।'

নরেশ পুনরায় তার দিকে চাহিযা জিজ্ঞাসা করিল, 'চাষী"?'

দলের সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ ব্যক্তিটি জবাব দিল, 'নিজে চাষ করে না, পড়ে। বি. এ. পাশ করেছে। ওর বাপ দাদা, তার আগে চৌদ্দ পুরুষ, সবাই চাষ করে খেয়েছে।' সকলে হাসিল।

নবেশও হাসিল। মনে মনে যথেষ্ট চমৎকৃত হইয়া বলিল, 'চাষী নয়, তবে একে এনেছ কেন ? আমি শুধু আমার চাষী প্রজাব মুখের কথা শুনতে চাই।'

কয়েকজন সমস্বরে বলিয়া উঠিল, 'ওকে থাকতে দিন, হুজুর। আমাদেব সব কথা হয়ত গুছিয়ে বল্‌তে পারব না। তাই ওকে এনেছি। ও থাক্‌লে আমাদের সুবিধা হবে।'

ছেলেটি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছিল। নরেশ বলিল, 'আচ্ছা থাক্।' ছেলেটি ফিরিল।

নরেশ বয়সে প্রবীণতম লোকটির সাদা দাড়ির দিকে চাহিয়া বলিল, 'নাজিম, তুমি নিশ্চয় জান, আমি সদর থেকে কেন এসেছি, আর তোমাদের কেন ডাকিয়েছি।'

'জানি, হুজুর। আপনার তুলনা কোথাও হয় না। আপনার প্রজা বলেই আমাদের কিছু লুকাবার দরকার হয় না। আপনার সাম্‌নে এসে নির্ভয়ে মনের কথা বল্‌তে পারি—'

হাত দিয়া থামাইয়া নরেশ বলিল, 'সেইজন্যই বুঝি তোমরা সব খাজনা বন্ধ কর্‌বার আয়োজন কর্‌ছ? এটা হুজুরের প্রতি অশেষ ভালবাসার চিহ্ন, বুঝ্‌তে পার্‌ছি!' নরেশ তিক্ত হাসি হাসিল।

বৃদ্ধ ছেলেটির দিকে চাহিল। ছেলেটি হাত জোড় করিয়া বলিল, 'ভুল বুঝ্‌বেন না। আপনি যদি অনুমতি দেন, তা হলে সকলের হয়ে আমি বলি।'

নরেশ তার উপর পূর্ণ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া বলিল, 'বল।'

নরেশের নির্ভীক সপ্রশ্ন দৃষ্টির সম্মুখে সে যেন লজ্জিত হইয়া পড়িল। তথাপি তার বক্তব্য বলিল। তা এই যে, তাঁর প্রজারা তাঁকে কোন প্রকারে বিব্রত করিতে প্রাণে ক্লেশ অনুভব করে। তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করিবার মত কিছু নাই। কিন্তু আজ হোক্‌, কাল হোক্‌, জমিদারের সহিত প্রজার একদিন বিরোধ বাধিবেই।

কেন?

কারণ, অন্যত্র ত কথাই নাই, নরেশের মত সুশাসিত রাজ্যের প্রজাদেরও দুর্দ্দশার সীমা নাই। দুর্দ্দশাগুলি জলন্ত ভাষায় একে একে বর্ণিত হইল। ততক্ষণে ছেলেটির লজ্জার ভাব কাটিয়া গিয়াছে। সে উৎসাহের সহিত তার বক্তব্য বিষয় বুঝাইতে লাগিল। তারপর বলিল, 'কিন্তু আমরা ভাগ্যবান্‌। তাই আমরা আপনাকে জমিদাররূপে পেয়েছি। আমাদের আন্দোলনের ভিতরের কথা আপনি সহজে বুঝ্‌বেন ও ব্যবস্থা কর্‌বেন।'

নরেশ বলিল, 'আচ্ছা, সত্য করে বল ত, সাদা ফৌজ তোমাদের মধ্যে এসে তোমাদের উস্কাচ্ছে কি না।'

'আজ্ঞে, না। দোষ সাদা ফৌজের নয়। এভাবে আমরা অনেক দিন

ভাব্ছি। মনে মনে ভাব্ছি, আর ঈশ্বরকে ও জমিদারকে শাপ দিচ্ছি। সাদা ফৌজ সেই মনের কথাগুলি আমাদের বল্তে শিখিয়েছে। আর তা দূর কর্বার পথও দেখিয়েছে। পথটা তাদের দেখান। আমাদের সাহসে কুলাত না।'

'তোমার সত্য কথা বল্বার সাহস দেখে খুসী হলাম।' নরেশ হাস্য করিল। 'কিন্তু দেখ, পথ সকলে দেখাতে পারে না, এটা বোঝ ত। সাবধান থেকো, সাদা ফৌজ তোমাদের খানাডোবায় না নিয়ে যায়।'

তার কথা উপস্থিত সকলে বুঝিতে পারিল কি না কে জানে, কিন্তু একদৃষ্টে নরেশের দিকে তাকাইয়া রহিল। নরেশ তখন সকলকে একযোগে প্রশ্ন করিল, 'তোমরা কি চাও, বল ত ?'

'হুজুরের নায়েব কি আমাদের নিবেদন পেশ করেন নি ?'

'করেছে। কিন্তু আমি তোমাদের মুখে শুন্তে এসেছি, তোমরা কি চাও। শুধু নায়েবের মুখের কথা শুন্বার ইচ্ছা যদি আমার থাকৃত, তা হলে ঘোড়া ছুটিয়ে আমার এখানে আস্বার দরকার হত না। এখন তোমবা বল, কি চাও ? নাজিম তুমি বল, তুমি কি পেলে সন্তুষ্ট হও।'

নাজিমের অবস্থা ভাল। খাওয়া পরার ভাবনা নাই। যৎসামান্য ঋণ আছে। তা এই বৎসর সুফসল হওযায় শেষ হইয়া যাইবে। সুতরাং কেহ যদি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, আর কি পাইলে তুমি খুসী হও, তা হইলে তার পক্ষে উত্তর দেওয়া মুস্কিল হয় বৈ কি। তার কি নাই, তা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হয়। জমিদার স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তাঁর সহিত চালাকি করা যায় না। আর জমিদার নিজে জিজ্ঞাসা করিতেছেন বলিয়াই আরও মুস্কিল। তাঁর সম্মুখে মনের ভাব সব সময় গুছাইয়া বলাও সহজ নয়। কি বলিতে কি বলিবে, তার ঠিক কি ? সেইজন্যই ত লেখাপড়া জানা মীর কাসিমের পুত্রকে সঙ্গে আনা। সে তবু দুকথা গুছাইয়া বলিতে পারে। এমন কি, জমিদারকেও বলিতে পারে।

কিন্তু হুজুর হুকুম দিয়াছেন, নাজিমকে স্বয়ং উত্তর দিতে হইবে। বাস্তবিক, আর কি চাই? নাজিম তার মাথার সাদা চুলগুলি আলোড়ন করিতে লাগিল ও অসহায়ের মত মীর কাসিমের পুত্রের দিকে ঘন ঘন চাহিতে লাগিল।

মনে মনে হাসিয়া নরেশ গম্ভীরভাবে মীর কাসিমের পুত্র ব্যতীত আর সকল মাতব্বরকে একই প্রশ্ন করিল। কিন্তু সকলের এক দশা। কেহ কেহ দু-একটা অভাবের উল্লেখ করিল। কিন্তু তা বড়ই ছেলেমানুষি শুনাইল এবং অন্যেরা তাতে হাসিল। নরেশ না হাসিয়া প্রতীকার করিবে বলিয়া জানাইল।

কারও কাছে উত্তর না পাইয়া নরেশ তখন হাসিয়া বলিল, 'আমি জানি, তোমরা কি চাও।' সকলে তার দিকে তাকাইল। 'তোমরা আমার গোটা জমিদারিটাই চাও।'

প্রথমে নাজিম ও অন্য সকলে ইহা ঠাট্টা মনে করিয়া হাসিবার উপক্রম করিয়াছিল, কিন্তু নরেশ যখন পরক্ষণেই বলিল, 'তোমরা চাও, আমার যা ঐশ্বর্য ও সম্পত্তি আছে, সব তোমাদের বিলিয়ে দি। এরই জন্য তোমাদের এত অসন্তোষ। আমি জমিদার হয়ে জন্মেছি, তোমরা চাষী হয়ে জন্মেছ। কিন্তু সেটা আর কিছু আমার দোষ নয়। এই জন্মের অপরাধে তোমরা আমার কাছ থেকে সব কেড়ে নিয়ে আমাকে তোমাদের সমান করতে চাও, এই না?' তখন তাদের হাসি মিলাইয়া গেল এবং তারা প্রমাদ গণিল। সাদা ফৌজের লোকেরাও এমনতর কথা অত স্পষ্টভাবে বলে নাই। নাজিম ও আর সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিল, 'না, না, না। হুজুর, ঈশ্বর সাক্ষী, আমাদের মনে এমন কথা কখনও উঠে নাই।'

নরেশ বলিয়াই চলিল, 'দেখ, আমি একটা মানুষ মাত্র। জমিদারই হই, যাই হই, তোমাদেরই মত মানুষ। একটা মানুষ যদি সত্যি সত্যি এতগুলি, হাজার হাজার, মানুষের অসুখ ও অশান্তির কারণ হয়, তা হলে তার এ জগৎ থেকে বিদায় নেওয়াই ভাল। সে নিজে যেতে না চাইলে

তাকে জোর করে বিদায় করে দাও। আবও দেখ, আমার স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, আত্মীয়-স্বজন কেউ নাই। আমাকে যদি তোমরা সংসার থেকে বিদায় করতে পার, তা হলে আমার এই সব অর্থ ও সম্পত্তি তোমরাই ভোগ করতে পারবে। তা হলে দাঁড়াল এই, আমি তোমাদের পথের কাঁটা। এই কাঁটা সরাবার উপায়ও আমি বলে দি তোমাদের। আজ আমি সন্ধ্যার পর একা বেড়াব, শান্ত্রী প্রহরী বা অন্য কোন লোক সঙ্গে থাকবে না। আমার পিছনে পিছনে তিন চারজন গিয়ে আমার চোখ বেঁধে ফেলো। তারপর আর খুন করতে কতক্ষণ লাগে? তোমরা নিষ্কণ্টক হবে।' নরেশের মুখের চেহারা ভীষণ হইয়া উঠিল।

মাতব্বরগণ একেবারে অবাক্, হতভম্ব। চেতনা হইলে সকলে জিভ্ কাটিয়া আভূমি প্রণত হইয়া বলিল, 'ছি ছি, হুজুব এ সব কি বলছেন? আর এই সব বলে কেন আমাদের পাপের ভাগী করছেন? এমন কথা শুনলেও পাপ হয়। আপনার জমিদারিতে প্রত্যেক লোক শপথ কবে বলবে, সে চায় না আপনার পায়ে কাঁটাটুকু বিঁধুক। আপনি এমন সব কথা বলে আমাদের মনে আর কষ্ট দেবেন না। আমরা যদি না বুঝে আপনার মনে কষ্ট দিয়ে থাকি, তা হলে আমাদের ক্ষমা করুন। সাদা ফৌজ আমাদের কেউ নয়। আপনি আমাদের সব।'

নরেশ উঠিয়া আসিয়া একে একে সকলকে হাত ধরিয়া উঠাইল। তারপব শান্তস্বরে বলিল, 'তোমরা বিশ্বাস কর, তোমাদের কথা আমি এক মুহূর্ত্ত ভুলে থাকি না। তোমরা কি চাও, তোমরা জান না। কিন্তু আমি জানি, তোমাদের কি চাই। আমি তোমাদের উন্নতির জন্য সকল রকম চেষ্টা করছি, তা তোমরা জানতে পারবে।'

মাতব্বরেরা বিদায় গ্রহণ করিলে সাদা ফৌজের কয়েকজন প্রবেশ করিল। নরেশের যেমন কায়দা, উঠিয়া যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া তাদের বসাইল। একদল তরুণ যুবক। সর্ব্বাঙ্গ শুভ্র পরিচ্ছদে আবৃত। ইহাদের

দিকে তাকাইলে চোখ জুড়াইয়া যায়। সম্ভাষণাদির পর কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া নরেশ বলিল, 'আপনাদের কাজের কথা সব শুনেছি। নিজেদের সুখ ও আরামের দিকে না চেয়ে যে ব্রত নিয়ে আপনারা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আমার শুভ ইচ্ছা তার পিছনে রইল। দরকার হলে, আমার কাছে যা সাহায্য চাইবেন দেব। সে কথা যে সত্য, তার প্রমাণস্বরূপ আমি আমার নিজের জমিদারিতে আপনাদের কল্পনা কাজে খাটাব। আমার জমিদারির লাভের অর্দ্ধাংশ প্রজাদের হাতে দেব না। কার হাতে দেব? যার বা যাদের হাতে দেব, তারা যে দুদিনে অন্যায়ভাবে উড়িয়ে দেবে না, তার কোন নিশ্চয়তা নাই। সেই টাকা আমিই ওদের জন্য খরচ করব। আপনাদের স্বপ্ন আমি আমার জমিদারিতে সফল করে তুল্‌ব। কিন্তু সেজন্য আমি কিছু সময় চাই। আপনাদেব কল্পনাকে সত্য করতে হলে অন্তত পাঁচ বৎসরের অবিশ্রান্ত চেষ্টা ও যত্ন চাই। আমি আপনাদের কাছে মিনতি কর্‌ছি, সেই সময়টুকু আমাকে দিন। তারপর আপনারা পরীক্ষা করে দেখ্‌বেন, আমি আমার কথা বেখেছি কি না, দেশের জন্য কিছু করেছি কি না। আমিও দেশকে ভালবাসি। আমাকে শুধু তা নিজের মত করে প্রকাশ কর্‌বার সুযোগ দিন।'

নরেশের স্বর অনুনয়ে ভরা। কে বলিবে, সে এ অঞ্চলের মালিক এবং ইচ্ছা করিলে সাদা ফৌজের লোকদের যে কোন মুহূর্ত্তে দূব করিয়া দিতে পারে? ইহা অবিশ্বাস্য হইলেও সত্য। এরূপ অবস্থায় সাদা ফৌজ বিব্রত বোধ করিবে, তাতে আশ্চর্য্য কি? নরেশ সময় চাহিতেছে। হয়ত সে সত্য সত্যই তাদের আদর্শ কাজে খাটাইবে। অথবা যদি না খাটায়, তা হইলে এখন কিছু করিবার নাই। অন্তত, কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, নরেশ কি করে। নরেশকে উপদেশ দিবারও কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, সে যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ; নিজের পথ নিজে বাছিয়া লইতে পারিবে।

নরেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনাদের সম্বন্ধে কোন কোন বিষয়ে কৌতূহল দেখাতে পারি কি ?'

'স্বচ্ছন্দে।'

'আপনাদেব এই দল কত দিন গড়েছেন ? আপনারা কি শুধু আমার জমিদারিতেই কাজ করছেন, না অন্য জমিদারিতেও করছেন ? আপনাদের কথা এতদিন কোন কাগজে পড়ি নি, আপনাদের কার্য্যকলাপেব কথাও শুনি নি, এর মানে কি ?'

এক সঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন! সাদা ফৌজ হাসিল। দলেব সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ যুবকটি উত্তর দিল। না, তাদেব দল নূতন নয়। আজ পনের বৎসরের অধিক কাল তাদের দল গঠিত হইযাছে। এই দল যেমন শক্তিশালী, তেমন বিস্তৃত। সমগ্র ভারতে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে সাদা ফৌজের লোকেরা কাজ করিতেছে না। বাংলা দেশেব গ্রামে গ্রামে সাদা ফৌজ দেখা যাইবে। কিন্তু সাদা ফৌজ খবরের কাগজেব সাহায্যে নিজেদের অথবা নিজেদেব কাজেব বিজ্ঞাপন দিতে ঘৃণা বোধ করে। সাদা ফৌজের কেহ কাজে ফাঁকি দেয় না, কিন্তু তারা সস্তায নাম কিনিতে নারাজ। তারা কোন কাজই লুকাইযা করে না। কারণ, কোন বিষযে তারা পরমুখাপেক্ষী নহে এবং কাহাকেও ভয করে না। দুর্জ্জয প্রতিজ্ঞা ও সাহস লইয়া তারা কাজে নামিয়াছে। ভগবান্ নিশ্চয় তাদের উদ্দেশ্য সফল করিবেন। কিন্তু কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইলে সফলতায় বাধা জন্মে। অহংকার পথরোধ করে।

সাদা ফৌজের কাজটা কি ? উদ্দেশ্যই বা কি ?

সাদা ফৌজের কাজ এক প্রকার নয়। বিভিন্ন স্থানে ও সময়ে বিভিন্ন প্রকার। কিন্তু যদি এক কথায় সাদা ফৌজের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতে হয়, তা হইলে বলিতে হয়, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা সাদা ফৌজের উদ্দেশ্য। কিন্তু এ শান্তি মৃতের শান্তি নয়, প্রাণময়, জীবন্ত ও জীবনের আগ্রহে ভরপূর মানবদের মধ্যে শান্তি। যেখানে যত অন্যায়,

অবিচার, মিথ্যা আছে, সমূলে উৎপাটন না করিলে সেখানে শান্তি আসিতে পারে না। ভীরুর শান্তি সাদা ফৌজেব কাম্য নয়। সুতরাং মানুষের সমাজে যেখানে যত প্রকার সংগ্রাম আছে, সবগুলিই সাদা ফৌজের কর্ম্মক্ষেত্র। নরেশের জমিদারিতে এবং অন্য অনেক জমিদারিতে প্রজারা দারিদ্র্য, ব্যাধি, ঋণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির অভাব এবং অনেক কিছুর বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম কবিতেছে। যেখানে লোকেরা সংগ্রাম করে না, সেখানে তাদের সংগ্রাম করিতে শিক্ষা দিবার ভার সাদা ফৌজ লইয়াছে। আর যেখানে তারা সংগ্রাম করিতেছে, সেখানে সাহায্য করে। কিন্তু এই সাহায্য করার অর্থ জমিদারে-প্রজায় লাঠালাঠি ও রক্তপাত নয়। সাদা ফৌজের অস্ত্র শুধু হাত, মুখ ও মুখের কথা। সাদা ফৌজ প্রত্যেক জমিদারকে তাদের ভাবে ভাবুক কবিতে চায়, কিন্তু ভয় দেখাইয়া নহে, জোর করিয়া নহে। পরন্তু তারা এমন আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে চায়, যাতে জমিদার বুঝিতে পারেন, তাঁর প্রজার কল্যাণের জন্য তিনি নিজেকে যত অধিক নিযোজিত করিবেন, তত তাঁব নিজের লাভ বেশী হইবে। এই কথার সত্যতা নরেশ নিজেই বুঝিতে পারিবেন। সুখী ও পরিশ্রমী চাষীদের দ্বারা তিনি নিজের ঐশ্বর্য্য বহুগুণ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। চাষী শিক্ষিত ও সন্তুষ্ট হইয়া নিজের চিরাচরিত পথ ত্যাগ করিবে, এ শিক্ষা সাদা ফৌজের নয়। সাদা ফৌজ বলে, শ্রম মাত্রই মর্য্যাদা লাভের যোগ্য ; এবং শ্রমিকের যোগ্যতা তার সামাজিক মর্য্যাদা নির্দ্দেশ করিবে। অন্য দিকে, সাদা ফৌজ প্রত্যেক কার্য্যকে স্বাস্থ্যকর ও আনন্দময় করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। মানুষের মনের ভাবকে নূতন একটা রূপ দিবার চেষ্টায আছে। তার ফলে, প্রত্যেক কার্য্য সুন্দর হইযা দেখা দিবে ও শ্রমিককে আকৃষ্ট করিবে। অলসতা ও পরনির্ভরতার বিরুদ্ধে সাদা ফৌজ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। অলসতা পাপ। নরেশের এ কথা মনে করিবার কোন হেতু নাই, সাদা ফৌজ শুধু জমিদারদের অনুষ্ঠিত অন্যায়কে আন্দোলন দ্বারা দূর করিতে চায়। সাদা ফৌজ

চাষীদের মধ্য হইতে অজ্ঞতা, অলসতা, প্রতারণা ও অন্যান্য দোষ দূর করিবার জন্যও তুল্যরূপ চেষ্টিত রহিয়াছে। অর্থাৎ তাদের আন্দোলন জমিদার বা অন্য কোন শ্রেণীর বিরুদ্ধে নয়। তারা জমিদার বা ধনি-সম্প্রদায়কে পরগাছা বা দেশের পক্ষে অনাবশ্যক বলিয়া মনে করে না। বরং সমাজ-ব্যবস্থায় তাঁদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। কিন্তু সাদা ফৌজ প্রত্যেক মানুষের চোখের দৃষ্টি বদ্‌লাইয়া দিতে চায়। কাহাকেও অনাবশ্যক প্রশ্রয় দিতে চায় না। সুতরাং জমিদার-চাষী, মালিক-মজুর, শিক্ষক-ছাত্র, ধর্ম্মভীরু-নাস্তিক, হিন্দু-মুসলমান,—সকল রকম মানুষের মধ্যেই সাদা ফৌজের অনন্ত কাজ পড়িয়া রহিয়াছে। সাদা ফৌজ কোন মানুষকে উপেক্ষা করে না, আবার কাহাকেও অসম্ভব মর্য্যাদা দেয় না।

সাদা ফৌজ জগতে শান্তি-প্রতিষ্ঠার ব্রত লইয়াছে। কিন্তু প্রয়োজনটা কি?

প্রয়োজন এই যে, পূর্ণ শান্তিময় অবস্থা ব্যতীত মানুষ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির দিকে মনোযোগ দিতে পারে না। সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির অর্থও সংগ্রাম—অবিরত সংগ্রাম। সংগ্রাম কবিবার মত বস্তুর কি অভাব আছে? অভাব, দারিদ্র্য, শিক্ষাহীনতা, রোগ, আরও কত নাম করা যায়। তারপর প্রকৃতিকে বশ করিয়া তার নিকট হইতে কাজ আদায় করিয়া লইতেও কি কম সংগ্রাম করিতে হয়? কিন্তু এই সকল সংগ্রামের জন্য মানুষের সহিত মানুষের পূর্ণ সদ্ভাব থাকা প্রয়োজন। মানুষ তার পরিবারে বা সমাজে বা রাষ্ট্রে যদি সর্ব্বদা পরস্পর সংগ্রামে লিপ্ত থাকে, তা হইলে এই সব সংগ্রামের জন্য তার আর কোন শক্তি উদ্বৃত্ত থাকে না। মানুষের চারিদিকে এই শান্তির আব্‌হাওয়া সৃষ্টি করিবার ব্রত সাদা ফৌজ লইয়াছে। এই শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হইলে মানুষের পক্ষে মহত্তর কোন কাজই করা সম্ভবপর নহে। মানুষের উন্নতি লাভের জন্য শান্তি প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য সাধনে সাদা ফৌজ কোন ক্লেশকে ক্লেশ জ্ঞান করে না এবং কোন প্রকার স্বার্থত্যাগে পশ্চাৎপদ নয়। তাদের আশা আছে, একদিন নরেশ স্বয়ং সাদা ফৌজে যোগদান করিবে।

সাদা ফৌজের কথাবার্ত্তায় চমৎকৃত হইবার অনেক কিছু থাকে। নরেশ তজ্জন্য প্রস্তুত ছিল। তথাপি সে ইহাদের কার্য্যপ্রণালীকে মনে মনে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না।

সাদা ফৌজ বিদায় লইয়া চলিয়া যাইবার পর নরেশ তার নায়েবকে নিভৃত কক্ষে আহ্বান করিল। সে তার মুখের দিকে চাহিয়া সোজা প্রশ্ন করিল, 'সাদা ফৌজ ত আমার অনিষ্ট কর্‌তে চায় না। তবে এদের তাড়াবার জন্য তুমি পুলিশের সাহায্য নিতে চেয়েছিলে কেন?'

'সাদা ফৌজ হুজুরের হিতকামী, ঠিক একথা বলা চলে না।'

'কেন?'

'প্রথমত, চাষীদের তারা আন্দোলন করাতে শেখাচ্ছে।'

'শেখাক্ না।'

নায়েব বিস্মিতভাবে নরেশের দিকে তাকাইল। 'আপনি এটা বুঝ্‌ছেন না যে, তারা এর পর কারণে-অকারণে আন্দোলন কর্‌বার সাহস পাবে।'

'কিন্তু সাদা ফৌজের কথা এই, তারা ত জমিদারের বিরুদ্ধে চাষীদের ক্ষেপাচ্ছে না। বরং তারা জমিদারি প্রথার অত্যন্ত পক্ষপাতী।'

'মুখে তারা তাই বলে বটে।'

'কিন্তু অন্তরের কথাও ত তাই বলে মনে হয়।'

'মাপ কর্‌বেন। শেষ পর্য্যন্ত না দেখা অবধি কিছুই বলা যায় না।'

'আচ্ছা, ধরে নিলাম, তারা পরে আমার বিরুদ্ধতা কর্‌বে। কিন্তু যতক্ষণ না কর্‌ছে, ততক্ষণ এমন আচরণ কেন করি, যাতে তারা শত্রু হয়ে দাঁড়ায়?'

'আপনাকে আমি কি বোঝাব? শত্রুকে কখনও বাড়্‌তে দেওয়া উচিত নয়। সত্যই যদি তারা শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে তাদের একেবারে গোড়াতেই নিপাত করা দরকার।'

'বুঝ্‌লাম; কিন্তু করবে কি করে?'

'সেই ত সমস্যা। সাধারণ শত্রুকে পুলিশের সাহায্য নিয়ে জব্দ করতে

পারি। গুপ্ত শত্রুকেও খুঁজে বের করবার উপায় আছে। কিন্তু সাদা ফৌজ এসেছে মিত্র বেশে, এসেছে নিরস্ত্র। তাই ত তাকে নিয়ে কি করব, বুঝি না। পুলিশের সাহায্য নিয়ে এমন ব্যবস্থা করতে পারি যাতে তারা আর হুজুরের জমিদারি এলাকায় না ঢুকতে পারে। কিন্তু সেটা হয়ত ঠিক হবে না।'

নরেশ সায় দিল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, আমার জমিদারিতে প্রত্যেক গ্রামে ইস্কুল আছে কি ?'

'হাই ইস্কুল কোন কোন গ্রামে আছে, মাইনর ইস্কুল প্রতি গ্রামে আছে।'

'মেয়েদের ইস্কুল ?'

'একটা হাই ইস্কুল, একটা মাইনর ইস্কুল ও কয়েকটি প্রাইমারি ইস্কুল আছে।'

'যে গ্রামে মেয়েদের ইস্কুল আছে, সেখানে সব মেয়েরা কি ইস্কুলে যায় ?'

'আজ্ঞে না। অধিকাংশই যায় না।'

'ছেলেদের কি রকম অবস্থা ?'

'হিন্দু ছেলেরা প্রায়ই যায়। মুসলমানদের মধ্যেও আজকাল উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। তবে ইস্কুলে যায় না এমন ছেলেও বিস্তর আছে।'

'ডাক্তার ও ডাক্তারখানা আছে ?'

'আজ্ঞে, ডাক্তার প্রত্যেক গ্রামেই আছে। কবিরাজও। কোথাও কোথাও একাধিক আছে।'

'হাসপাতাল ত কোথাও নাই।'

'আজ্ঞে না।'

'মেয়ে ডাক্তারও নাই, নার্স নাই, শিক্ষিতা দাই নাই।'

'আজ্ঞে না।'

'রাস্তা ঘাটের অবস্থা কি রকম ?'

'আজ্ঞে, পূর্ব্ব বাংলার রাস্তা ঘাটের কথা আপনাকে নূতন করে কি বলব ? এমন একটা ঘাট নাই যা ভাঙ্গে নি। আর রাস্তা ত রাস্তা নামের যোগ্য নয়।'

'জঙ্গলে পূর্ণ, না ?'

'আজ্ঞে হাঁ।'

'পুকুরগুলি সব মজে গেছে। পানা বা ময়লায় ভর্ত্তি। কূয়া নাই।'

'আজ্ঞে হাঁ।'

'গোয়ালে গরু নাই। অথবা যাদের আছে, অস্থিচর্ম্মসার। বলদগুলি একেবারে মুমূর্ষু।'

'আজ্ঞে হাঁ।'

নরেশ চুপ করিয়া ভাবিল। তারপর নায়েবকে হুকুম দিল, 'আমি পরিদর্শনে বেরুব। হেঁটে। আয়োজন কর।' নায়েব 'যে আজ্ঞে' বলিয়া প্রস্থান করিল। যাইতে যাইতে সে শুনিতে পাইল নরেশ বলিতেছে, 'কি আশ্চর্য্য ! আমার জমিদারির কথা আমি কত কম জানি।'

১০

নরেশ তার মফস্বলের শফর শেষ করিয়া নারায়ণগঞ্জে ফিরিয়া আসিয়াছে। এখান হইতে যখন রওনা হয় তখন তার বাসনা ছিল, ভাওয়ালের কাছারিতে দু-চারি দিন থাকিয়া ও প্রজাদের অভাব-অভিযোগ শুনিয়া সে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু তারপর তার রোখ চাপিল, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সে তার প্রজাদের প্রতিদিনকার আটপৌরে জীবন-যাত্রা স্বচক্ষে দেখিবে। তার কর্ম্মচারীরা মনে করিল, বাবুর খেয়াল; দুদিন কষ্ট ভোগ করিয়া বাড়ী পলাইয়া যাইবার পথ পাইবেন না। কিন্তু দুদিন নয় মাসাধিক কাল নরেশ ঘুরিয়া বেড়াইল। তার উৎসাহ ও পরিশ্রম করিবার শক্তি দেখিয়া সকলে অবাক্। তার কর্ম্মচারীরা বরং ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু সে কখনও ক্লান্তি অনুভব করে না। দিনের পর দিন নৌকায় নৌকায় ঘুরিল, কত কাদা ভাঙ্গিল, কত পথ হাঁটিল। সবই তার ভাল লাগে। এমন এক

অদ্ভুত নেশা নরেশকে পাইয়া বসিয়াছে যে সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছে না, কি সে করিতেছে এবং কেন করিতেছে।

সর্ব্বত্র সে তার প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিল। কিন্তু তাই সব নয়। সে যেখানে যায় সেখানেই জমিদারকে দেখিবার জন্য ভীড় জমিয়া উঠে। তার নায়েব বা অন্য কর্ম্মচারীরা বাধা দিতে চাহিলে সে অসন্তুষ্ট হয়। বলে, আহা, আসিতে দাও। কর্ম্মচারীরা তার জন্য বিশেষ আযোজন বা সাবধানতা অবলম্বন করিতে গেলে সে হাত দিয়া ঠেলিয়া বলে, দরকার নাই। তার সদাপ্রফুল্ল মুখ আরও প্রসন্ন দেখায়। তা ছাড়া সে আরও একটা কাজ করে যা, স্বপ্নেও কেহ ভাবে নাই, সে করিবে। সেও না। সে গ্রামবাসীদের নিকট অত্যন্ত আড়ম্বরহীনভাবে তাদেরই মত সরল ভাষায় বক্তৃতা করে। তার বক্তৃতার বিষয় প্রায় সর্ব্বত্র এক। সে জমিদারির স্বপক্ষে কোন প্রকার ওকালতি করে না। সে যে জমিদার একথা মুখে উচ্চারণ পর্য্যন্ত করে না। সাদা ফৌজের নামও মুখে আনে না। সাদা ফৌজের বিরুদ্ধে প্রচার চালান তার কাজ নয়। যাদের অভিরুচি তারা চালাক্। নরেশের বলিবার মত কথা অনেক আছে। বস্তুত, নরেশ আগে কোন দিন ভাবিতে পারে নাই, তার প্রজাদের নিকট তার এত বলিবার কথা ছিল। বরং, সে এই শিক্ষাই পাইয়াছে, এবং এইরূপ ভাবিতে অভ্যস্ত যে, প্রজাদের নিকট তার বলিবার কিছুই নাই। কি বা থাকিতে পারে? তার সঙ্গে প্রজাদের খাজনা আদায় ছাড়া আর সম্পর্কটা কি? প্রজাদের সুখদুঃখ, ভালমন্দ বিষয়ে সে হয়ত উদাসীন নয়, অন্তত তার উদাসীন হওয়া উচিত নয়, কিন্তু তা লইয়া আর কত কথা বলা যায়? আর কাহাকে বলিবে সে? যা বলিবার চিরকাল ত তার কর্ম্মচারীরাই বলিয়া আসিযাছে। কিন্তু তার হাজার হাজার প্রজাকে এত কাছে দেখিবার সুযোগ ইতিপূর্ব্বে তার আর হয় নাই। কচিৎ কখনও হয়ত হইয়াছে, কিন্তু দিনের পর দিন নয়। আর ইহাদের দেখিয়া আপনা হইতে তার কণ্ঠে বাণী আসে। সে সকলকে

সম্বোধন করিয়া বলে, তারা ভাল খাওয়া, পরা ও বাড়ীর চেষ্টা করিলে সেও তাদের সাহায্যে আসিবে। তার একমাত্র প্রার্থনা এই যে, কেহ অলস হইয়া কাল কাটাইবে না, তা হইলে প্রত্যেকে যথাযোগ্য পুরস্কার লাভ করিবে। পরস্পর ঝগড়া দলাদলি ভুলিয়া যদি একত্র কাজে প্রবৃত্ত হয়,—সে কাজ শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা অন্য যা কিছু হোক্,—তা হইলে তারা কি না করিতে পারে? তারা ভগবান্ বা অদৃষ্টের দোহাই দিয়া এতকাল এমন বহু দুঃখ ও ক্লেশ বরণ করিয়া লইয়াছে যা দূর করা অসম্ভব নয়। বস্তুত, দারিদ্র্য-দুঃখকেই দেশ হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত করা যায়। সেজন্য প্রথমত দরকার, কেহ ফাঁকি দিবে না। দ্বিতীয়ত দরকার, নিজেদের মধ্যে মারামারি, মোকদ্দমা ইত্যাদি করিয়া শক্তিক্ষয় করিবে না। তৃতীয়ত দরকার, বাড়ীর প্রত্যেক ছেলে ও মেয়েকে পাঠশালে পাঠাইবে এবং যতদূর পর্য্যন্ত পড়ান সম্ভব পড়াইবে। নিরক্ষরতার চেয়ে লজ্জাজনক জিনিষ আর কিছুই নাই। পৃথিবীর যে কোন সভ্যদেশের দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে, কিরূপ দ্রুতবেগে শিক্ষার প্রসার হইতেছে। শিক্ষার উন্নতি না ঘটিলে দেশের কোন প্রকার উন্নতি সম্ভব নয়। দেশের স্বাস্থ্য বল, কুসংস্কার বর্জ্জন বল, যে প্রকারে দেশের সেবা করিতে যাও না, তার মূলে রহিয়াছে শিক্ষা। শিক্ষা ভিন্ন কোন কাজে অগ্রসর হওয়া যায় না। প্রত্যেক লোককে চেষ্টা ও যত্ন করিয়া তার নিয়মিত আয় বাড়াইতে হইবে, বাড়ীঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর করিতে হইবে এবং সর্ব্বপ্রকারে ভালভাবে বাস করিতে হইবে।

নরেশ তার প্রজাদের মনে এই কথাটাই বার বার ভাল করিয়া মুদ্রিত করিবার চেষ্টা করিল যে, তাদের সব কিছুই করিবার সামর্থ্য আছে। দরকার শুধু ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের ও আলস্য পরিহারের। তার নিজের অর্থ ও সামর্থ্য কিসের জন্য? তা যদি তাদের কাজে না লাগে তা হইলে সে তা ব্যর্থ মনে করিবে। প্রজাদের সুখী ও সন্তুষ্ট রাখা সে জীবনের

ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। তাদের উন্নতিকর সকল কাজে হাত দিতে বা সাহায্য করিতে সে সর্ব্বদা প্রস্তুত। কিন্তু অলস ও দুর্ব্বলদের সে সাহায্য করিবে না। যারা নিজ অভাব অনটন দূর করিতে উদ্যোগী, তারাই শুধু তার স্নেহ ও সহায়তা লাভ করিবে,—অন্যেরা নহে। কি করিয়া কাজ আরম্ভ করিবে, জানিতে চাহিলে, তার কর্ম্মচারীরা সানন্দে দেখাইয়া দিবে। তাদের হুকুম দেওয়া আছে। তার প্রজারা শিক্ষায়, দীক্ষায়, স্বাস্থ্যে অগ্রসর হইবে, অর্থাৎ প্রত্যেকে শুধু লিখিতে পড়িতে জানিবে তা নয়, এমন পড়াশুনা করিবে যাতে খবরের কাগজ ও বাংলা বই অনায়াসে পড়িতে পারে, ইংরেজিও একটু একটু বোঝে; ধর্ম্মে মতি থাকিবে, আর সেইজন্য অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের শ্রদ্ধার চোখে দেখিবে, ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যময় নিটোল শরীরগুলি দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যাইবে; যার অবস্থা যে রকম হোক্ প্রত্যেকে নিজের বসতবাটি যতদূর সম্ভব সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও সুখময় করিবে; চারিদিকের জঙ্গল পরিষ্কার করিবে; পুকুরগুলি হইতে কচুরীপানা তুলিয়া ফেলিয়া দিবে, দরকার হইলে পুকুর কিংবা কূয়া কাটাইবে, রাস্তাঘাট মেরামত করিবে;—কাজের কি আর অন্ত আছে? খুঁজিলেই অসংখ্য কাজ পাওয়া যায়,—ইহার চেয়ে আহ্লাদের বিষয় আর কি হইতে পারে? নরেশ প্রজাদের কাছে ইহা অপেক্ষা বেশী কিছু আশা করে না।

হাজার হাজার লোক, ছেলে বুড়া, নরেশের কথা শুনিতে আসে। তারা শব্দমাত্র না করিয়া চিত্রাপিতবৎ তার কথা শোনে। স্বয়ং জমিদার তাদের গায়ে গা লাগাইয়া, তাদেরকে উদ্দেশ করিয়া, রোদে অথবা কাদায় দাঁড়াইয়া, কথা বলিতেছেন, সরল গ্রামবাসীর পক্ষে ইহার চেয়ে বড় ঘটনা পৃথিবীতে আর কিছু থাকিতে পারে না। সে আর সব কিছু ফেলিয়া বা ভুলিয়া তাঁর কথা শুনিতে ছোটে। এমন কি, মেয়েরাও ঘোমটা দিয়া দূরে দাঁড়াইয়া বক্তাকে দেখে। এই রকম নিঃশব্দ অথচ অত্যন্ত মনোযোগী অসংখ্য শ্রোতা নরেশ জীবনে কোন দিন পায় নাই। তার অত্যন্ত উৎসাহ হয়। এই উৎসাহে

সে নিজের সুখ-লালিত অভ্যস্ত জীবন-যাত্রার কথা ভুলিয়া যায়। দেশের অবস্থা, লোকদের দারিদ্র্যের কথা সে পূর্ব্বে জানিত না, তা নয়। কিন্তু দূর হইতে জানা এক কথা, আর সম্মুখে আসিয়া জানা অন্য কথা। কিন্তু যা তার মনকে নিরতিশয় পীড়িত করে, তা তাদের দারিদ্র্য নয়। দারিদ্র্যের নগ্ন আকৃতি সকল দেশেই দুঃখদায়ক। ইহাদের মুখে চোখে অশনে বসনে সেই দারিদ্র্যের ছাপ রহিয়াছে। কিন্তু ইহাদের অনেকের নৈতিক অধঃপতিত জীবন নরেশের পক্ষে আরও দুঃখ ও কষ্টের কারণ। নরেশ জানে, তার নিজের আধ্যাত্মিক জীবনের সুর খুব উচ্চ গ্রামে বাঁধা নয়, এবং অপরকে এ বিষয়ে তার কিছু বলা উচিত নহে। বস্তুত, সে বলেও না। তথাপি লোকে কি করিয়া অন্যের দুঃখের মাত্রা বাড়ায়, তার পরিচয় সে এই প্রথম পাইল। আর এ বিষয়ে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকদের চেয়ে উচ্চশ্রেণীর লোকেরা বেশী অপরাধী। বলিতে কি, এই নিম্নশ্রেণীর লোকেরা, হিন্দু ও মুসলমান, উচ্চতর শ্রেণীর লোকেদের সামাজিক রীতিনীতি অনুকরণ বা অনুসরণ করিয়া থাকে।

এক স্থানে এক দলপতির সম্বন্ধে খোঁজ নিয়া জানিল, সে স্ত্রীকে কাছে রাখে না, বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, 'স্ত্রীর সঙ্গে কি বনিবনাও হয় না? স্ত্রী কি বদ্‌রাগী?'

'তা নয়।'

'তবে স্বামী বদ্‌রাগী?'

'তাও নয়।'

'তবে?'

উত্তরদাতা নরেশের কর্ম্মচারী। মুখ নীচু করিয়া থাকে। নরেশ আশ্চর্য্য হয়। পুনরপি জিজ্ঞাসা করে, 'জোয়ান মত তার বাড়ীতে একটি ছেলে দেখ্‌লাম, না?'

'তার ছেলে নয়।'

'কার ছেলে তবে? ও বাড়ীতে থাকে কেন? জন খাটে বুঝি?'

'আজ্ঞে না।'

'কি করে?'

'আজ্ঞে, কিছু না। অম্‌নি থাকে।'

'অম্‌নি থাকে!'

'হাঁ। কারণ ওর মা থাকে।'

'আমাকে লুকিও না কিছু। বল ত, ব্যাপারটা কি।'

'হুজুর, অপরাধ নেবেন না। ওর মা ভদ্রলোকের রক্ষিতা হয়ে আছে।'

'প্রকাশ্য ভাবে?'

'আজ্ঞে হাঁ। গ্রামের সব লোক জানে।'

নরেশ আঘাত পাইল: 'বল কি? না না, তা হতে পারে না। স্ত্রীলোকটি ঐ বাড়ীতে থাকে বলে সকলে ধরে নিয়েছে, রক্ষিতা।'

কর্ম্মচারী চুপ করিয়া রহিল।

নরেশ বলিল, 'ছেলেটির ত বিশ বাইশ বৎসর বয়স হবে। তার মা কতদিন ও-বাড়ীতে রয়েছে?'

'তা বছর সাতেক হবে।'

'অর্থাৎ বল্‌তে চাও, তের চৌদ্দ বৎসরের ছেলে নিযে এসে ঐ লোকটির ঘর কর্‌ছে। এ কখনও সম্ভব? ঐ বয়সে ছেলে ত-সবই বোঝে। রক্ষিতা হলে সে ছেলেকে ফেলে পালিয়ে আস্‌ত। ছেলে নিয়ে এমন প্রকাশ্যভাবে থাক্‌তে পার্‌ত না।'

উত্তরদাতা নিরুত্তর।

'চুপ করে রইলে! কথা কও।'

'কি কইব হুজুর?'

'আমি যা বল্লাম, তা হতে পারে কি না।'

'হতে পার্‌ত। কিন্তু হয় নি।'

'কি করে বুঝ্‌লে?'

'আজ্ঞে, ওঁর স্ত্রী এই জন্যই বাপের বাড়ী চলে গেছেন। মনে অনেক দাগা পেয়ে গেছেন। যাবার সময় নিজের ছেলেপিলেদের নিয়েও গেছেন। বলে গেছেন, ও না গেলে আস্‌বেন না।'

'স্ত্রী দেখ্‌তে কেমন ?'

'সুন্দরী বলা চলে।'

'আচ্ছা, যে স্ত্রীলোকটিকে রক্ষিতা বল্‌ছ, সে দেখ্‌তে কেমন ?'

'হুজুর, ওর ছেলেকে দেখেছেন ত ?'

'দেখেছি। জোয়ান বটে, কিন্তু অত্যন্ত কুৎসিৎ দেখ্‌তে।'

'ওর মা ওর চেয়েও ঢের কুৎসিৎ। আপনি ধারণা করতে পারবেন না, সে কি কালো আর কি বিশ্রী।'

'তবু তোমরা আমাকে বিশ্বাস করতে বল, ঐ স্ত্রীলোক তাঁর রক্ষিতা ? সুন্দরী স্ত্রী, ছেলেপিলে আছে। কি দেখে এ রকম কুৎসিৎ একটি স্ত্রীলোকের দিকে ঝুঁক্‌বে ? বয়স নিশ্চয় হয়েছে। তার উপর গুণ্ডা হেন অত বড় ছেলে। —এ হতেই পারে না।'

'সকলের কাছে এটা ত আশ্চর্য্যের বিষয়।'

'মোটেই না। লোকের মিথ্যা সন্দেহ। হয়ত নিরাশ্রয় দেখে আশ্রয় দিয়েছে। আশ্রয় দিলেই কি ধরে নিতে হবে, রক্ষিতা রেখেছে ?'

'হুজুর, আশ্রয় ত অনেককেই অনেকে দেয়, কিন্তু এমন কথা রটে না। তাঁর স্ত্রী লোক খুব ভাল। অনেক সহ্য করেছেন। তারপর নিরুপায় হয়ে চলে গেছেন। এই স্ত্রীলোকটি ভীষণ লোক। তাঁকে তাড়িয়ে তবে নিশ্চিন্ত হয়েছে। যতদিন ছিলেন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে। স্বামী ত বাধা দেন নি, আরও ওর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। লোকে বলে, তিনি ওর হাতের পুতুল হয়ে দাঁড়িয়েছেন।'

'আচ্ছা, এই লোক কি করে সমাজপতি থাক্‌তে পারে ? তুমি আবার বল্‌ছ, সকলে জানে।'

'আজ্ঞে হাঁ, সকলে জানে।'

'তবু সমাজপতি রয়েছেন!'

'তাড়াবার সাহস কার? আর যাঁরা তাড়াতে যাবে তারাও ত কেউ কম নয়। ওঁরই দোসর। অনেকের কীর্ত্তি ওঁর চেয়েও বেশী।'

নরেশ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইযাছে, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সহুরে ধারণা এখানে একেবারে অচল। রমণী সম্বন্ধে নরেশের ধারণা উচ্চ নয়। সে নারীমাত্রকেই নিকৃষ্ট, পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট, জীব বলিয়া মনে করে। কিন্তু তাই বলিয়া সে স্ত্রীলোককে পশু বা পশুর অধম বলিয়া বিবেচনা করে না। গ্রামদেশে স্ত্রীলোক পশুর তুল্য সমাদর লাভের দাবীও করিতে পারে না। একটা ঘোড়া, গরু বা কুকুব গৃহস্বামীর যত প্রিয় হয, স্ত্রী তত হয না। কর্ম্মের সঙ্গিনী হওয়া দূরে থাকুক, কোন বিষয়ে কখনও তার পরামর্শ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করা হয় না। তার একমাত্র কাজ হুকুম তামিল করা, এবং তাতে অবহেলা হইলে অথবা অবহেলা করা হইযাছে মনে করিলে কীল ঘুঁসি চড তার প্রাপ্য। নূতন বধূ হইলে ত কথাই নাই। তাকে সকল বকম অত্যাচারের অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয। এইরূপ সহস্র অত্যাচারের কাহিনী তাকে শুনিতে হইয়াছে। অতি সামান্য কারণে অথবা বিনা কারণে বধূর উপর ইহারা কিরূপ অকথ্য অত্যাচার করে তা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আব এ বিষয়ে গ্রামবাসী ভদ্রলোকেরা পয়লা নম্বরের দাগী। ইতর লোকেরা মারধোর করে বটে, কিন্তু তা গুরুতর অপরাধের জন্য। তবে ভদ্রলোকের আদর্শ ক্রমে তাদের মধ্যেও ছড়াইয়া পডিতেছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে তারা প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিতে পারিবে। আশ্চর্য্য এই, স্ত্রীলোকের উপর এইরূপ অসহনীয় অত্যাচার, আর তার পাশাপাশি দেখা যায়, অবিশ্বাস্য উচ্ছৃঙ্খলতা ও চরিত্রহীনতা। শুধু পুরুষদের নয়, কোন কোন স্থলে স্ত্রীলোকদেরও। পৃথিবীতে এই একটি স্থান আছে, যেখানে মানুষ যেমন শাক্তের ভক্ত ও নরমের যম এমন আর কোথাও নয়। যে স্ত্রীলোক, বধূ

হোক্ বা বিধবা হোক্, উগ্রস্বভাবা ও প্রকাশ্যভাবে অসংযত জীবন যাপন করে, তাকে শাসন করা কঠিন। তাকে এক কথা বলিলে সে দুকথা শুনাইয়া দিবে ; ভয়ে কেহ তার কাছে অগ্রসর হইবে না। কিন্তু শান্ত শিষ্ট ও সত্যবাদীর ক্ষমা নাই। সে নিরীহ বলিয়া তার উপর অবিচার ও অত্যাচারের সীমা থাকে না।

গ্রামে গ্রামে পুরুষমানুষেরা হাসিতে হাসিতে স্ত্রীলোকের মন ও শরীরের উপর কত রকম না অত্যাচার করে। তাদের মর্ম্মন্তুদ দুঃখের কাহিনী প্রকাশ করিবার কোন উপায় নাই। প্রতীকার ত দূরের কথা। শরীরের উপর অত্যাচার যে কত রকম ও কত বিশ্রী হইতে পারে, নরেশ তা এই প্রথম জানিল। মারধোর ত সামান্য জিনিষ। তীক্ষ্ণ শাণিত অস্ত্রে বিভিন্ন অঙ্গে আঘাত অথবা জ্বলন্ত অগ্নি দ্বারা পোড়ান, সর্ব্বদা হইয়া থাকে। এইরূপে বহু স্ত্রীলোক জীবন বিসর্জ্জন দেয়। ক্বচিৎ স্ত্রীকে খুন করিয়া কাহাকেও দশজনের কাছে বড়াই করিতে শোনা যায়। ইহাদের কে বা ধরাইয়া দেয়, কে বা রাজদ্বারে শাস্তির ব্যবস্থা করে। নরেশের গ্রাম-ভ্রমণের কিছু দিন পূর্ব্বেকার এক ঘটনা তার গোচরে আসে। বাবু রাত্রি একটার পর বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছেন। আসিবার কথা ছিল না। তবে আসা না আসা তাঁর মর্জ্জি। সে বিষয়ে কারও কোন কথা উচ্চারণ করিবার উপায় নাই। তিনি আসিয়া দেখিলেন, পত্নী নিদ্রিতা। ইহা গুরুতর অপরাধ। ইহাতে তাঁর রাগ হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং তিনি পত্নীর বুকে লাথি মারিয়া ঘুম ভাঙ্গাইলেন। পত্নী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলে তিনি বলিলেন, 'এতক্ষণ ডাক্‌ছি, শুন্‌তে পাস্ না? ভাত বেড়ে দে।' স্ত্রীকে তুই সম্বোধন নিত্য প্রচলিত। স্ত্রী বলিল, 'ওমা, ভাত বাড়্‌ব কোথা থেকে? তুমি আস্‌বে, আমি কি জান্‌তাম?' না জানা যে স্ত্রীর পক্ষে গর্হিত অপরাধ সন্দেহ নাই, এবং ইহাতে তাঁর রাগ আরও বাড়িল। তখন তিনি বলিলেন, 'উঠে ভাত রেঁধে দে।' স্ত্রীর তৃতীয় অপরাধ এই যে, সারাদিন বৃহৎ সংসারের খাটুনির পর ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়াছিল,

স্থতরাং বলিল, 'এত রাতে উঠে আমি ভাত রাঁধ্‌তে পারব না। মুড়ি আছে, মুড়ি খাও।' এই বলিয়া যেই মুড়ি আনিবার জন্য উঠিয়াছে অমনি স্বামী বলিলেন, 'কি? হারামজাদি৷ তোমার সবটাতে চালাকি। আজ তোমায় কেটে দুই খণ্ড করব।' এই বলিয়া মস্ত একটা দাও পাড়িয়া লইয়া তার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। স্ত্রী প্রাণভয়ে দৌড দিল। তার ইচ্ছা, দৌড়াইয়া পাশের বাড়ীতে চলিয়া যাইবে এবং স্বামীর রাগ পড়িলে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু দুভাগ্যবশত, একে ঘুমের চোখ, তার উপর অন্ধকার, সে তাদের বাড়ী হইতে অন্য বাড়ী যাইবার পথে ইট বা বেড়ায় লাগিয়া হোঁচট খাইয়া পড়িল। স্বামী আসিয়া তাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া তাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। তারপর তাঁর রাগ মিটিল। বোধ হয় চৈতন্যও হইল। কারণ সেই রাত্রেই তিনি পলাইলেন। পলাইয়া আর যাইবেন কোথা? শ্বশুর বাড়ীতে লুকাইলেন। অন্য গ্রামে। এদিকে তাঁর গ্রামে হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। পুলিশ দারোগা আসিল। কিন্তু যাঁদের কন্যা তাঁরাই জামাইকে বাঁচাইলেন। কি করিয়া যে বাঁচাইলেন সে কাহিনী অজ্ঞাত। হয়ত পুলিশ ও প্রতিবেশীর মুখ চাপা দিতে অনেক টাকা খরচ করিতে হইয়াছিল। সেই পুরুষ সিংহটি আবার বিবাহ করিয়াছেন অর্থাৎ এরূপ লোকেরও বাংলা দেশে সহজে পাত্রী জোটে। তার কারণ, পূর্ব্ব-পত্নীর অদৃষ্টে ছিল, স্বামীর হাতে তাব মৃত্যু ঘটিবে। অদৃষ্ট ত আর কেহ রোধ করিতে পারে না।

ইহারা গ্রামের লোক। ইহারা সহজে নিজের গরু বা ছাগল বেচিতে চায় না। অনেক বিবেচনার পর বেচে। কিন্তু স্ত্রী-ত্যাগের বেলা বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন হয় না। সামান্য কারণে, অধিকাংশ সময় বিনা কারণে, স্বামী স্ত্রীকে চিরদিনের জন্য বাপের বাড়ী নির্ব্বাসন দেয়, অথবা অন্য স্ত্রী বিবাহ করিয়া আনিয়া পূর্ব্ব স্ত্রীকে তার দাসী করিয়া রাখে। পুরুষের পক্ষে পরস্ত্রী-সংসর্গ শুধু ক্ষমার্হ নয়, পরন্তু গৌরবের বিষয়। স্ত্রীর চোখের সামনে স্বামী

ব্যাভিচার করে। স্ত্রীর কিছু বলিবার উপায় নাই। নরেশ ইহার পূর্ব্বে কখনও বিশ্বাস করিতে পারিত না যে, লোকে এত সহজে স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে। গ্রামদেশে ভদ্র ও সমাজপতি বলিয়া পরিচিত এমন লোক কম আছে যারা দুই বা ততোধিক বার স্ত্রী ত্যাগ করিয়া পুনরায় বিবাহ করে নাই। পরিত্যক্ত স্ত্রীর কি হইল কেহ খোঁজ লয় না। খাইতে পরিতে দিতে না পারুক্ তথাপি একাধিক স্ত্রী বর্ত্তমান রহিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বহু বিবাহ ও উপপত্নী গ্রহণ কিরূপ সুপ্রচলিত তা দেখিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না।

নরেশের মনে পড়িয়া গেল, একদিন রমেনের সঙ্গে তার রমণী সম্বন্ধে তর্ক হইয়াছিল। সে নিজে নারী সম্বন্ধে যা বলিয়াছিল, তা ভুলিয়া যায় নাই। মতও বদ্‌লায় নাই। সত্য বটে, কমলা তাকে নাড়া দিয়াছে, কিন্তু কমলা আজ পর্য্যন্ত এমন কিছু পরিচয় দেয় নাই যাতে তার ধারণা বদ্‌লাইয়া যাইতে পারে। মনে পড়ে রমেন রামমোহন রায়ের সহমরণ বিষয়ক প্রস্তাব হইতে কিছু অংশ পড়িয়া শুনাইয়াছিল। সে আশ্চর্য্য হইয়া ভাবে, প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে তার স্বদেশবাসী একটি লোক নারীর দুঃখ-দুর্দ্দশা সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়াছিলেন, তার একটিও পরিবর্ত্তন না করিয়া সেগুলি আজও সমানভাবে প্রযোজ্য। সমাজে লক্ষ লক্ষ অথবা কোটি কোটি নরনারীর অবস্থা, বিশেষত নারীর অবস্থা, একচুল উন্নত হয় নাই। এক শত বৎসরে আমরা এক পা অগ্রসর হই নাই। অথচ স্বদেশ-সেবা ও স্বাধীনতার কত না আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে। হা আমার অভিশপ্ত দেশ! যখন ঘরের দিকে তাকান যায়, তখন নৈরাশ্য ও বিষাদের আর সীমা থাকে না। নরেশ সমাজ-সংস্কারক নহে। স্বাধীনতা আন্দোলন বা কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত তার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। তথাপি তার নিজের প্রজাদের এই অবনত অবস্থায় তার চোখে জল আসে। তার মনে হয়, আরও এক শ বৎসর চলিয়া গেলেও ইহারা যে তিমিরে সেই তিমিরে থাকিয়া যাইবে।

নারীকে শত বন্ধনের মধ্যে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখা হইয়াছে। তথাপি গ্রাম মাত্রেরই নৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। শুধু পুরুষ মানুষরা নয়, স্ত্রীলোকেরাও কোথাও কোথাও অধঃপতনের কিরূপ নিম্নধাপে নামিয়াছে, তা না জানিলে বিশ্বাস করা শক্ত। মিথ্যাভাষণ, ঝগড়া, নীচ স্বার্থপরতা ত আছেই, গ্রামবাসীদের নৈতিক স্খলনও ভয়াবহ। এক বাড়ীতে অনেকগুলি ভাই থাকিলে, ইহাদের অধিকাংশ অকর্মণ্য হয় এবং জীবিকার জন্য একজনের উপর নির্ভর করে। পরস্পরের স্ত্রীর প্রতি অসদ্ব্যবহার ও লোভ দেখা যায়। ক্বচিৎ বড় লোকের বাড়ীতে অর্থের জন্য স্ত্রী পৌঁছাইয়া দেওয়ার কথা শোনা যায়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা বিধবাদের লইয়া। গ্রামে গ্রামে বাল বিধবার সংখ্যা কেহ গণিয়া শেষ করিতে পারে না। ইদানীং গ্রামেও বয়স্থা মেয়ের বিবাহ স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং আশা করা যায়, পনের বিশ বৎসরের মধ্যে বাল-বিধবার সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইবে। কিন্তু তার আগে পর্য্যন্ত ইহারা ত আছে। ইহারা সমাজ দেহে দুষ্ট ব্রণের মত। নরেশ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল, যে দুই ক্ষেত্রে সমাজ বড় বড় কথা বলে, সেই দুই ক্ষেত্রে উহার অপরাধ কত গুরুতর। গরুর পূজা এদেশের হিন্দু সমাজে প্রচলিত। কিন্তু গরুর এত অযত্ন আর কোন জাতি করে কি না সন্দেহ। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য গৌরব ও গর্ব্বের সহিত ঘোষণা করা হয়। কিন্তু হিন্দুর সংসারে বিধবার মত অবজ্ঞাত পদার্থ আর কিছুই নাই। ব্রহ্মচর্য্যের কথা প্রচার করা সহজ, কিন্তু বাল-বিধবার পক্ষে যৌবনে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা অত্যন্ত কঠিন। বিশেষত গ্রামে এইরূপ বিধবাকে প্রলুব্ধ করিবার মত ইতর ও ভদ্রলোকের অভাব নাই। ইহাদের কাছে বিবাহের কথা বল, ইহারা কানে হাত দিবে। কিন্তু নিজের হৃদয়ের কপাট উন্মুক্ত করিলে ইহারা প্রত্যেকেই বলিয়া বসিবে, যৌবন ভোগের সময়। গ্রামে গ্রামে এইরূপ বিধবা আছে যারা পূর্ণ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি করিয়াও বিধবা সাজিয়া বসিয়া আছে। বিধবাকে পথভ্রষ্ট করিতে তার আত্মীয়-স্বজন যথেষ্ট পরিমাণে আছে, তার উপর বাহিরের লোকের অভাব

নাই। যে স্ত্রীলোক গৃহে সর্ব্বদা অবজ্ঞাত, যার মনে অন্ধকার, সে তার নিরাশ্রয় দাসীত্বের মধ্যে যদি কুপথে যায়, তা হইলে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। কিন্তু সমাজ হইতে পরিত্যক্ত হওয়াও অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। গ্রামের সমাজপতি বা ধনী ব্যক্তি প্রায় প্রকাশ্যে কোন বিধবা বা পরের স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক রাখিতে পারেন। তাকে সমাজ-পরিত্যক্তা করিতে কারও সাহসে কুলাইবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন স্ত্রীলোককে চরিত্রহীনা জানিলেই তাকে সমাজ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া সহজ হয় না। সে যদি নিজকৃত কাজ গোপনে করিতে পারে, অস্বীকার করে এবং উগ্রস্বভাবা হয়, তা হইলে তাকে কেহ ঘাটাইবে না। কেহ ধরা পড়িয়াছে ত মরিয়াছে। যতদিন ধরা পড়ে নাই, ততদিন সে নির্দ্দোষ। ধরা না পড়িয়া বহু পুরাতন পাপী সমাজে বুক ফুলাইয়া চলাফেরা করে, আর ধরা পড়িয়া প্রথম অপরাধী চিরদিনের জন্য দাগী হইয়া যায়।

সম্প্রতি এক নূতন উপদ্রবে অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে। একদল অদ্ভুত গুরু দেখা দিয়াছে। ইহারা গ্রামে গ্রামে মন্ত্র দিয়া বেড়ায়। ইহারা অধিকাংশ নব্য ধরণে সজ্জিত যুবক। বাড়ীর পুরুষেরা ইহাদের কাছে মন্ত্র লয় না। ইহাদের প্রতিপত্তি স্ত্রীলোকদের কাছে, বিশেষত বিধবা ও বৃদ্ধাদের কাছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ইহারা প্রায়শ গৃহস্থ বাড়ীতে সেই সময়ে উপস্থিত হয় যখন পুরুষেরা কার্য্যান্তরে অন্যত্র ব্যাপৃত থাকে। আর গৃহে পুরুষ থাকিলেই বা ক্ষতি কি? যাকে ব্রত দিতে হইবে তাকে একাকী বা একাকিনী গুরুর সহিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইতে হয়। কোথাও কোথাও এইরূপ গুরু ছেলেদের হাতে মার খাইয়াছে। কিন্তু গুরুর প্রতি বিধবাদের বড় ভক্তি। তাদের প্রশ্রয়েই ইহারা বৃদ্ধি পাইতেছে। সাধারণত ইহাদের বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিলে বিধবারা তাকে ক্ষমা করে না।

নরেশ এক এক দিনে গ্রামের লোকেদের সম্বন্ধে এত কাহিনী শুনিয়াছে, তার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু গ্রামবাসীদিগকে সম্বোধন করিবার সময় এই সব বিষয়

এড়াইয়া গিয়াছে। শুধু বলিয়াছে, তোমরা ধর্ম্মনিষ্ঠ হও, পরস্পর কলহ করিও না। তার নিজের বিশ্বাস, শিক্ষায় অগ্রসর হইলে গ্রামবাসীদের নৈতিক আব্‌হাওয়া বদ্‌লাইয়া যাইবে। সে জোর করিয়া কিছু বলিতে পারে না, কিন্তু এরূপ তার বিশ্বাস। জোর করিয়া বলিতে না পারার কারণ এই যে, এইরূপ দুষ্ট নৈতিক আব্‌হাওয়া তার হিন্দু প্রজাদের মধ্যে যত দেখা যায়, মুসলমান প্রজাদের মধ্যে তত নয়। হিন্দুদের বিবাহ-বন্ধন দৃঢ়, কিন্তু তা মাত্র স্ত্রীলোকের পক্ষে, অর্থাৎ স্ত্রীলোক যাবজ্জীবন স্ত্রী হইয়া থাকিতে বাধ্য, এক স্বামী ভিন্ন অন্য স্বামী গ্রহণ সকল অবস্থায় তার পক্ষে নিষিদ্ধ। মুসলমানের বেলায় তা নয়। তাদের বিবাহ-বন্ধন শ্লথ। অর্থাৎ স্ত্রীকে ত্যাগ করিবার অধিকার স্বামীর যেমন আছে, স্ত্রীর আবার বিবাহ করিবাব অধিকার তেমনই আছে। বস্তুত, স্ত্রীর এই বিবাহেব অধিকার সর্ব্বত্র স্বীকৃত। বিধবার বিবাহ সহজ। এমন কি, বয়স্থ পুত্রকন্যা থাকিলেও বিধবার বিবাহে বাধা নাই। উপরন্তু মুসলমান বিবাহের ক্ষেত্র সংকীর্ণ নহে। মুসলমান সমাজে বহু নিকট আত্মীয়ের পরস্পরের বিবাহ হয়, যা হিন্দু সমাজে নিষিদ্ধ। শুনিতে অদ্ভুত হইলেও এই দুই কারণে মুসলমান সমাজে নৈতিক বিশুদ্ধতা রক্ষা বেশী পরিমাণে হয়। পুঁথিগতভাবে হিন্দু নীতির আদর্শের হয়ত মূল্য অনেক। কিন্তু যে বিদ্যা শুধু পুঁথিতে আবদ্ধ, ক্বচিৎ কাজে প্রযুক্ত হয়, তা লইয়া গৌরব কারবার কি আছে? কিন্তু গ্রামদেশে মুসলমান সমাজে নারীর মর্য্যাদা অধিক, একথা মনে করিলে ভুল হইবে। শাস্ত্রমতে প্রত্যেক মুসলমান চারিটি পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে পারে। এই শাস্ত্র মানিবার লোক অপ্রতুল নহে। দুই বা তিন বিবাহ করিয়াছে এমন দৃষ্টান্ত অনেক। তারপর বধূর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্য্যাতন যথেষ্ট রহিয়াছে। বরং প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের তথাকথিত ভদ্রলোকদের দেখাদেখি বাড়িয়া চলিয়াছে। তথাকথিত ইতর শ্রেণী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভদ্রশ্রেণীর মত বাবুগিরিও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। নকল করিতে গিয়া তাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে। ঐ বিষয়েও নরেশ ইঙ্গিতে

দু একটি কথা বলে। সে তার বক্তব্য যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে ও সরলভাবে বলিতে চেষ্টা করে। কাতারে কাতারে লোক আসিয়া তার কথা আগ্রহ-ভরে শোনে। এই দৃশ্য তার বড় ভাল লাগে। সে জানে, সে যে কথা বলিতেছে, তা অসামান্য কিছু নয়, এবং তার কর্ম্মচারীদের মধ্যে কেহ যদি এগুলি বলিত, তা হইলে লোক সমাগম হইত না, সে জমিদার, ইহারা প্রজা, সেজন্য ইহাদের নিকট তার এক বিশেষ মর্য্যাদা আছে, তার মুখের কথা শুনিবার জন্য ইহাদের আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। তবু তার ভাল লাগে। ইহাদের মুখের দিকে চাহিয়া ইহাদের সম্বন্ধে নিত্য নব-পরিচিত দোষের কথা ভুলিয়া যায়।

কিন্তু জমিদারের মুখের বাণী শুনিবার জন্য গ্রামবাসী মাত্রেই সমান ব্যাকুল নহে। ভদ্রশ্রেণীর লোকেরা ত ব্যাকুল নয়ই, বরং অসন্তুষ্ট। তারা পরস্পর এই কথাই বলাবলি করে যে, নরেশ ছোটলোকদের মাথা খাইতেছে। স্বয়ং জমিদার আসিয়া তাদের খোসামোদ করিতেছে। খোসামোদ বৈ কি। তাদের দুটা ভাল কথা বলা মানেও খোসামোদ। যারা চিরকাল প্রহার ও গালাগালি লাভে অভ্যস্ত তাদের কাছে মিনতি করিয়া কথা বলা কেন? কুকুরের লেজ হাজার ঘি দিয়া মলিয়া দাও সোজা হইবে না। ইহাদের যত খুসী মিষ্ট কথা বলিয়া বুঝাও, ইহারা বুঝিবে না। ইহারা বোঝে শুধু ধমক ও চাবুক। সেই স্থলে ইহাদের খোসামোদ করিয়া নরেশ ইহাদের আস্পর্দ্ধা এরূপ বাড়াইয়া দিয়া যাইবে যে, পরে ইহারা আর ভদ্রলোকদের মানিতে চাহিবে না। জমিদার হইয়া নরেশ শেষকালে স্বদেশী প্রচার আরম্ভ করিবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর ছিল। শেষ পর্য্যন্ত ইহাতে নরেশের নিজের ক্ষতি, তা সে বুঝিতেছে না কেন? বুঝাইবার মত লোক কি কেহ নাই? শুনিতে পাওয়া যায়, তার কর্ম্মচারীরা সকলে সৎ ও দক্ষ, তা হইলে তারা বারণ করে না কেন? মনিবের কিসে মঙ্গল হয়, তা ত তাদের দেখা উচিত। হয়ত ভয়ে বারণ করে না। কিন্তু এখানে তার

ভ্রূকুটিকে ভয় না করিলেই শোভন হইত। সুতরাং দু তিন গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিরা মিলিয়া ঠিক করিলেন, নরেশের সহিত দেখা করিয়া সাবধান করিবেন।

নরেশের সহিত দেখা করা কঠিন হইল না। কিন্তু তাকে সাবধান করা বড় মুস্কিল। মাত্র তাঁরা এই কথা বলিয়াছিলেন যে, প্রজাদের এই ভাবে আস্কারা দেওয়া উচিত হইতেছে না, অমনি নরেশ হাসিয়া উঠিল। সে সব বুঝিতে পারিয়াছে, তাঁদের মনের কথা ধরিতে পারিয়াছে। না পারিবে কেন? নরেশ বুদ্ধিমান্ বটে।

নরেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আস্কারা হল কিসে?'

'তাদের সঙ্গে মেশা বা কথা বলাই ত আস্কারা দেওয়া।'

'কই, আমি ত তাদের সঙ্গে মিশি নি। আমি জমিদার, একথা আমি যদি বা ভুল্‌তে পারি, তারা ভুল্‌তে পারে না। আর কথা বলা? আমি ত ভাল কথাই বলি। আপনারা আমার বক্তৃতা শুনেছেন?'

'শুনেছি।'

'আশ্চর্য্য, তবু বল্‌ছেন আস্কারা দি!' এই বলিয়া তার শেষ বক্তৃতার চুম্বক বর্ণনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, বলুন ত, এর মধ্যে কি অন্যায় কথাটা বলেছি?'

মাতব্বর ব্যক্তিরা জিভ্ কাটিলেন: 'আপনি অন্যায় বলেছেন, এমন কথা কেউ বলে নি। আপনার মঙ্গলের জন্য দুটা কথা আপনাকে বল্‌তে এসেছি। কিন্তু আপনি যদি অসন্তুষ্ট হন, তা হলে বল্‌ব না।'

'না, আপনারা আসাতে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি বরং। আপনারা কি চান, আমার কথা থামিয়ে দেব? তা আমি পারব না। আমি নিজ চোখে আমার প্রজাদের অবস্থা দেখ্‌ব বলেই গ্রাম থেকে গ্রামে হেঁটে বেড়াচ্ছি। ঐটে থেকে আমাকে নিবৃত্ত করবেন না।' নরেশ হাতজোড় করিল।

মাতব্বর ব্যক্তিগণ শশব্যস্তে দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং হাতজোড় করিয়া

কহিলেন, 'আহা হা, কি করেন, আপনি আমাদের জমিদার। হাতজোড় করে আমাদের অপরাধী কর্‌বেন না।'

নরেশ হাত খুলিয়া ফেলিল। 'আপনারা বসুন। আপনারা বলুন, আমার কোন্ কথা আপনাদের পছন্দ নয়, আর সে কথা কি ভাবে বল্লে আপনারা খুসী হন। আমি চেষ্টা কর্‌ব, সেই রকম করে বল্‌তে।'

যাঁরা আসিয়াছিলেন তাঁরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে থাকেন। তাঁদের আপত্তি নির্দ্দিষ্ট কোন কথা বা বাক্যের জন্য নয়। নরেশ যে ছোটলোকদের নিকট কথা ছড়াইবে, ইহাই তাঁরা চান না। কিন্তু এ বিষয়ে নরেশ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, সে কারও কথা শুনিবে না। যা ভাল বুঝিবে, তা সে করিবে। তার প্রতিজ্ঞার কাছে ইহারা ছোট হইয়া গেলেন। সুতরাং ব্যর্থ হইয়া তারা ফিরিয়া আসিলেন। তবে তাঁরা স্বীকার করিলেন, এই নবীন জমিদার খুব ভদ্র, কার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় জানেন। আর না হইবেই বা কেন? ইনি উচ্চশিক্ষিত বটেন। একে যুবা পুরুষ, তায় কলেজে বিলাতী শিক্ষা পাইয়াছেন। নিজের দেশে সেই শিক্ষা খাটাইতে ব্রতী হইয়াছেন। কিছু দিন অভিজ্ঞতা হইলেই তিনি বুঝিতে পারিবেন, ভস্মে ঘি ঢালা হইতেছে। তখন আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিবেন। ততদিন পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া থাকা ছাড়া উপায় নাই।

নরেশ গ্রাম-পর্য্যটন করিয়া নূতন মানুষ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। রোদে রোদে ঘুরিয়া তার মুখ কালো হইয়া গিয়াছে। সেজন্য সে দুঃখিত নয়। সে যেন তার দেশকে নূতন করিয়া আবিষ্কার করিয়াছে। এ আবিষ্কার কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের চেয়ে কম নয়। সম্ভবত কলম্বস তাঁর আবিষ্কারে এত আনন্দ লাভ করিতে পারেন নাই। নরেশ অবশ্য তার সমগ্র জমিদারি দেখে নাই, ভাওয়াল দেখিয়াছে। ঢাকা অগ্রসরতম জেলা বলিয়া পরিচিত। সুতরাং সে ইহা ধরিয়া লইতে পারে যে, সে বাংলা দেশের যে চিত্রের সহিত পরিচিত হইয়াছে, তা সমগ্র দেশের অবস্থার দ্যোতক। সে শুধু ভাবিয়া

পায় না, সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর জেলার গ্রামগুলির অবস্থা যদি এইরূপ হয়, তা হইলে অন্য গ্রামের দশা কিরূপ। গ্রামের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে এযাবৎ কাল সে অনেক যুক্তিতর্ক শুনিয়া আসিয়াছে। আজকাল দেশ-সেবক ও সরকার উভয়ের মুখেই এই বুলি শুনা যায়, গ্রামে ফিরিয়া যাও। আরে, গ্রামে ফিরিয়া গিয়া কি করিবে? খাইবেই বা কি? গ্রামের সহিত যাদের চাক্ষুষ পরিচয় আছে, শুধু তারাই জানে, গ্রামে গিয়া বাস করা কি কঠিন। যেন দম বন্ধ হইয়া যায়। কথায় কথায় বলা হয়, গ্রামের সভ্যতা খাঁটি বাঙ্গালী বা ভারতীয় সভ্যতা। গ্রামবাসীর সরল, আনন্দময় জীবন আদর্শ ও অনুকরণীয় জীবন। কিন্তু গ্রাম্য জীবন যে সহুরে জীবন হইতে সহস্রাংশে নিকৃষ্ট জীবন, এ কথা কে বুঝাইয়া দিবে? না, নরেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে, দেশকে যদি বড় করিতে হয় তা হইলে বাংলার গ্রামগুলিকে সহরে পরিণত করিতে হইবে; সহরকে গ্রামে পরিণত করিবার মত ভ্রান্তি আর কিছুই হইতে পারে না: উহাই মরণের পথ। নরেশের নিজ অভিজ্ঞতার দাম তার কাছে খুব বেশী। সে যদি তার অভিজ্ঞতার কথা সকল দেশ-সেবককে জানাইতে পারিত, তা হইলে সে তা জানাইত। কিন্তু কেই বা তার কথা শুনিবে? তার গলার স্বর তার নিজ জমিদারির বাহিরে গিয়া পৌঁছাইবে না। তা না পৌঁছাক্। সে এ বিষয়ে নিজে যা করিতে পারে, তা করিবে।

সর্ব্বপ্রকারে পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে গ্রামগুলি। পৃথিবীর অগ্রগতির খবর সেখানে কেহ রাখে না। নরনারী ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত। পঙ্কে পড়িয়া আছে বলিলেও চলে। হাত ধরিয়া উঠাইবার কেহ নাই। বড় মায়া হয় ইহাদের জন্য। ইহাদের অনাচার, কুসংস্কার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে নরেশ যত রাগ করুক্, জীবনে সে এই প্রথম অনুভব করিল, সে গ্রামবাসীদের ভালবাসে। সেই জন্যই সে তাদের জন্য কিছু করিতে চায়। অন্ততঃ একটি গ্রামকেও যদি সে বদ্‌লাইয়া দিতে পারে, তা হইলে জীবন ধন্য মনে করিবে। এই মনোভাব তার মধ্যে একেবারে নূতন। পূর্ব্বে

জমিদারির কাজে তার যথেষ্ট মনোযোগ ছিল, সে ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা ভালবাসিত। কিন্তু গ্রাম ঘুরিয়া আসিয়া তার চোখে এক নূতন অঞ্জন লাগিয়াছে। এতদিন তার জীবনে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল না। বাঁচিয়া থাকা, ভাল ভাবে বাঁচিয়া থাকা, সর্ব্বপ্রকারে জীবনে সুখভোগ করা,—ইহাই যেন তার কাম্য ছিল। তার সে আদর্শ আজও আছে। প্রজার হিতের জন্য সে আজও সমুদয় অর্থ বা সম্পত্তি বিলাইয়া দিতে প্রস্তুত নয়। তার ধমনীতে ধমনীতে জমিদারের রক্ত প্রবাহিত হইতেছে, তা সে ভুলিতে পারে না। কিন্তু তার জমিদারত্ব ও প্রভুত্ব বজায় রাখিয়াও ত কিছু করা যাইতে পারে। তা অসম্ভব নহে। বরং এই কাজের মধ্যে সে যেন নিজের লক্ষ্য খুঁজিয়া পাইয়াছে। এতদিন তার জীবনে করিবার মত কোন কাজ ছিল না। সে জন্য যে সে বিশেষ মাথা ঘামাইত বা নিজের উপর অসন্তুষ্ট ছিল, তা নয়। জীবন মন্দ কাটিতেছিল না। সে ইহা নিজের নিকট স্বীকার করিবে যে, জীবন তাকে বঞ্চিত করে নাই। সে প্রচুর সুখ ও প্রচুর আনন্দ উপার্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু তার এই নূতন লক্ষ্য তাকে সে সুখ ও আনন্দ হইতে বিচ্যুত করিবে না। প্রজাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা, মলিনতা ইত্যাদি তাকে আঘাত করে। তা করিবেই। সেও মানুষ ত। কিন্তু সেজন্য সে সমবেদনায় অশ্রুপাত করিতে বসিবে না। বস্তুত, অশ্রুপাত বা গাম্ভীর্য্য নরেশের ধাতে সহ্য হয় না। জীবন উপভোগ করিবার বস্তু। সংসারে মানুষ কতদিনই আর থাকে? তার মধ্যে যৌবন ক্ষণস্থায়ী। আর পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যে নরেশের—এবং রমেনেরও—চুলে পাক ধরিবে। তাই বলিয়া কি সে মুখ ভার করিয়া থাকিয়া এখন হইতেই জীবনকে দুর্ব্বহ করিয়া তুলিবে? জগতের দুঃখ-কষ্টের কথা মনে রাখিয়া নিজের সুখী হইবার অধিকারকে অস্বীকার করিবে? না, নরেশ সে মানুষ নয়। নরেশ বর্ত্তমান জীবনকে খুব ভালবাসে। সে হাসিমুখে ইহা গ্রহণ করিয়াছে। হাসিমুখেই সে তার প্রজাদের সমস্যা সমাধানে ব্যাপৃত হইবে।

সাদা ফৌজের কাছে সে কৃতজ্ঞ। সাদা ফৌজ তাকে দেশের সহিত সত্যভাবে পরিচিত হইতে সাহায্য করিয়াছে। এই পরিচিত হওয়ায় তার হয়ত গৌরব কিছু বাড়ে নাই। এবং সে যদি জোর করিয়া না গিয়া উহাদের মধ্যে উপস্থিত হইত, তা হইলে কি হইত নিশ্চয় বলা যায় না। সে ত সাদা ফৌজকে শত্রু বলিয়াই মনে করিয়াছিল, কিন্তু তারা জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ চাহে না দেখিয়া পরে তাদের প্রতি [illegible] ভাব হয়। ইহারা বরাবর এই ভাব রাখিতে পারিবে কি না বলা যায় না। কিন্তু বর্ত্তমানে তারা যে জমিদারদের বিরুদ্ধে না গিয়া প্রজাদের অবস্থার সর্ব্বপ্রকার উন্নতির জন্য চেষ্টিত হইয়াছে, ইহা ভাল কথা। সাদা ফৌজ বিরুদ্ধতা না করিলেও জমিদারদের নিকট তাদের দাবীর ন্যায্যতা অনেকেই স্বীকার করিয়া লইবে না। পুলিশ প্রায় সর্ব্বত্র জমিদারের সহায়। সুতরাং পুলিশের সাহায্যে সাদা ফৌজকে দমন করার কথা হয়ত সে শীঘ্রই শুনিতে পাইবে। তা হইতে কি বিষময় ফল হইবে, কে জানে। অচিরে রক্ত গঙ্গা প্রবাহিত হইবে না, ইহাও কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। সে নিজে অবশ্য তাদের সহিত একটা রফা করিয়াছে। সে কথা দিয়াছে, পাচ বৎসরে এমন কিছু কাজ করিবে যা দেখিয়া তারা সন্তুষ্ট হইবে। সে ইচ্ছা করিয়াই পাচ বৎসরের সময় লইয়াছে। পাচ বৎসর সুদীর্ঘ সময়। অন্য বহু প্রতিষ্ঠানের মত সাদা ফৌজও যে কালের গর্ভে বিলীন হইয়া যাইবে, তার খুব সম্ভাবনা রহিয়াছে। এদেশে কত প্রতিষ্ঠানই ত নূতন উৎসাহে কাজ আরম্ভ করে। তারপর হয় তা বিলীন হইয়া যায়, নতুবা নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। নাম হয়ত থাকে, কিন্তু আসল প্রতিষ্ঠানটি কঙ্কালে দাঁড়াইয়া যায়। আর এরূপ কোন প্রতিষ্ঠান যদিই বা নিজের জোরে পাচ বৎসর কাল বর্ত্তমান থাকে, তা হইলেও পুলিশ ইহাকে ধ্বংস করিবে। জমিদার ইহার শত্রু। সুতরাং পুলিশও। ইহার অস্তিত্ব পাচ বৎসর পরে থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান পাচ বৎসর পরে বর্ত্তমান থাকুক্

না থাকুক্, কিছু আসে যায় না। নরেশ নিজের কাছে ব্রত লইয়াছে, তার প্রজাদের জন্য কিছু করিবে। হয়ত সাদা ফৌজ যা করিত, যে পথে করিত, সে তা করিবে না, সে পথেও করিবে না। তাতেই কি? লোকে ফল দেখিয়াই ত কাজের বিচার করে। সে একটা গ্রামকেও দি তার মনের মত করিয়া গড়িতে পারে, তা হইলেই মনে করিবে, সে ার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করি ছে।

কমলার কথা মনে পড়ে ? প্রথম সাক্ষাতের দিন, আ, আজ মনে হইতেছে সে যেন কত যুগ আগে, কমলা তার পেশার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। রমেন জানায়, জমিদারি। তারপর তার আয়ের কথা শুনিয়া কমলার চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়। সে এক উপভোগ্য দৃশ্য বটে। বেচারী কমলা ধারণা করিতে পারে নাই, তার আয় অত হইতে পারে। তার দোষ কি? সে ত মাত্র রমেনকে জানিত। আর বাহিরের যাদের সঙ্গেই তার পরিবারের পরিচয় হোক্ না, নরেশের মত অবস্থা কারও নয় তা সে ধরিয়া লইতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ইহা অপেক্ষাও কিছু ছিল। সে কি না নরেশকে অম্লানবদনে বলিতে পারিল, তার পক্ষে এত টাকা জমান উচিত নহে, কিছু অংশ প্রজাদের সুখের জন্য বিলাইয়া দেওয়া উচিত। এই কথা তার যতবার মনে হইয়াছে ততবার হাসি পাইয়াছে। কিন্তু আজ চাকা ঘুরিয়া গিয়াছে। কমলা হয়ত কি যা ঠাট্টাচ্ছলে বলিয়াছিল, নরেশ তাই করিতে যাইতেছে। একথা শুনিলে কমলা খুসী হইবে কি? কমলাকে খুসী করিবার জন্য সে তার আয়ের কিয়দংশ প্রজাদের জন্য ব্যয় করিতে যাইতেছে না। অবস্থাগতিকে তাকে এই পন্থা অবলম্বন করিতে হইতেছে। অবশ্য এখন স্বেচ্ছায়। তবু ইহাকে কমলার সাধ বা অভিলাষ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। নরেশ তখন সাদা ফৌজের নাম পর্য্যন্ত শোনে নাই। গ্রাম-পর্য্যটনের কল্পনা করে নাই। যীশুখৃষ্টের আগে যেমন সেণ্ট জন, সাদা ফৌজের পূর্ব্বে তেমনি কমলা। জীবনাকাশে কমলার উদয় হইতে না